আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস : নারী জীবনের রূপ ও রূপায়ণ

মোছাঃ শাহানাজ বেগম

Dhaka University Library
401866

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোছাঃ শাহানাজ বেগম কর্তৃক উপস্থাপিত *আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস : নারী জীবনের রূপ ও রূপায়ণ* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

০৮/০৬/০৫

ড. বেগম আকতার কামাল
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401856

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ-কথা
প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ : সমাজ ও সাহিত্যে নারীর জীবনচিত্র : প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলা উপন্যাসে নারীর জীবনরূপ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উপন্যাস রচনায় নারী
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আশাপূর্ণা দেবীর জীবন ও শিল্পব্যক্তিত্ব

401856

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ : *প্রথম প্রতিশ্রুতি* : গার্হস্থ্য ও সারস্বত জীবনালেখ্য
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : *সুবর্ণলতা* : আত্মসংগ্রামের স্বরলিপি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : *বকুলকথা* : সংগ্রাম ও সত্তা অর্জনের পরিণতি-পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ : ত্রয়ী উপন্যাসে নারীজীবনের রূপায়ণ-কৌশল
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ত্রয়ী উপন্যাসের ভাষারূপ
উপসংহার
মূলগ্রন্থ
সহায়কগ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল-এর তত্ত্বাবধানে এম. ফিল কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি এবং তাঁর ও অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেনের নিকট প্রথম পর্বের কোর্স অধ্যয়ন করি।

উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ, দিকনির্দেশনা ও গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়ক পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মের এগিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনি গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পরিমার্জনা ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এরপর আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় ড. সৈয়দ আকরম হোসেন-এর প্রতি। আমি আমার প্রথম পর্বের কোর্স করার সময় তাঁর সংস্পর্শে আসি। তখন থেকেই তিনি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অনেক জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে আমার কাছে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক প্রদান করে সহায়তা করেছেন।

এছাড়া আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর প্রতি। যিনি আমার গবেষণা কর্ম কম্পিউটার কম্পোজ করার ব্যাপারে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন। এবং আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় অসীম সাহাকে, যিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজ দায়িত্বে কম্পিউটার কম্পোজ এবং প্রুফ দেখার কাজে সহায়তা করেছেন।

পরিশেষে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্বামী নেসার আহমদের প্রতি, যিনি নিজেও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে এম.ফিল গবেষণারত। তিনি সর্বক্ষণ আমার পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ব্রাক লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবী এক বিস্ময়কর প্রতিভা। নারী-জীবনের চিত্র রূপায়ণে তিনি আন্তরিক ও ঐকান্তিক। ঊনিশ শতকীয় রেনেসাঁস বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-মানসে পরিবর্তন সাধন করলেও তা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারী ছিল এ পরিবর্তনের পরিসর-বহির্ভূত। অধিকারবঞ্চিত নারীর সামগ্রিক জীবন-মানস, ব্যর্থতাজনিত দীর্ঘশ্বাস বাংলা সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসের আঙ্গিকে রূপায়িত হয়েছে। তবে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে তা নতুন মাত্রা পেয়েছে। অধিকারবঞ্চিত নারীর মুক্তিসংগ্রাম, তার আত্মাবিষ্কার, ব্যক্তিসচেতনতাবোধ, নারীর মানুষ হয়ে ওঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রামের চিত্র সহানুভূতিশীল ও অভিজ্ঞতাস্নাত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর উপন্যাসে, বিশেষত সাড়া জাগানো তিনটি উপন্যাস *প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুলকথা*-য় রূপায়িত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে ঊনিশ শতকের শেষাংশ থেকে বিশ শতকের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়কালে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের বিস্তৃত চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এই জীবনচিত্র ও তার অন্তর্বয়নরীতি উদ্‌ঘাটন করাই আমাদের গবেষণার লক্ষ্য। এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা ও প্রবন্ধাদি রচিত হলেও পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা-সন্দর্ভ রচিত হয়নি। গবেষণার বিষয়বিন্যাসে আমরা নিম্নোক্ত রীতি ও ক্রমে সমগ্র আলোচনাকে লিপিবদ্ধ করেছি।

সর্বমোট তিনটি অধ্যায়ে গবেষণার বিষয় বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম *সমাজ ও সাহিত্যে নারীর জীবনচিত্র : প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ*। এই অংশে আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজ ও সাহিত্যে নারীর অবস্থা ও অবস্থান এবং আধুনিক যুগে উপন্যাসে নারীর জীবনরূপ কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত তা অংকিত করেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম *বাংলা উপন্যাসে নারীর জীবনরূপ*। এই পরিচ্ছেদে পুরুষরচিত উপন্যাসে নারীর জীবনরূপ কিভাবে রূপায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম *উপন্যাস রচনায় নারী*। এই অংশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষত উপন্যাসের আঙ্গিকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নারী ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব, তাঁদের রচনায় নারী চরিত্রের রূপায়ণ প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম *আশাপূর্ণা দেবীর জীবন ও শিল্পব্যক্তিত্ব*। এখানে আমরা ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম, পারিবারিক অবস্থা, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আগমন, শিল্পব্যক্তিত্ব—এর সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম *প্রথম প্রতিশ্রুতি : গার্হস্থ্য ও সারস্বত জীবনালেখ্য*। এই অংশে ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম গ্রন্থ *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-তে চিত্রিত নারীজীবনের গার্হস্থ্য ও সারস্বত জীবনালেখ্য বিশেষত সত্যবতী চরিত্রের মানসিক বিবর্তন, শিক্ষা, আত্মসচেতনতাবোধ, সমাজে মানুষ হিসাবে মর্যাদা লাভের জন্য নিরন্তর সংগ্রামের চিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম *সুবর্ণলতা : আত্মসংগ্রামের স্বরলিপি*। এই অংশে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সুবর্ণলতার আত্মসংগ্রাম, স্থূল অমার্জিত গার্হস্থ্য জীবনপরিধি থেকে মুক্তির ব্যাকুলতা, বহির্জগতের সঙ্গে আত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগের জন্য সংগ্রামের দিনলিপি অংকিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম *বকুলকথা : নারীর* সংগ্রাম ও সত্তা অর্জনের পরিণতি-পর্ব। এই পরিচ্ছেদে আমরা বকুলের লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ, আধুনিক নারীর জীবনচিত্র, আধুনিক নারী সম্পর্কে তার মনোভঙ্গি, বকুলের অন্তরালে স্বয়ং বকুলের স্রষ্টা আশাপূর্ণা দেবীর আত্মজৈবনিক প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম *ত্রয়ী উপন্যাসে নারী জীবনের রূপায়ণ-কৌশল*। এখানে ট্রিলজি এবং আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অন্তবর্য়নের পদ্ধতি, ঘটনা ও চরিত্র রূপায়ণ-কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম ত্রয়ী উপন্যাসের *ভাষারূপ*। এই অংশে আমরা ত্রয়ী উপন্যাসের ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পসাফল্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছি। সেই সাথে নারীরচিত উপন্যাসের ভাষা পুরুষরচিত উপন্যাসের ভাষার তুলনায় স্বতন্ত্র কিনা তাও চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপসংহার অধ্যায়ে আমাদের সমগ্র আলোচনার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি অংশে গবেষণার মূল গ্রন্থ এবং অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত সহায়ক গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজ ও সাহিত্যে নারীর জীবনচিত্র : প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

মানবেতিহাসের সূচনাপর্বে মানুষ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে আবদ্ধ। জীবন ধারণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য তারা দলবদ্ধভাবে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। বনের ফলমূল সংগ্রহের প্রধান উপকরণ ছিল পাথরের তৈরি হাতিয়ার। এসব হাতিয়ার দিয়ে তারা পশুশিকার করত। এর অব্যবহিত পরে মানুষ আবিষ্কার করে তীরধনুক। এগুলোই ছিল বন্য অবস্থায় মানুষের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এর দ্বারা মানুষের কাছে পশুশিকার অনেকটা সহজ হয়ে যায়। ক্রমে মানুষ স্থিত হতে আরম্ভ করে এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে গ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করে। পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ শিখল লোহা গলিয়ে হাতিয়ার তৈরির কৌশল। এই পর্যায়টি লৌহসভ্যতার সূচনা ঘটায়।[১] তবে গোষ্ঠীতে নারীর অবস্থান নির্ণয়ের সূত্রে বলা যায় যে, মানবসভ্যতার খাদ্য আহরণ পর্বের পূর্ববর্তী জীবনধারা থেকেই নারীকে সন্তান জন্ম, লালন-পালন করতে হয় বলে সে ক্রমেই বাইরের কর্মজগৎ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। নারীর এই অবস্থানে গৃহবদ্ধতা ও সন্তান রক্ষণাবেক্ষণের সূত্রে এক ধরনের অধস্তন অবস্থা তৈরি হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই অধস্তন অবস্থান ও জীবনসৃষ্টির জৈবিক ভারবহন এবং তার ফলে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে পুরুষের সঙ্গে তার পার্থক্য তৈরি হয়, যেগুলি নারীর সীমাবদ্ধতাকে কঠোরতর করে তুলতে সাহায্য করেছে। ঐ সবেরই মূলে রয়েছে দীর্ঘকালীন জৈবিক ও সামাজিক শর্তসমূহ দ্বারা সৃষ্ট ও চর্চিত নারীর প্রকৃতিগত ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ। প্রাচীন যুগের নারীরা শারীরিক ও মানসিক শক্তির দিক দিয়ে স্বাধীন ও মুক্ত থাকলেও গর্ভকালীন অবস্থা, সন্তান জন্মানোর পর তাদের শিশুদের স্তন্যদানকালীন সময়ে বাধ্য হয়েই তারা পুরুষের সাহায্য, সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণের আশ্রয় নিত।[২]

এ অবস্থাকে আরও দৃঢ়তর করে কৃষিব্যবস্থায় প্রযুক্তি ব্যবহারের বাস্তবতা ও তার ফলে উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ। তাছাড়া ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনসম্পত্তি প্রয়োজনের তুলনায় উদ্বৃত্ত হতে শুরু করায় সম্পদের উত্তরাধিকার নির্ণয়ের প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, নৃতাত্ত্বিকদের মতে, কৃষিকাজের উদ্ভব মেয়েদের হাতে। মেয়েরাই যে চাষ করে ফসল ফলানোর প্রথার সূচনা করে তার প্রমাণ রয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতাসমূহে পরিদৃষ্ট মাতৃদেবীর পূজার প্রচলনে। ড. অতুল সুর তাঁর *মহাভারত ও সিন্ধুসভ্যতা* গ্রন্থের 'সিন্ধু ও বাঙালি' অধ্যায়ে মন্তব্য করেন, "মনে হয়, মাতৃদেবীর পূজার সূচনা হয়েছিল মবোপলীয় যুগের ভূমিকর্ষণের পদক্ষেপে। প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল পশুমাংস। সেজন্য তাকে পশুশিকারে বেরোতে হতো। অনেক সময় তাদের শিকার থেকে ফিরতে দিনের পর দিন কেটে যেত। এই সময় মেয়েদের ভাবনা-চিন্তায় স্থান পায় এক কল্পনা। সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়া তাদের জানাই ছিল। যুক্তির আশ্রয় নিয়ে তারা ভাবতে থাকে যদি নারীরূপ ভূমি (আমাদের সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মশাস্ত্রেই নারীকে 'ক্ষেত্র' বা 'ভূমি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে) কর্ষণ করে সন্তান উৎপাদন করা যায়, তবে মাতৃরূপ-পৃথিবীকে কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করা যাবে না কেন? মেয়েরা এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে ভূমি কর্ষণ করলো। যখন ফসলে মাঠ ভরে গেল, তখন পুরুষ তা দেখে অবাক হল। ফসল তোলার পর থেকে যে প্রথম নবান্ন উৎসব হল, সেই উৎসবেই জন্ম নিল লিঙ্গ ও ভূমিরূপী পৃথিবীর পূজা।"[৩]

আদি কৃষিজীবী সমাজে নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল সম্মানজনক। এর কারণ হিসাবে বলা হয় যে, প্রথমত, আদিম কৃষিকাজ মেয়েদেরই আবিষ্কার। দ্বিতীয়ত, জমির উর্বরতা এবং নারীর সন্তানধারণ ক্ষমতাকে আদিম চিন্তায় এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য করা হত। এই সাদৃশ্য থেকেই মনে করা হত যে, নারীরাই কৃষিসংক্রান্ত যাদুক্রিয়ার অধিকারী, কারণ তারাই উৎপাদনের মূল রহস্যটি জানেন। তাই নারী পুরোহিতের মাধ্যমেই এই সমস্ত সমাজের ধর্মাচারগুলো সম্পন্ন হত। যেখানে উৎপাদনের প্রয়োজনে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নারীর গুরুত্ব ছিল, সেখানে অনিবার্যভাবে নারীর আসনও ছিল সম্মানিত।[৪]

আদিম যুগের এই পর্যায়ে সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডি. ডি. কোশাম্বির মতে, ভারতবর্ষে এই সময়টি ছিল প্রায় খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে সিন্ধুসভ্যতা প্রচলনের অব্যবহিত পূর্বের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সমাজ, যখন মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে পরিবর্তন-ক্রিয়াটি সংঘটিত হচ্ছিল, তারও পূর্বের একটি সমাজব্যবস্থা। মাতৃতান্ত্রিক আদিম সমাজে মানুষ প্রায় অজ্ঞই থাকত তাদের জন্ম সম্বন্ধে। প্রকৃত পিতা কে তা অজানা থাকায় সন্তানদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের কোনো প্রশ্নই ছিল না। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী সন্তান কেবল মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত।

প্রাচীন কৃষিনির্ভর ঐ সমাজে নারীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। কৃষিক্ষেত্র উন্নত হয়ে সম্পত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারী হয়ে পড়ে পুরুষের অধীন। আদিম কৃষিজীবী সমাজে নারীর সম্মানের আসনটি অনেকাংশে ম্লান করে দেয় লাঙ্গলের প্রচলন। ধাতু আবিষ্কারের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। "তাছাড়া লোহার তৈরি লাঙ্গলের সাহায্যে কৃষি উৎপাদনে যে বিপ্লবটি ঘটল, তার ফলে উৎপন্ন হতে লাগল পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত ফসল এবং সে ফসল তৈরি হতো পুরুষের পরিশ্রমে। কৃষিকাজে মেয়েদের অগ্রাধিকার আর রইল না, কারণ পারিবারিক লাঙ্গল চালনা করাটা শারীরিক কারণেই মেয়েদের পক্ষে সাধ্যাতীত।"[৫]

উদ্বৃত্ত ফসল উৎপাদনকারী এই কৃষিভিত্তিক সমাজ ক্রমে জটিলতর হতে থাকে এবং অনিবার্যত নারী পুরুষের প্রভুত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়। পুরুষের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রক্রিয়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে নারী তার কর্মক্ষেত্র হারানোর সাথে সাথে তার পূর্ববর্তী অবস্থান সম্মান ও মর্যাদাও হারিয়ে ফেলতে থাকে। নারী বিনাশর্তে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে।

ভারতীয় সাহিত্যধারার প্রাচীনতম নিদর্শন *ঋগ্বেদে* (১২০০ থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এই পরিবর্তিত সমাজের সন্ধিক্ষণটির প্রচ্ছন্ন প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। উল্লেখিত সময়পর্বে "কৌম সমাজ ভেঙে গিয়ে গোষ্ঠীগুলি পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং নতুন সামাজিক মূল্যবোধের উন্মেষে পারিবারিক সম্পর্কও পরিবর্তিত হলো। সমাজ কাঠামোয় প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হলো এবং গৌরব হানি ঘটল নারীর।"[৬]

ঋগ্বেদের যুগে ভারতে আর্যীকরণের প্রাক্কালে আর্য-অনার্যের সংঘাতদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই সময়ে পরিবারের সমস্ত কর্তৃত্ব পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পরিবারের অভ্যন্তরে তখনও কতকাংশে নারীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ন ছিল—পূর্ববর্তী মাতৃপ্রধান সমাজধারার অবশেষ রূপে। তবে সেটাও ছিল পুরুষ কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত। ওই সময় নারীরা বেদমন্ত্র রচনা করতেন। লোপামুদ্রা, অপলা, মৈত্রেয়ী, ইন্দ্রাণী, উর্বশী প্রমুখ বেদমন্ত্র রচয়িতার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমাজ-গঠন ও অর্থনৈতিক উৎপাদন-পদ্ধতির জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে ঋগ্বেদের যুগের এই অবস্থা পরিবর্তনকালে নারীর অবস্থানগত পরিসর আরও খর্ব হয়ে আসে। আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব ও সমান্তরালভাবে নারী-পুরুষ সংঘাতটিও ক্রমে তীব্র ও জটিল রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। বিশেষত, কৃষিসভ্যতার বিকাশের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ায় নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষনির্ভর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বিবাহপ্রথার কঠোর বন্ধনে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। "কৃষিসভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুরুষ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল এবং এই সময় থেকেই যেহেতু সমাজে নারী অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের ওপর একান্ত নির্ভরশীল হতে শুরু করল, তাই সমাজে ক্রমশ তার মর্যাদা হ্রাস পেল, তাছাড়া আর্যপুরুষেরা প্রায়ই অনার্য গোষ্ঠীভুক্ত যেসব নারীকে বিয়ে করত, সমাজে তাদের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি না থাকার ফলেও সাধারণভাবে নারীর সামাজিক অবমূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। বারাঙ্গনাদের সাহচর্যে পুরুষরা যেমন অভ্যস্ত ছিল, তেমনি পরস্ত্রীগমনেও কোন বাধা ছিল না, একমাত্র নির্দিষ্ট কিছু অনুষ্ঠানের দিনে এই ধরনের সম্পর্কে কিছু বাধা ও নিষেধ নির্দেশিত ছিল। স্ত্রীকে যদিও অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়েছে, তবুও বারে বারে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পুরুষের তুলনায় নারী সমাজে সর্বপ্রকারে হীন বলেই বিবেচিত। বিবাহকে সমর্থন করা হলেও নারীর বহু-বিবাহের ওপর কঠোর বিধি নিষেধ নেমে এসেছিল।"[৭] অর্থাৎ বিবাহবন্ধনের কঠোর রূপটি নারীর অধ্যস্তন অবস্থাকে দৃঢ়তর করতে থাকে এবং এ সংক্রান্ত নানা বিধি-নিষেধের প্রবলতা তার জীবনকে একভাবে বন্দিদশায় নিপতিত করতে থাকে।

ঋগ্বেদে নারীর সহমরণের কোন উল্লেখ নেই। নারীর সহমরণের বিষয়টি প্রথম পাওয়া যায় *অথর্ববেদে*, পাশাপাশি নারীর বহুবিবাহের স্বীকৃতির কথাও এখানে উল্লেখিত। "অথর্ববেদের সমসাময়িককালের সমাজে বিবাহ সকল নারীর পক্ষেই আবশ্যিক বলে বিবেচিত হত এবং অনূঢ়া পিতৃগৃহবাসিনী পরিণত বয়স্কা কন্যা সমাজের দৃষ্টিতে কণ্টকস্বরূপ হয়ে উঠত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে নববধূর প্রতি যে ধরনের আশীর্বাণী বর্ষিত হয়েছিল তার থেকে অথর্ববেদের সমান পরিস্থিতির মৌলিক পার্থক্য ঘটে গিয়েছিল। প্রতিষ্ঠাপন সুক্ত ও অন্যান্য নিদর্শন থেকে দেখা যায় নারী সেই সমাজে স্বাধীনতা ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে"।[৮]

এ-সূত্রে আরেকটি জটিল বিষয় বিবাহ ও নারী পুরুষের প্রেম সম্পর্ক। ঋষিদের চিন্তাভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা নারীর যৌন অবস্থানটিকেও বুঝে নিতে পারি। বিবাহপদ্ধতির ভিত্তিই হচ্ছে পুরুষের কামনা। পুরুষকে সঙ্গ দান, তাকে শারীরিক তৃপ্তি দানের জন্যই নারীর সৃষ্টি। নারীর প্রতি পুরুষের কামযুক্ত প্রেমকে *বৃহদারণ্যকোপনিষদে* ব্রহ্মোপলব্ধির উপমান রূপে উপস্থাপন করে যাজ্ঞবল্ক্য তাকে চূড়ান্ত মর্যাদা দিয়েছেন।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের অনেক অংশে নারীকে স্বামীর অর্ধাংশ বা যজ্ঞের অর্ধেকরূপ কিংবা সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হলেও তা একটি খণ্ডচিত্র মাত্র। অধিকাংশ স্থানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবিশ্বাস ও তাচ্ছিল্যই অভিব্যক্ত। উপনয়নের অধিকার নিষিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞস্থলে নারীর উপস্থিতি নিতান্তই প্রথাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অথচ গৃহধর্ম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীর অস্তিত্ব, শ্রম ও সাধনা অপরিহার্য। নারী একদিকে গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজন মেটায় অপরদিকে বংশগতির ধারাকে সচল রাখে। ইত্যাকার ক্ষেত্রে নারী আবশ্যিক হলেও নারীকে সন্দেহ বশত পুরুষের প্রহরায় রাখা হত। অথচ

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ তার খেয়ালখুশি অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী একই 'ঙ্গে রাখতে পারত। এবং এটাকে তারা 'সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক' হিসাবে বিবেচনা করত।

তৎকালীন নারীশিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। ক্রমেই লক্ষ করা গেল যে, পুরুষের জৈবিক ও মানসিক চাহিদা পূরণার্থে একমাত্র গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীরাই শিক্ষালাভ করত। কারণ শিক্ষিত গণিকা পুরুষের মনোরঞ্জনে অনেক বেশি পারদর্শী। তবে "অনুমান করা যায়, হয়তো সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রশিল্পে কিছু কিছু কুমারীর অধিকার ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা থেকে সাধারণভাবে সে বঞ্চিতই ছিল। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল; বৃহদারণ্যক উপনিষদে পণ্ডিত কন্যা পাবার জন্য পিতা-মাতার আচরণীয় অনুষ্ঠানের কথাও আছে; কিন্তু সে ব্যতিক্রমই"।[৯]

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থান আরও হীনতর হতে থাকে। প্রত্নকথার দোহাই দিয়ে দাবি করা হয়, স্রষ্টা নিজেই নারীকে হীন করে সৃষ্টি করেছেন। নারী পুরুষের সঙ্গে সমান পারদর্শিতায় অধ্যাত্ম আলোচনায় যোগদান করতে চাইলেও তাকে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখানো হত। এমনকি নারী পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে অস্বীকৃতি জানালে প্রয়োজনে তাকে উৎকোচ প্রদানের প্রলোভন দেখানো হত। তাতেও রাজি না হলে নারীকে শারীরিক-মানসিক শাস্তির বিধান দেওয়া হত।

প্রাচীন ঋষিগণ নারীকে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ করার বিচিত্র যুক্তি দান করে গেছেন। *তৈত্তিরীয় সংহিতা* ও *ব্রাহ্মণে* উল্লেখিত আছে যে, যজ্ঞে একটি দণ্ডকে বেষ্টন করে থাকে দুটি বস্ত্রখণ্ড; তাই পুরুষ দু'টি স্ত্রী গ্রহণের অধিকারী, একটি বস্ত্রখণ্ডকে দু'টি দণ্ড বেষ্টন করে না, তাই নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ। অর্থাৎ নারী যজ্ঞের একটি দণ্ড মাত্র। অন্যত্র বর্ণিত আছে 'একস্য পুংস্যে বহ্যো জায়া ভবন্তি'—এক পুরুষের বহু পত্নী হয়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের শাস্ত্রহেতু নির্ণয়ের ছলে যজ্ঞের বিধিবিধানের দোহাই পাড়লেও আসলে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের প্রচলিত কিছু আচরণের শাস্ত্রীয় সমর্থন জোগানো এবং এ ধরনের ব্যাখ্যায় শুধু পুরুষের সুবিধাজনক আচরণেরই সমর্থন পাওয়া যায়। "সম্ভবত পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত নারীর বহুপতিত্ব এ সময়েই নিষিদ্ধ হতে শুরু হয়, তাই আপাতযুক্তির মত এক যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের অনুপুঙ্খকে হেতুরূপে উপস্থাপিত করা হল। এখানে পুরুষের দুটি স্ত্রী গ্রহণের কথা বলা থাকলেও কার্যত পুরুষের বহুবিবাহের অনেক নিদর্শন দেখতে পাই। রাজাদের তো বৈধ পত্নীই চারটি থাকত যজুর্বেদের আমল থেকেই—মহিষী, বাবাতা, পরিবৃত্তি ও পালাগলী। এছাড়াও বহু উপপত্নীও থাকত রাজঅন্তঃপুরে। মৈত্রায়ণী সংহিতায় দেখি মনুর দশটি ও চন্দ্রের সাতাশটি স্ত্রীর উল্লেখ আছে। বহু স্ত্রী থাকলেও তাদের প্রতি সমদর্শিতা নাকি প্রত্যাশিত ছিল, তাই চন্দ্র রোহিণীর প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলেন বলে তাঁর যক্ষা হয়। সেইজন্য যক্ষার অন্য নাম 'জায়েন্য'। বিবাহে কন্যা দান করা হত স্বামীকে নয়, স্বামীর পরিবারকে, "কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়তে"। এর কুফল আজও প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখা যায়–শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-ভাসুর, দেবর সকলে মিলেই বধূকে যে নির্যাতন করে সে তো এই অধিকারেই।[১০]

পরবর্তী সাহিত্যে নারীকে যেভাবে ভোগ্যবস্তু বা পণ্যদ্রব্য হিসেবে উপস্থাপন করা হতে থাকে তার শক্তি যোগায় ওই বৈদিক সাহিত্যই। ক্রমেই ওই ভোগ্যত্ব ও পণ্যত্বেই জোর দেওয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। রামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করার সময়েও বলেন যে, পরহস্তগতা নারীকে তিনি ভোগ করতে পারবেন না; এই হল প্রাচীন ভারতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সার কথা, অর্থাৎ সমাজে দৈহিক সতীত্বের প্রশ্নটি প্রবল হতে থাকে এবং ক্রমেই দুর্ভেদ্য অন্তরালে নারীকে সরে যেতে হয়। এরই পরবর্তী দুইশত বছর বিবিধ বিধানশাস্ত্রের সামাজিক শৃঙ্খল নারীকে নানাভাবে শৃঙ্খলিত করেছে। নিজের অজান্তে নারী পরিণত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের দাসীতে। তবে নিরঙ্কুশ শাসন ও শোষণ কোন মানুষই দীর্ঘকাল মেনে নিতে পারে না। তাই ভেতরে ভেতরে নারীর প্রতিবাদ ধূমায়িত হতে থাকে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে–হাজার বছরের রুদ্ধদ্বার খোলার নতুন প্রহরে।

সমাজে নারীর গণিকা-রূপ অবস্থানটি এসূত্রে বিশ্লেষণের যোগ্যতা রাখে। বৈদিক যুগের সাহিত্যে যে গণিকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পরবর্তী সাহিত্যে তা নিয়ে নানা কাল্পনিক উপাখ্যান তৈরি হয়েছে। গণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে *মহাভারতের* মৌষলপর্বে বর্ণিত আছে যে, যাদব বৃষ্ণিবংশের নারীদের দস্যুরা হরণ করার ফলে তারা গণিকা হয়ে যায়। *মহাভারত* ও *মৎস্যপুরাণে* গণিকার উদ্ভব সম্বন্ধে নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর *সময় মাতৃকা* গ্রন্থে বলেছেন দুশ্চরিত্রা জননীরা পরপুরুষের দ্বারা ভুক্ত তাদের কন্যাদের অন্যদেরকে দান করত; এরাই গণিকা হয়ে যেত। ঠিক কেমন করে কখন নারী সমাজে গণিকারূপে আবির্ভূত হল তা নির্ণয় করা কঠিন। বাৎস্যায়নের *কামসূত্রে* উল্লেখ আছে যে, পুরুষ নারীকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে এনে ভোগ করত। এভাবে ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হতে হতে নারী সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

রামায়ণ [খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-খ্রিস্টীয় তৃতীয় অব্দ] *মহাভারত* [খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-খ্রিস্টীয় পঞ্চম অব্দ]-এর যুগেও নারী ছিল লাঞ্ছিত, অবহেলিত, ভোগ্যবস্তু। পুরুষ তার বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও ধর্মাধর্মের সুবিধার্থে নারীকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। "*রামায়ণ-মহাভারত* কিংবা *ইলিয়াদ-ওদিসির* মতো আদি মহাকাব্যগুলির কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে নারীর অসম্মানকে কেন্দ্র করে মানুষের আদিম বৃত্তির সঙ্গে তার সুন্দরের, শুভ এষণার সংঘর্ষ। রামায়ণ-মহাভারতের যুগে স্ত্রীকে স্বামীর হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিতুল্য জ্ঞান করা হত। মহাভারতের যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশা খেলায় পণ হিসেবে রেখে বাজি হারেন এবং বিজয়ী কৌরবদের হাতে দ্রৌপদীকে তুলে দিতে বাধ্য হন।"[১১]

রামায়ণে সীতা রামের প্রিয়তমা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সীতা যে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি সে ইঙ্গিতও আছে। যেমন—

> অহং হি সীতাং রাজ্য প্রাণাধিষ্টান ধনানিচ।
> হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোচ্ছিত।
>
> [বাল্মীকি, *রামায়ণ*, অযোধ্যাকাণ্ড ১৯/৭]

অর্থাৎ আমি নিজেই আমার ভাই ভরতকে রাজ্য, প্রাণ, অন্যান্য কাম্যবস্তু, ঐশ্বর্য এমনকি সীতাকেও দান করতে পারি। এরূপ মনোভাবের কারণেই সীতাকে উদ্ধারের পর রাম সীতাকে পুনরায় ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তা না হলে রাম উচ্চারণ করে বলতে পারতেন না : নোৎসহে পরিভোগায়, [তোমাকে] ভোগ করতে পারি না। নারীর এই ভোগ্যবস্তুর ভূমিকা *রামায়ণ* ও *মহাভারতে* নানাভাবে চিত্রিত আছে উপাখ্যানের আঙ্গিকে। এছাড়াও অসংখ্য উপাখ্যানে নারী এই ভূমিকায় অবতীর্ণ। একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋষিকুমার গালব যযাতির কাছে এলেন, গুরুদক্ষিণা দেওয়ার সঙ্গতি নেই, তাই রাজা যদি তাঁকে অর্থসাহায্য করেন। ঠিক সেই সময় যযাতির অর্থসংকট ছিল, তাই রাজা গালবকে তার সুন্দরী তরুণী কন্যাকে নিয়ে যেতে বলেন। মাধবীর ঔরসে কোন রাজার যদি পুত্রসন্তান লাভ হয় তাহলে রাজা বিনিময়ে তাকে অর্থ প্রদান করবেন। গালব মাধবীকে পর পর তিনজন রাজার কাছে এক এক বছরের জন্য দিলেন। এতে তার গুরুদক্ষিণার অর্থ সংগৃহীত হল। এই কাহিনীতে নারীর স্থান মর্মান্তিক-ভাবে স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ নানা কারণে নারীর অবমূল্যায়ন প্রয়োজনীয় মনে করেছিল—যার একটি অতিপ্রকট রূপ হল অবরোধ-প্রথা। এ ব্যাপারে যুক্তি উপস্থাপন করা হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত বহু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নারীকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ছিল, তাই অবরোধ প্রথা বিস্তৃতি ও কঠোরতা লাভ করে। এ যুক্তি তুর্কি আক্রমণ (১২০১ খ্রি.) সম্পর্কেও দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের মতে, প্রসঙ্গটি নারীশিক্ষার সুযোগর সঙ্গে জড়িত। পুরুষপ্রধান সমাজে নারী শিক্ষিত, স্বাবলম্বী হলে অসহায় হয়, এ কথাও উচ্চারিত হল, তবে এটি বলা হল না যে, পরমুখাপেক্ষি হলে নারী আরও বেশি অসহায় হয়। কাজেই এসব কুযুক্তি নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যই সৃষ্ট। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যখন সমাজে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রেণী সৃষ্টি হল, যে শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যেই নারী তার পূর্বেকার অধিকার থেকে উত্তরোত্তর বঞ্চিত হতে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিকাশের অনুপাতে নারী তার শিক্ষার অধিকার ও যৌনজীবন বা আত্মিক স্বাধীনতা হারায়। বলা বাহুল্য, এ অপচেষ্টা সর্বত্র সার্থক হয়নি। নারী তার নিরুদ্ধ প্রণয়চেতনাকে অবৈধ পথে উন্মোচন করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের স্বাধীনতা খুঁজে নিত। অলংকারশাস্ত্রের অধিকাংশ উদাহরণ-শ্লোকই অবৈধ প্রণয়ের দৃষ্টান্ত। 'জার' বা 'জারিণী' *ঋগ্বেদ* থেকেই অসংখ্যবার ব্যবহৃত। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাৎস্যায়ন *কামসূত্র* রচনা করেন, তাতে অসংকোচে পরস্ত্রী ও অনূঢ়া কুমারীকে কীভাবে প্রলুব্ধ করে অনুকূলে এনে ভোগ করা যায় তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। কাজেই এটা অনুমান করলে ভুল হবে না যে, কুলস্ত্রী মাত্রে অবরোধের মধ্যে থাকলেই সতীসাধ্বী থাকত। এর ফলে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত পুরুষ স্ত্রীর জীবন বিষাক্ত করে তুলত এবং যখন নারীর সতীত্ব নিয়ে আশ্বস্ত থাকত না বলে সর্বদা দুশ্চিন্তা ভোগ করত যে, তার যত্নে উপার্জিত সম্পত্তি চলে যাবে স্ত্রীর উপপতি বা প্রেমিকের জারজ সন্তানের হাতে। এর ফলে বিষময় হয়ে ওঠে নারীর জীবন। এরই প্রতিক্রিয়ায় রামচন্দ্র যে সন্দেহের বিষ ঢেলে দিলেন সমাজমানসে, সে অন্যায়-অবিচারের প্রবর্তন করলেন, তার ফল এখনও অব্যাহত আছে। সন্দেহে পরিত্যক্ত অসংখ্য নারী এখনও দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। "পুরাণে নারীর চূড়ান্ত অবমাননা অসংকোচে, অসংখ্যবার উচ্চারিত। তার পরবর্তী ব্যাপ্তি লক্ষ করা যায় রামায়ণ-মহাভারতের ব্রাহ্মণ্য ভ্রূক্ষেপে। ক্ষত্রিয় কাহিনীতে নারীর যে চিত্র আগে থেকে ছিল তা যথাসম্ভব তেমনি রাখা আছে, রসোত্তীর্ণ যে সাহিত্য সমাজে স্মৃতিতে ভাস্বর, তাকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা ব্যর্থ হত, তাই। কিন্তু এ রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকেই জনশিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার করল সমাজের ব্রাহ্মণ্য মূল্যবোধের প্রবক্তরা। জনগণকে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে।"[১২]

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সমাজে নারীর যে অধস্তন অবস্থা পরবর্তী সমাজেও প্রায় একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। তখন থেকে আজও সমাজে বিভিন্ন পুরুষের বহুবিবাহের কথা উল্লেখ থাকলেও নারীর বহুপতি গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। বরং তা ছিল অত্যন্ত নিন্দার কাজ। আরও পরে হিন্দু সমাজ কাঠামোতে দেখা যায়, নারী পুরুষের অধীন, লজ্জাশীলা, অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এ সময় তাদেরকে নতুন আঙ্গিকে অন্তঃপুরচারিকা করা হয়। অর্থাৎ প্রাচীন সমাজকাঠামোই এখানে ভিন্নরূপে বহাল থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস তাঁর *অভিজ্ঞান শকুন্তলম*-এ নারীর সমস্যা আরো প্রকট করে চিত্রিত করেছেন। ঘটনাচক্রে তথা পুরুষের কামবাসনার উদ্রেকে—যাকে প্রেম বলা হয়েছে, আশ্রমপালিতা শকুন্তলার বিয়ে হয রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে। প্রচলিত সামাজিক বিধি অনুযায়ী তাকে আশ্রম ত্যাগ করে স্বামী সন্নিধানে সাধারণ গার্হস্থ্য নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। বিদায় মুহূর্তে কণ্বমুনি তাকে (শকুন্তলা) গুরুজনদের শুশ্রূষা এবং সপত্নীদের সঙ্গে সখির ন্যায় আচরণ করার উপদেশ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ না করলেই নারী গৃহিণী পদ প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এ উপদেশ কেবল শকুন্তলার প্রতিই উচ্চারিত হয়নি, সমকালীন সকল নারীই এর উদ্দেশ্য। কণ্ব শকুন্তলাকে স্বামীগৃহে পাঠানোর পর প্রশান্ত চিত্তে মন্তব্য করেছেন, 'কন্যা হল পরের ধন, তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আজ মনটা শান্ত। যেমন শান্ত মন গচ্ছিত ধন ফেরৎ দিয়ে।' তবে সমাজে নারীকে স্বামীর সম্পত্তি হিসাবেই বিবেচনা করা হলেও, যদিও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিল না, যেমন ছিল না শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। স্বামী সেবা, সংসারের যাবতীয় মানুষের মনোরঞ্জনই ছিল তার একমাত্র সাধনা। তবে একথা ঠিক যে, সমাজের উচ্চস্তরের নারীরাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত ছিল। অপরদিকে নিম্ন সম্প্রদায়ের নারীদের বাস্তব কারণেই অর্থোপার্জনের স্বাধীনতা ছিল।

নারী ভোগের উপকরণে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে তার ধর্মাদর্শকেও নিয়ন্ত্রণ করা হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সকল যুগের সমাজে শাসক শ্রেণীর ধর্মীয় ভাবাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারীর নিজের কোন ধর্মমত ছিল না। অধিকার-বঞ্চিতা নারীরা নতুন শাসকের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করত গভীর আগ্রহে। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল যে, যে-কোন নতুন ধর্মবিশ্বাস বা আন্দোলনে নারীরাই প্রধান প্রচারক ও সমর্থক হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে এটা বলা যায় যে, প্রত্যেক নতুন শাসক তার শাসননীতি প্রচারের সময় নারীর জন্য ঘোষিত প্রচলিত সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসনের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি লাভের আশায় নতুন শাসকের সমর্থিত ধর্মগ্রহণেও নারীসমাজ এগিয়ে আসতো ব্যাপকভাবে।[১৩]

উক্ত অবস্থার ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা গেল যে, বৌদ্ধ ধর্মের সূচনাপর্বে [প্রায় খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে চারশ শতাব্দী থেকে দেড়শ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে] চলতি সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার আশায় হাজার হাজার নারী সংস্কার-ধর্ম ত্যাগ করে ভিক্ষুণী সংঘে আশ্রয় নিয়েছিল। রাজরানি থেকে শুরু করে ভিখারি, বিদূষী সাধারণ গৃহবধূ এমনকি পতিতা মেয়েরা পর্যন্ত ভিক্ষুণী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন বৌদ্ধ গাথায় এই তথ্য জানা যায় যে, সংস্কার ও সমাজের নানা রকম নির্যাতন ভোগ করে যারা বৌদ্ধধর্মে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঋষিদাসী, ভদ্রা, আম্রপালী, বিমলা, অর্ধকালী প্রমুখ। কিন্তু দৃশ্যত মুক্ত হলেও আসলে এঁরা নতুন আর এক রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। বৌদ্ধধর্ম নারীদের মঠ জীবনের অধিকার দিলেও পূর্ণ ব্যক্তিক স্বাধীনতা দেয় নি। ভিক্ষুকদের দেখলেই ভিক্ষুণীরা তাঁদের অভিবাদন জানাতে বাধ্য থাকতেন। তা ছাড়া গৃহহীন হতে শিখিয়েও বৌদ্ধধর্ম আবার নারীকে সংঘের শৃঙ্খলার নামে কিছু বিধিনিষেধও দিতে থাকল। ক্রমে উদ্ভূত নানা জটিলতায় বৌদ্ধধর্মে এই বিশ্বাস জায়গা করে নিল যে, যে ধর্ম নারীকে গৃহহীন হতে শেখায় তার সামাজিক মূল্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। কেননা বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলেও তখন মনুর শাসনেই সমাজ চালিত হত। ফলে বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী হওয়ায় সমাজে নারীর অবস্থার কোন উন্নতি তো হয়ইনি বরং সঠিক অর্থে নারীর আরও অবনয়ন ঘটে। ওই সময় মূলত সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানগত কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। কঠোরতর মনুর অনুশাসনে সমাজে নারী ও শূদ্র ছিল সমগোত্রীয়। এর বিপরীতে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র নারী ও শূদ্রকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছিল, বিশেষ করে তন্ত্রপ্রভাবিত বাঙালির লোকায়ত সমাজে সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমানাধিকার ছিল স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে তন্ত্রের প্রভাব ও নারীর জীবনচিত্রের ইতিনেতি রূপটি প্রসঙ্গত লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাপদে (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীকাল পর্যন্ত রচিত) দেখা যায় যে, নারী জীবন ধারণের জন্য কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন। সংসারের নিত্যদিন অভাব অনটন লেগে থাকলেও তাতে অতিথি সমাগম কম হয় না। খাদ্যের সংস্থান না থাকলেও ব্যাঙের মত সংসার বেড়েই চলেছে। চর্যাপদে নারীর স্বাধীন বৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে স্বাধীন বৃত্তিধারী নারীরা সবাই ছিল অন্তবাসী। উচ্চশ্রেণীর নারীদের স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না বলেই মনে হয়। এখানে আরও দেখা যায় নারী নানাভাবে জীবিকা উপার্জন করত। কেউ তাঁত বিক্রয়ের কাজ করত, কেউ বিক্রয়ের জন্য চাঙারি তৈরি করছে। আবার কেউ কেউ গণিকাবৃত্তিতেও নিযুক্ত ছিল। শুণ্ডিনীরা মদ চোলাই করত এবং তাদের দ্বারে বিশেষ চিহ্ন দেখে লোকেরা সেখানে আসা-যাওয়া করত। নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়কলার সঙ্গেও নারীরা সম্পৃক্ত থাকত, তবে এসব বৃত্তি ছিল নিন্দনীয়।[১৪] বিভিন্ন চর্যায় নারীকে কামবিহ্বলা রূপেও চিত্রিত করা হয়েছে। নারীকে সেখানে নাগরালি, কামচণ্ডালী, ছিনাল, পতিতা, লম্পট বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি চিত্র :

দিবসহি বহুড়ী কাউ হি ওর ভই
রাতি ভইলে কামরু জাই।
[চর্যা নং-২]

দিনে বউ কাকের ভয়ে ভীত থাকে, আর রাতে কামরু অর্থাৎ অভিসারে চলে যায়।

মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের অবির্ভাবে [১৪৮৫-১৫৩৩] বাংলার নারীদের মধ্যে অবরোধ থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে নতুন ধরনের জাগরণ এল। এখানে অন্ত্যজ নারীর জীবনচিত্রটি প্রত্যক্ষ হল, তাদের কণ্ঠস্বরও উন্মোচিত ও সোচ্চার হল রাধার প্রতীকে। বৈষ্ণবসমাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এই যুগে "অনেক কুলস্ত্রী বৈষ্ণবমণ্ডলে গুরু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত গৃহিণী সীতা দেবী, নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী—ইঁহারা বৈষ্ণব সমাজে শুধু অতিশয় মান্যই ছিলেন না, সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের একটা বড় অংশ অনেক সময় তাঁহাদের নির্দেশেই পরিচালিত হইত।"[১৫] অন্তঃপুর প্রথা বৈষ্ণবরা অস্বীকার করতেন এবং বলা চলে যে, নারীর স্বাধীন সত্তাকে মর্যাদা দিতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শাস্ত্র আলোচনায়ও নারীরা অংশগ্রহণ করত। আধুনিক যুগে নারীশিক্ষার প্রচলনের পূর্বপর্যন্ত সমাজে শিক্ষার যে ধারা প্রবাহিত ছিল তা বহন করে এনেছিল বৈষ্ণব সমাজ।

কিন্তু চৈতন্যদেব-পরবর্তী সময়ে বৃহত্তম হিন্দু সমাজের দ্বান্দ্বিক জটিলতার প্রতিক্রিয়ায় বৈষ্ণবসমাজ সৃষ্ট নারীর এই মুক্ত অবস্থা বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত বিবাহিতা নারীর কলঙ্কিত জীবনের নানা কাহিনীই তার প্রমাণ। এ সময়ে আবার কৃষ্ণের অনুকরণে মানব-চরিত্রে দেবত্ব আরোপের মাধ্যমে অশ্লীলতার আমদানি হতে থাকে, যা নারী বা পুরুষের আত্মিক প্রণয়সাধনাকে বিকৃত করে তোলে। বিপরীতে মধ্যযুগে হিন্দু কবির আখ্যানকাব্য রচনায় জীবনের স্বাধীন ব্যাখ্যা নেই, দেব বিচারের প্রভাবে এবং প্রকোপে মানবচরিত্র আড়ষ্ট ও সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। আবার রোমান্সধর্মী রচনাধারায় তথা উপখ্যানকাব্যে ধর্মের কথা থাকলেও, মানবচরিত্রে কোথাও দেবত্ব আরোপ করা না হলেও তাতে নারীর দৈহিক রূপবন্দনাকে শেষপর্যন্ত ভোগের বস্তুতেই পর্যবসিত করা হয়েছে। তার কৃতিত্বের মধ্যে একমাত্র গুণবৈশিষ্ট্য রূপে লক্ষ করা যায় রন্ধনপ্রণালীর দক্ষতা।

সমাজের উচ্চবর্গের নারীরা অবরুদ্ধ জীবনযাপন করলেও প্রান্তীয় বর্গে দেখা যায় নারীরা উৎপাদনকর্মে রত এবং অনেকটাই স্বাধীন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্ত্যজ নিম্নবর্গের জীবন বর্ণনার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

কবিরা বাস্তব দৃষ্টির অনুগামী হয়ে নারী চরিত্রে অনেকখানি স্বাধীনতা লক্ষ করেছেন। চর্যাগীতিকায় ডোম্বী বা শবরী এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে বর্ণিত কানাড়া ও লখিয়ার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও বীরত্ব প্রদর্শনের ব্যাপারটিও স্বচ্ছন্দে যোগ করা যেতে পারে। মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ অঙ্কিত চুয়াড় জাতির ফুল্লরার মধ্যেও নারীকে পুরুষের স্বাধীন সহযোগিনীরূপে, এমনকি স্থানবিশেষে প্রতিবাদিনী রূপেও দেখা যায়। এর বিপরীতে চিত্তবান বণিকসমাজের চিত্রে লক্ষণীয় যে, সপত্নী ও অনাথা নারীরা পুরুষের বিলাসসঙ্গিনী মাত্র। সামন্ত জমিদার জীবনের প্রত্যক্ষ চিত্র কবি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের বিদ্যাসুন্দর খণ্ডেও তাই। আবার অন্যদিকে বর্ণসম্প্রদায় ভেদহীন বৈষ্ণব ও বাউল সমাজে নারীদের পুরুষ সমকক্ষতা পরিস্ফুট। আগেই বলা হয়েছে যে, নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতাকে গুরুর আসনে বসে দীক্ষা দিতেন। ফলত সুপ্রত্যক্ষ যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত এবং অভিজাত পরিবারেই নারীর মর্যাদা অস্বীকার করা হয়েছে, আর স্বেচ্ছাচারী পুরুষ যাই করুক না কেন, সে নারীর কাছে অক্ষুণ্ন পাতিব্রত্য ও প্রায় দাসীবৃত্তির দাবী করেছে। এই সমাজের কঠোর অবরোধপ্রথা, গৌরীদানের বিবিধ বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যা নিম্নবর্ণের সমাজে ছিল না। সীতা, সাবিত্রী, বেহুলার সতীত্বের আদর্শ ব্রাহ্মণ-সামন্ত সমাজেরই সৃষ্টি।

মধ্যযুগে পুরুষশাসিত সমাজ সামাজিক-ধর্মীয় বিধানের দোহাই দিয়ে নারীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। অন্ত্যজ ও নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা উচ্চবিত্ত, অভিজাত শ্রেণীর নারীর প্রতি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন ছিল অনেক বেশি কঠোর। গ্রামীণ সমাজ সে তুলনায় যে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় লোককাহিনী, মঙ্গলকাব্যে। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* [চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী] দেখা যায়, রাধা পসরা সাজিয়ে সঙ্গিনীদের নিয়ে নিত্য বেচাকেনা করতে যান। আবার তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করা হয় বড়ায়িকে। মোটকথা, প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীকে একাধারে দেবী ও ক্রীতদাসী রূপে, সন্তনারী ও গণিকা হিসাবে দেখা যায় অর্থাৎ সাহিত্যিক রূপায়ণে নারীর বিপরীতধর্মী চিত্র এবং নারী সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মনোভাবের পরিচয় যাওয়া যায়। কখনও কখনও সেখানে অশ্রুত বিদ্রোহ ও মানবিকতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। পরস্পর বিরোধী হলেও দুই রূপই সামাজিক পরিচয় বহন করে। এ-সূত্রে সেসব ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে আমাদের সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করা প্রচলিত নীতি। কন্যাসন্তান অনেকখানি আর্থিক দায় বহন করে। তাই প্রচলিত নিয়মে তার জন্মদানে পিতা-মাতা হতাশ ও অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু মধ্যযুগের কোন কোন আখ্যানে এই ধারণার পোষকতা পাওয়া যায় না। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের *মনসাবিজয়* [পঞ্চদশ শতাব্দী], মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল* [ষোড়শ শতাব্দী], দ্বিজ মাধবের *মঙ্গলচণ্ডীর গীত* [ষোড়শ শতাব্দী], আলাওলের *পদ্মাবতী* [সপ্তদশ শতাব্দী] ও মানিকরাম গাঙ্গুলির *ধর্মমঙ্গল* [অষ্টাদশ শতাব্দী] কাব্যে কন্যার জন্মের কথা আছে, কিন্তু কোথাও সে কারণে নিরানন্দের সঞ্চার হয় নি। বরং এই সব কাব্যের সাক্ষ্য বিপরীতধর্মী। বিপ্রদাসের কাব্যে সুমিত্রা ও সাহে সওদাগর 'কন্যা লাগি পূজে হরগৌরী'—এ কথা থেকে মনে হয় না যে, যখন তাঁদের প্রথম সন্তান হতে যাচ্ছে, তখন তাঁরা কন্যার জন্মই কামনা করছেন? এই কন্যা বেহুলা জন্মালে পিতামাতার 'দিঘিয়া সানন্দ বাড়ে মনে' এমনকি, ধাত্রী পর্যন্ত 'হরষিত হৈয়া/কন্যাচার কোলেতে লইয়া/নাড়িচ্ছেদ কৈল ততক্ষণে।' মানিকরামের রঞ্জাবতীর জন্মক্ষণে বেণু রায় ও বিমলার 'কন্যা দেখে দোঁহাকার বাড়িল কৌতুক'। আর আলাওলের পদ্মাবতী রাজকন্যা, তার জন্মলাভ হলে সাতদিন ধরে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে স্ত্রীশিক্ষারও যে আংশিক প্রচলন ছিল, সাহিত্যে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এ চিত্র যে কাল্পনিক নয়, তার অন্য প্রমাণও আছে। চন্দ্রাবতী [ষোড়শ শতাব্দী] ও রহিমুন্নিসার [অষ্টাদশ শতাব্দী] মতো কবি, জাহ্নবী দেবী [সপ্তদশ শতাব্দী] ও হেমলতা দেবীর [সপ্তদশ শতাব্দী] মত বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞানী ও হট্টী বিদ্যালঙ্কার [মৃত্যু আনুমানিক ১৮১০ খ্রি.] ও হট্টী বিদ্যালঙ্কারের [আনুমানিক ১৭৭৫-১৮৭৫] মত পণ্ডিতের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায় সমাজে সীমিতভাবে হলেও নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল যদিও নিম্নবর্গের ব্যাধ সন্তান কালকেতুর বিদ্যাশিক্ষার কোন উল্লেখ কবিরা করেননি, তবে পৈতৃক বৃত্তি সে ঠিকই আয়ত্ত করেছিল, ব্যাধের কন্যা ফুল্লরারও বিদ্যাশিক্ষার প্রশ্ন ওঠেনি।

নিম্নবর্ণের নারী নানা ধরনের জীবিকা গ্রহণ করত। কানা হরিদত্ত বিরচিত *মনসাবিজয়ে* হাসান-হুসেনের সাত বাঁদীর উল্লেখ এবং এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। মনসার সাহসী দাসীর কথাও বলা হয়েছে। এ কাব্যে পুষ্প ও দুগ্ধদধিঘোল বিক্রেতা যুবতীর উল্লেখ পাই এবং চণ্ডীকে ডোমনীর ছদ্মবেশে নৌকা পারাপার করতে দেখি। *চণ্ডীমঙ্গলে* গৃহকর্ম করেও ফুল্লরা হাটে হাটে ঘুরে মাংস বিক্রি করে; সতীনের চক্রান্তের শিকার হয়ে খুল্লনা ছাগল চরায় এবং লহনার বুদ্ধিমতী দাসী দুর্বলা হাট করতে গিয়ে নিজেও বিলক্ষণ মুনাফা অর্জন করে। ভারতচন্দ্র কুজরানী ও খেসোরানীর কথা বলেছেন। দারা ও নিহেরা ফল ও ঘাস বিক্রি করত না ফল ও ঘাস বিক্রেতার স্ত্রী ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বাঙালি নারীদের স্বামীর অধীনে রাখবার যে একটা প্রচলন আমাদের সমাজব্যবস্থায় আছে তার প্রমাণ মুসলমানী নীতিশাস্ত্র রচয়িতার এ বিষয়ে স্পষ্টোক্তি। শেখ সুলায়মানের *অসিয়ত নামা* [ষোড়শ শতাব্দী] সৈয়দ নূরুদ্দীনের *দাকায়েফুল আখবার* বা আব্দুল্লাহর *দোককাতুন নাছেহিন* [অষ্টাদশ শতাব্দী] গ্রন্থে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্বামীর প্রতি সবসময় ভক্তিভাব দেখাতে হবে। স্বামীর আহ্বান শোনামাত্র স্ত্রীর সাড়া দেওয়া শরীয়তের বিধান, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন বাইরে যাওয়া পাপ এবং স্বামী রাগান্বিত হলেও স্ত্রী কোন উচ্চবাচ্য করবে না। শুধু তাই নয়, নারীকে এই বলে সর্তক করে দেওয়া হয়েছে যে, স্বামীর প্রতি কটুক্তি করলে জিহ্বা ৭০ গজ লম্বা হয়ে যায় এবং স্বামীকে দুর্বল ও দরিদ্র বলে অভিহিত করলে সত্তর বছরের পুণ্য নষ্ট হয়।

বিদ্যমান দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর অসন্তোষের কথাও পুরানো বাংলা সাহিত্যে দুলর্ভ নয়। নারীদের স্বামী নিন্দা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের একটা বিশিষ্ট অংশ, এতে সাধারণত নায়কের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন নারীকে নিজের স্বামীর দোষত্রুটি, অসম্পূর্ণতা নিয়ে বিলাপ করতে শোনা যায়। এর বাইরেও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক উক্তি আছে।

আঠার শতকে শুকুর মামুদ লিখেছিলেন *গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস*। এখানে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে বলে এই কাব্যে গার্হস্থ্য ধর্মকে ছোট করে দেখা হয়েছে। এতে সিদ্ধা হাড়িফা বলছেন যে, স্ত্রী হচ্ছে সাধনার বিঘ্ন। এর প্রমাণ রাণী ময়নামতির কথায় পাওয়া যায়, তাঁর মতে, রামের দুর্গতি সীতার কারণে, রাধার জন্য নারায়ণের বিড়ম্বনা আর সংসারের পুরুষ কেবল নারীর বেগার খেটে মরে। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছেন রাজা মানিকচাঁদ। তাঁরই প্রাণরক্ষার জন্য ময়নামতি যখন স্বামীকে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান দিতে আরম্ভ করলেন তখন মানিকচাঁদ বলেন, যে পুরুষ নারীর সেবক হয় সে বর্বর এবং প্রাণ গেলেও তিনি স্ত্রীর সেবক হতে পারবেন না। সমাজে নারীর এই অবস্থা বিরাজমান ছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ পুরো মধ্যযুগব্যাপী এর বিস্তার বিশেষত নবাবী আমলের শেষ পর্বান্তেও তা ছিল অস্তিত্বশীল।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগ

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ফলে উদ্ভব ঘটে বুর্জোয়া শ্রেণীর। এ সময় ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক কাঠামোতেও পরিবর্তন সূচিত হয় এবং শুরু হয় সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের ভাঙন। "এ পর্যায়ে নারীদের একটা বড় অংশ পুনরায় সামাজিক উৎপাদনের কাজে কলে-কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগ দিতে শুরু করে। আঘাত পড়ে চিরাচরিত পরিবারভিত্তিক সমাজ কাঠামোয়। এরই মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী নারী, বলা ভালো, সমাজের নীচের তলার নারী বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ পায়, খুঁজে পায় কাজের মধ্য দিয়ে 'মুক্তির ইঙ্গিত।'[১৬]

তবুও ওই 'মুক্তির ইঙ্গিত'-বহ সমাজেও নারী-পুরুষের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য ছিল। শিক্ষার মাধ্যমে নতুন যুগের পুরুষ তার বোধশক্তি তীক্ষ্ণ করে, চিন্তাশক্তিকে ধারালো করে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাবলী জানতে সক্ষম হয়। এককথায় পুরুষ শিক্ষার মাধ্যমে তার মানসিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর নারীর জন্য যে শিক্ষা তা তার অনুভূতি ও সপ্রতিভ ভাবটা প্রখর করার আয়ুধ হয়ে ওঠে। "সাধারণভাবে নারীদের হৃদয়বৃত্তির ও কল্পনাশক্তির অত্যধিক চর্চা করা হয় বা অবহেলা করা হয়, আর এই অত্যধিক হৃদয়-দৌর্বল্য থাকার দরুনই তারা নানা কুসংস্কার ও প্রতারণার ফাঁদে পড়ে। নারীরাই সবরকম ধর্মীয় কুসংস্কার ও হাতুড়ে বৈদ্যদের শিকার হয়ে থাকে। ইয়োরোপে নারীমুক্তি আন্দোলনের মূলে ছিল উচ্চশ্রেণীর উচ্চতর জীবনযাপনের চেষ্টা, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে নারী আন্দোলনের মূলে ছিল পরাধীনতার গ্লানি, অন্তঃপুরের অবরোধ মোচনের চেষ্টা। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবাবী আমলের পতনের মুখে, স্বভাবতই পরাধীন নারীজাতির অবমাননা চরমে পৌঁছায়। এমনকি ব্রাহ্মণদের কাছে কৌলীন্যপ্রথার দরুন বহুবিবাহ করা একটা ব্যবস্থা বা জীবিকার উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এক এক কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক নারীকে বিবাহ করার মাধ্যমে নারীকে যেভাবে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করা হয়েছিল, ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। অতএব দেখা যাচ্ছে এদেশের নিম্নবর্ণের নারীদের তুলনায় উচ্চবর্ণের নারীদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল।'[১৭]

বস্তুত সমগ্র বিশ্বই নারীমুক্তি তথা প্রগতির ক্ষেত্রে সমাজের নিচুতলার শ্রমজীবী নারীদের তুলনায় উচ্চবর্ণের নারীরা কিছুটা পিছিয়ে ছিল। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শিল্পপ্রযুক্তির অভ্যুত্থানের পথ ধরেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে নানা পরিবর্তন সূচিত হয় বিশেষত বুর্জোয়া শ্রেণী-তার ব্যক্তি স্বাধীনতার রাজনৈতিক প্রশ্নে বিপ্লবমনস্ক হয়ে ওঠে। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) প্রভাব। উদারনৈতিক ভাবধারায় ভাবিত হয়ে অভিজাত বা সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়। যেহেতু মানুষ পশু নয়, তাই শুধু তার শারীরিক প্রয়োজন মিটলেই পরিতৃপ্তি আসে না, প্রয়োজন মনের মিলেরও। কিন্তু তার স্বার্থগত কারণেই পুরুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নারী-পুরুষের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য সযত্নে গড়ে তুলেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ইউরোপে প্রথম তার বিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে। ফরাসি বিপ্লবের পরপরই মেরি ওয়েলস্টোনক্র্যাফট রচনা করেন সুবিখ্যাত *A Vindication of the rights of Women* [১৭৯০] গ্রন্থটি যা নারী অধিকার-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ হিসাবে ঐতিহাসিক মর্যাদাপ্রাপ্ত। এর পরে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৯৭৩) রচনা করেন *The Subjection of Women* [১৮৬৯]। তিনি সর্বপ্রথম নারীর আইনগত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হন এবং নারী-পুরুষ বৈষম্যকে সমাজ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে আরোপিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অধ্যাপক Lobenge Von Stean তাঁর *Women from Stand point of*

Dhaka University Institutional Repository

political Economy-তে এ বিষয়ে এক কাব্যিক চিত্র অংকন করেছিলেন। পুরুষ চায় এমন নারীকে যে শুধু তাকে ভালোইবাসবে না, যার করস্পর্শ তার কপাল স্নিগ্ধ করবে, সংসারে সুখ-শান্তি বয়ে আনবে, হাজার রকম খুঁটিনাটি সমস্যার সমাধান করে সংসারকে পরিপূর্ণ শান্তির আবাস করবে; সর্বোপরি নারীত্বের অপরূপ মমতায় তার পারিবারিক জীবনকে মধুর উত্তাপে সজীব রাখবে। আগস্ট বেবেল তাঁর *নারী, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে* নামের গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন; নারীর এই প্রশংসার সুরের মধ্যেই রয়েছে তার অবমাননা, রয়েছে পুরুষের হীনতম অহমিকা।[১৮]

ইউরোপীয় ভাবধারার অনুকরণে ভারতবর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলনের বিষয়টি প্রথম পর্যায়ে বিশেষত পলাশীর যুদ্ধে (১৯৫৭) মুসলমান শাসকদের পরাজয় এবং ইংরেজ শাসনের সূত্রপাতে ভারতবর্ষের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এদেশে অবস্থানরত ইংরেজদের মধ্যে নারী অধিকারের ব্যাপারে তেমন সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় নি। বরং ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বে এদেশে আগত ইংরেজদের অর্ধেকই হিন্দুধর্মীয় রীতিনীতির অনুগামী ছিল। তারা কালীমন্দিরে ভোগ পাঠিয়ে, বাঈজী নাচিয়ে, খানাপিনার আয়োজন করে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে থাকত। অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রান্তে, বিশেষত, লর্ড কর্নওয়ালিশ এদেশে আগমনের পর ইংরেজরা মার্জিত, পরিশীলিত জীবনযাপন আরম্ভ করে এবং এদেশের স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের পরে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম পাদে কলকাতায় নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে তখনও বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। বাংলার নবযুগের যথার্থ সূচনা হয় রাজা রামমোহন রায়ের [১৭৭৮-১৮৩৩] আবির্ভাবের পর। তিনি যে সময় কলকাতায় ফিরে আসেন (১৮১৪ খ্রি.), তখন সমগ্র ভারতবর্ষ শিক্ষাহীনতায় নিমজ্জিত, কুসংস্কারে ভরপুর, দুর্গোৎসবে বলিদান, আনন্দোৎসবে কীর্তন, দোলযাত্রায় আবীর ছড়ানো, রথযাত্রার গোল—এসব নিয়েই মানুষ কাল অতিবাহিত করত। শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে কারও কোন প্রত্যক্ষ আগ্রহ দেখা যায়নি। "ধনীদের মধ্যে তো কোনোপ্রকার বিদ্যার চর্চা ছিল না। চলিত বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক কাহারও বর্ণশুদ্ধির জ্ঞান ছিল না, বিষয়কর্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্ক জানা থাকিলেও তাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। বুলবুলির ও ঘুড়ির খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীর খেলার ন্যায় আনন্দোৎসবে গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকী প্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্বক খাইতেন।"[১৯] মোটকথা বিত্তবান সমাজ ছিল অবক্ষয় আর অপচয়ে নিমজ্জিত। ধনী ব্যক্তিরা বাঈজী নাচের পিছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করত। আর এই সংবাদ ভদ্রসমাজে মনোজ্ঞ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হত। তবে এইসব কারও কাছেই দোষাবহ বলে বিবেচ্য ছিল না, এমনকি বিদেশিনী ও যবনী নারীদের সঙ্গে সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় হয়ে উঠেছিল।[২০]

উনিশ শতকে প্রথমবারের মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতার যে চিহ্নগুলি নারীদের অধিকারকে চূড়ান্তভাবে পদদলিত করত তার বিরুদ্ধেই নারীর স্বাধিকারের সংগ্রাম শুরু হয়। বাল্যবিবাহ, সহমরণ বা অনুমরণ, কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিধবাদের বাধ্যতামূলক বৈধব্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রতিবাদী ভূমিকায় যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি নারী নন, একজন মহান পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। চিন্তা-চেতনায় ও মানসিকতায় নিজের যুগের অগ্রণী সৈনিক হিসাবে নারীদের অধিকারের পক্ষে তিনি একাই সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। নারীসমাজের বন্ধু ও রক্ষাকর্তা হিসাবে সনাতনী সমাজের প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর বলিষ্ঠ সংগ্রাম বাংলার নারীসমাজের অবরুদ্ধ দ্বার উন্মোচনে সহায়তা করেছিল, প্রসারিত হয়েছিল নতুন দিগন্ত। নারীদের প্রতি অবমাননার সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আইন প্রণয়নে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভা সব সময়েই এই সমস্ত প্রথার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সতীদাহপ্রথা বন্ধ করার জন্য তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে একুশ বছর। "কেবলমাত্র এই জঘন্য প্রথা রদ করাই নয়, বহুবিবাহ রোধ ও আইনগতভাবে হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নেও তিনি আন্দোলন করেছিলেন। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার প্রতি সামাজিক নির্যাতনকে তীব্র করেছে—এই উপলব্ধি থেকেই তিনি সম্পত্তির অধিকার নারীদের হাতে তুলে দেবার জন্য আন্দোলনে ব্রতী হন। কিন্তু সম্পত্তিতে আইনানুগ অধিকারের জন্য নারীসমাজকে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও এক শতাব্দী।"[২১] রামমোহনের মধ্যে এই যুক্তিবাদী মানসিকতা, মানবহিতৈষী মনোভাব তৈরি হয়েছিল বেন্থাম, লক, হিউম, ভলতেয়ার, তলবি, পেইন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীদের চিন্তাধারা থেকে। তিনি (রামমোহন) বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সতীদাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। উইলিয়াম কেরী ও অন্যান্য মিশনারী আইন করে সতীদাহপ্রথা রদের চেষ্টা চালালেও হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানতে তারাও কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। রামমোহন প্রচলিত সামাজিক রীতির বাইরে নতুন কথা শোনালেন, অসহায় বিধবা নারীকে পুড়িয়ে হত্যা করার বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমন অবাধে স্ত্রী হত্যা প্রচলিত ছিল বলে শোনা যায় নি। এই বর্বর নৃশংস সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য রামমোহন রায়ের যে বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল তা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে চিরউজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা হয়।[২২] রামমোহন রায়ের কাছে নারী প্রথম মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পরবর্তী প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ ইয়ং বেঙ্গল দলের পুরোধা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও সমাজ-সংস্কারে উদ্যোগী হন। তাঁকে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। এদেশীয় নারীর অধিকারহীনতা, বন্দিদশা, শিক্ষাবঞ্চিত অবস্থা নব্য ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্যদের আন্দোলিত করে। ১৮২৪ সালে ডিরোজিওর শিষ্যগণ বিধবা নারীর অসহায় যন্ত্রণার কথা চিন্তা করে বিধবাবিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ কাজে অগ্রণী ছিলেন রামতনু লাহিড়ী। তিনি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হতে থাকেন। কিন্তু বিরূপ সমালোচনা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

নারীর অধিকার ও মুক্তির বিষয়ে আঠার শতকের শেষ পর্যায়ে লক্ষ করা যায় যে, রাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহের জন্য শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসারী হয়েছিলেন। উনিশ শতকে আবার নবদ্বীপেরই আরেক রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বিধবাবিবাহ প্রচলনে ইচ্ছুক ছিলেন। অন্যদিকে রামমোহনের আত্মীয় সভার সদস্যদের বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য নিয়ে আলোচনা এবং ইয়ংবেঙ্গলের তরুণেরা বিধবাবিবাহ নিয়ে রীতিমত লেখালেখি শুরু করে দেন। ১৮৩৭ সালে ভারতীয় ল-কমিশন বিধবাবিবাহের অনুকূলে আইন পাশের বিষয়ে কলকাতা, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের সদরে দেওয়ানি আদালতের বিচারকদের পরামর্শ চান। মানবিক কারণে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিধবা বিবাহের আইন করার উদযোগ নিলে হিন্দুসমাজকে আঘাত দেওয়া হবে।

১৮২৪-এ ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বিধবাবিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করার পর এ-বিষয়ে আইন প্রণয়নের এবং স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবকদের কর্তব্যকর্মে সাহসের দ্বারা তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। এ নিয়ে, 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সঙ্গে তাঁদের তর্কযুদ্ধ বেঁধে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যাবাগীশ সহমরণের পক্ষে থাকলেও ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহের পক্ষে মত দিয়েছিলেন; অন্যদিকে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে রামজয় শর্মার *বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা* পুস্তিকায় তিনি এবং আরো এগারোজন পণ্ডিত পুনর্বিবাহে স্ত্রীলোক 'বধার্হা' হয়, এমন বিধান দিয়েছিলেন।[২৩] এতে গোঁড়া হিন্দুসমাজে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে সমাজের অভ্যন্তরে নানা সমালোচনা তীব্র হয়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে উনিশ শতকে এদেশে দুটি ধারা প্রচলিত ছিল। প্রথমত, এদেশীয় ঐতিহ্যপুষ্ট ভাবধারা, দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে দেশজ অগ্রবর্তী চিন্তানায়কদের প্রগতিবাদের সমন্বিত ধারা। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ এবং ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই দুই বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আরও বিকাশ সাধিত হতে থাকে এবং তাদের সামাজিক রূপটিও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, ফলে সমাজের একাংশে অনাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এও লক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্য ভাবধারা-প্রভাবিত একটি শ্রেণীর মধ্যে কিছু উন্মত্ততা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়। অন্যদিকে উক্ত প্রগতিবাদী ব্যক্তিবর্গের নবজাগৃতির ফলে এদেশীয় সমাজে সংস্কারের ধারা বইতে থাকে। উনিশ শতকের নবজাগ্রত সমাজে আবির্ভূত হন আর এক দিকপাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৭৪)। যদিও তাঁর আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই সমাজে বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, তথাপিও বলা যায় "বিদ্যাসাগর চিন্তা করিলেন, বিদ্যাসাগর উপায় উদ্ভাবন করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য অনুষ্ঠান করিলেন।"[২৪] —রমেশচন্দ্রের এই উক্তিটি নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর গুরুত্ব স্পষ্ট করে তোলে। রামমোহন খ্রিস্টান মিশনারি দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অপরদিকে বিদ্যাসাগর নিজেই বিভিন্ন জেলায় মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন ডিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। কলকাতায় বেথুন কর্তৃক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ভুবনমালা ও কুন্দমালা। বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিবাহ দেওয়াকে জীবনের সর্বোত্তম কাজ হিসাবে গণ্য করেন।

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সেসময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'বামা বন্ধুসভা', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'বরিশাল মহিলা সমিতি' প্রভৃতি পত্রিকা জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অন্তঃপুরের অন্ধকারে প্রথম আলোকরশ্মি পৌঁছায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা শিক্ষার পাশাপাশি সমাজের সকল অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রয়াস করে। এর প্রভাব পড়েছিল ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের ওপর। তারা শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করে।

এই পরিপেক্ষিতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নারীর নতুন ভাবমূর্তি অঙ্কিত হতে থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৪) *মেঘনাদবধকাব্য* (১৮৬০) বা *বিরাঙ্গনাকাব্য* (১৮৬২) নারীত্বের এবং নারীপুরুষ সম্পর্কের এক নবতর ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) *বঙ্গসুন্দরী* (১৮৭০) ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের *মহিলা* (১৮৮০) কাব্যে আদর্শায়িত নারীরূপের যে বন্দনা, তাও নতুন।[২৫]

মধুসূদনের সমসাময়িককালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও (১৮১২-১৮৫৯) স্ত্রীশিক্ষাকে নিয়ে নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। আবার কখনো কখনো স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থনও দিয়েছেন। তিনি যুগসন্ধিক্ষণের চেতনাস্পৃষ্ট বলে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে তাঁর এই দ্বিধান্বিত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মানুষ স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে 'সংবাদ প্রভাকর' তাকে অভিনন্দন জানায়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' নারীশিক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে রঙ্গব্যঙ্গের মাধ্যমে যে বিরূপ মন্তব্য করে 'প্রভাকর' সম্পাদক তার প্রত্যুত্তরে স্বকীয় ভঙ্গিতে জবাব দেন।

ঈশ্বরগুপ্তের একদিকে যেমন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি এই সমর্থন, অন্যদিকে তেমনি স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনার দৃষ্টান্ত সন্ধিকালের চিত্তগত সংকটেরই প্রকাশ। "বিধবা-বিবাহ সম্পর্কেও এই একই দ্বিধা ঈশ্বর-মানসে লক্ষ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিধবাদের বিবাহের বিপক্ষেই তার মন ক্রিয়া করেছে সর্বাপেক্ষা বেশি। তবু অক্ষতযোনি বালবিধবাদের বিবাহ তিনি যে সমর্থন করেছিলেন, 'সংবাদ প্রভাকরের' পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ আছে।"[২৬] বস্তুত, এইসব সামাজিক দ্বিধা ও সংকটের প্রেক্ষাপটেই উদ্ভূত হয় বাংলা উপন্যাসের জগৎ, যেখানে নারীর জীবনরূপ ইতি নেতি তাৎপর্যে হয়ে ওঠে জটিল ও গভীর।

তথ্যনির্দেশিকা

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *যে গল্পের শেষ নেই*, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৮১-৮১

২. ড. দীপ্তি চক্রবর্তী, *নারীপ্রগতির স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ*, জয়পূর্ণা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১০

৩. ড. আতুল সুর, *মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা*।

৪. তথ্যসূত্রের জন্য দ্রষ্টব্য সুজিৎ চৌধুরী, *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তির পুনর্বিচার*, প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯০, পৃ. ১০

৫. সুজিৎ চৌধুরী, তদেব, পৃ. ১২৫

৬. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্কুরণ আষাঢ় ১৩৯৪, পৃ. ৪৩

৭. সুকুমারী ভট্টাচার্য, তদেব, পৃ. ৪৩

৮. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২৫৪

৯. সুকুমারী ভট্টাচার্য, তদেব, পৃ. ৩৯-৪০

১০. ড. দীপ্তি চক্রবর্তী, তদেব, পৃ. ২০

১১. তথ্যসূত্র, মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯, পৃ. ০৬

১২. কনক মুখোপাধ্যায়, *বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৯

১৩. আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ১৫

১৪. ড. দীপ্তি চক্রবর্তী, তদেব, পৃ. ২৫

১৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ. ৪১

১৬. আগস্ট বেবেল, *নারী—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, অনুবাদ কনক মুখোপাধ্যায়, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬২

১৭. ব্যাপক তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, *বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ*, কনক মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯, পৃ. ৩৯-৪০

১৮. তথ্যসূত্র, ড. দীপ্তি চক্রবর্তী, *নারীপ্রগতির স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ*, জয়পূর্বা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৬

১৯. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

২০. ব্যাপক তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য, শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলিকাতা, ১৯০৪, পৃ. ৫৬

২১. শ্যামলী গুপ্ত, *নারী আন্দোলনের বিকাশ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড ২০০০, কলকাতা, পৃ. ২-৩

২২. কনক মুখোপাধ্যায়, *উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন বিদ্যাসাগর*, কলকাতা, পৃ. ১৪

২৩. আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ৪০-৪১

২৪. শিবনাথ শাস্ত্রী, তদেব, পৃ. ১৮৭

২৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ১৪৫

২৬. আনিসুজ্জামান, তদেব, পৃ. ৫৪

২৭. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (১ম খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলা উপন্যাসে নারীর জীবনরূপ

ভূমিকা

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মধ্যে গল্প বলা ও শোনার প্রবণতা পরিলক্ষিত, তবে গল্পকাহিনীর আধুনিক শিল্পরূপ হিসাবে উপন্যাসের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে উনিশ শতকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে। উপন্যাসের প্রাথমিক উপাদান নিহিত ছিল প্রাচীন গাথা ও কাহিনীকাব্যের মধ্যে। ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে রোমান্টিক গল্প লেখা হয় রাখালিয়া পটভূমিতে। এরই সমসাময়িককালে স্পেনে প্রচলিত হয় পিকারেস্ক কাহিনীর। পিকারেস্ক গল্পের মূল আকর্ষণ ছিল নায়কের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকাণ্ড, তবে একটি জায়গায় উভয়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান আর তা হচ্ছে তাদের গল্পে বাস্তব নর-নারীর উপস্থিতি।[১]

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে মুদ্রণযন্ত্রের ব্যাপক প্রসারে উপন্যাসের যে যাত্রা আরম্ভ ও বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, সাহিত্যের আর কোনো শাখায় তা সম্ভব হয়নি। গীতিকবিতায় প্রথম আত্মগত ভাবের প্রকাশ ঘটলেও তা ছিল খণ্ডিত। আবার রোমান্টিক ব্যালাড বা সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যেও তার পূর্ণ অবয়ব ফুটে ওঠেনি। "সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে উপন্যাসের মৌলিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর প্রয়াস যেন রাতারাতি অর্গলমুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই মুক্তির বাহক হিসাবে উপন্যাসশিল্প সুদূরপ্রসারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"[২]

উনিশ শতকের বাংলায় ঔপনিবেশিক আবহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 'বিশিষ্ট' আত্মবিস্তৃতির সন্ধিলগ্নে উপন্যাস জন্মলাভ করে। এতে বাংলার লোকায়ত মনন, কথকতার কালবাহিত পরম্পরা, বিষয় ও প্রকরণের দেশজ স্মৃতি সমস্ত কিছুকে নিরাকৃত করে ঔপনিবেশিক মহাসন্দর্ভ প্রতীচ্যগত ধাঁচকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। তবে বলা চলে যে, সীমিতভাবে হলেও এদেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের প্রতিষ্ঠা, মুদ্রণযন্ত্র ও গদ্যভাষার ক্রমবিকাশ উপন্যাসের জন্ম সম্ভব করে তোলে। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিচিত্র ধরনের পেশার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। রাজধানী কলকাতায় গড়ে ওঠা নগরকেন্দ্রিক সমাজের মূলে ছিল বণিকতন্ত্র। ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক, ভৃত্য, শিক্ষক, কেরানী, ব্যবসায়ী বিভিন্ন পেশায় মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করে। এই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীই উপন্যাসের উদ্ভবের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে।[৩]

উপন্যাসের পূর্ণ অবয়ব তৈরি হওয়ার আগেই তার মৌলিক উপাদান পাওয়া যায় জীবনের ইতিবৃত্ত রচনায়, বিভিন্ন সাময়িকীতে, এমনকি জীবনীমূলক রচনাও উপন্যাসের ভিত্তি তৈরি করেছে। তবে, বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আঙ্গিক আধুনিক যুগের অবদান হলেও এবং পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা উপন্যাসের সূত্রপাত হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে উপন্যাসের কিছু কিছু উপাদান পরিলক্ষিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যেও সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের প্রথম অঙ্কুর ও আদি লক্ষণগুলি আবিষ্কার করা যায়। আমাদের *রামায়ণ-মহাভারত* ও পৌরাণিক সাহিত্যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা ও ঐশী শক্তির প্রতিচ্ছায়া ও বাস্তব মনুষ্যের অকৃত্রিম সুখ-দুঃখের মৃদু প্রতিধ্বনি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্য *কথারিৎসাগর, বেতালপঞ্চ-বিংশতি, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী* ইত্যাদির মধ্যেও বিশেষত্ববর্জিত, প্রথাবদ্ধ বর্ণনাবাহুল্যের অন্তরালে উপন্যাসের মৌলিক উপাদানগুলি নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায়। বৌদ্ধ জাতকগুলির মধ্যে এই বাস্তবতার রেখা স্পষ্টতর ও গভীরতর হইয়া দেখা দেয়।"[৪]

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেও উপন্যাসসুলভ বাস্তবতার ছাপ পাওয়া যায়। তবে সেখানে দেবদেবী কীর্তন প্রাধান্য পাওয়ায় বাস্তবচিত্র ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলিতে বাস্তবতাবোধ, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনাবিন্যাসে উপন্যাসের আভাস স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করা সম্ভব। উপন্যাসের মতই ছিল এর আখ্যানভাগ এবং ধর্মতত্ত্বপ্রবণ হলেও তাতে ছিল বাস্তবতার স্পর্শ; চৈতন্যজীবনী গ্রন্থেও উপন্যাসের উপাদান স্পষ্ট। এ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* গ্রন্থে বলেছেন, "চৈতন্যদেবের চরিত্রগ্রন্থসমূহেও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক জীবনের নির্ভরযোগ্য বিবরণ মেলে। তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনাগুলিতে অনেক সময়ে চরিত্রকারদের উচ্ছ্বসিত ভক্তি ও তাঁহার দেবত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্য অলৌকিকত্বের রং মাখানো হইয়াছে। কিন্তু মোটের ওপর তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, চাল-চলন, রুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের দৈনিক জীবনযাত্রা, তীর্থপর্যটন, ধর্মবিষয়ক বিচার বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ের যে বিবরণ এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে সংকলন করা যায়, তাহা বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবি।"[৫]

নর-নারীর জীবন ও ঘটনাকেন্দ্রিক বাস্তবতার উপাদান-সম্বলিত *ময়মনসিংহ গীতিকা*ও উপন্যাসের পূর্বসূরীর ভূমিকা পালন করেছে। *ময়মনসিংহ গীতিকার* বিভিন্ন আখ্যায়িকায় তৎকালীন সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বাস্তবতাসমৃদ্ধ। বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্যের জন্য উপন্যাসসাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে *ময়মনসিংহ গীতিকার* একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নায়িকাদের চরিত্রচিত্রণের ন্যায় তাদের রূপবর্ণনাতেও গতানুগতিকতাহীন বাস্তবতার নিদর্শন পাওয়া যায়। যে সমস্ত উপমার সাহায্যে তাদের সৌন্দর্য স্পষ্টীকৃত, সেগুলি সংস্কৃত কাব্য-অলংকার সাহিত্য হতে সংগৃহীত হয়নি। "নায়িকাদের শোকোচ্ছ্বাস গ্রাম্য কথ্যভাষার সংযোগে একেবারে আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে, সাহিত্যিক ভাষার অলংকারশিঞ্জন হৃদয়বাণীর অকৃত্রিম সুরটিকে চাপা দেয় নাই। এই সমস্ত দিক দিয়াই *ময়মনসিংহ গীতিকা* উপন্যাস সাহিত্যের উৎপত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত।"[৬]

বাংলা সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার আগেই মুসলমান রচিত অনুবাদ ও রোমান্সধর্মী আখ্যান-উপন্যাস সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে। *আরব্য উপন্যাস, হাতেম তাঈ, লায়লী মজনু, চাহার দরবেশ, গোলে বকাওলী* প্রভৃতি কাহিনী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব রহস্য ও সৌন্দর্যের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। এসবের প্রভাবে বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক কাহিনী বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে লোকরঞ্জক নক্‌শা, অদ্ভুত রসাত্মক উপকথা এবং ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুরুতেই উপন্যাস ছিল নক্‌শা জাতীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য ধীরে ধীরে তার অবয়ব তৈরি করছিল এবং মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে ও অনুবাদের কল্যাণে বৈদেশিক সাহিত্য-সম্ভার আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছিল, তখন অনুবাদ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যে প্রধান অনুষঙ্গ হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং সমাজকাঠামোর পরিবর্তন ও জীবনবৈচিত্র্যময় উপন্যাসের সূচনাকে দ্রুততর করে। ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাঙালি নতুন সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে এদেশে দীর্ঘকাল অনুসৃত রীতিনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাছাড়া ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের প্রসার এদেশীয় জনগণের মানসিকতার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদেশীয় জনগণ ইংরেজদের পণ্য এদেশে প্রচলন করে এবং তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগান দিয়ে রাতারাতি বিপুল অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়। দ্রুত অর্থ সমাগমের কুফল হিসাবে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় নানা বিলাসিতা। তারা নানা বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে নিজেদের বাবু শ্রেণীভুক্ত করে। এই বাবু শ্রেণীর বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনপদ্ধতি নিয়ে সাহিত্যের আর একটি শাখা যাত্রারম্ভ করে উপন্যাস নাম নিয়ে। এদিক থেকে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ভারতীয় ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাবে বাংলা উপন্যাসের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। এক্ষেত্রে সংস্কার আন্দোলন কেন্দ্রিক বাদ প্রতিবাদও উপন্যাসের জন্মকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল।

বাঙালিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রথম ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতীয় সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে তর্কবিতর্ক শুরু করেন। রামমোহনই হিন্দু ধর্মের আচার নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারি ও গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুর সঙ্গে নানা বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন। "এই বাদ-প্রতিবাদের কোলাহলমুখর, উত্তেজিত প্রতিবেশে উপন্যাসের জন্ম হইল। ... সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন উপন্যাস রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর। সংবাদপত্রের সহিত উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হইয়াছে।"[৭]

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব জীবনের খণ্ড বিচিত্র কাহিনী ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে লেখকের কল্পনারসে অভিষিক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ শর্মা রচিত *নববাবু বিলাস* (১৮২৩) প্রথম উপন্যাস হিসাবে গৌরবের দাবীদার। *নববাবু বিলাস* পদ্যে গদ্যে ছড়ায় অনুপ্রাসে, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে এবং চটুল বর্ণনাভঙ্গিতে রচিত। তবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসাবে গৌরবের অধিকারী হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্সের *ফুলমনি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২)। এই উপন্যাসে প্রথম ব্যক্তিজীবনের সমস্যা-সংঘাত, পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি, জীবনের নানা সুকৃতি ও দুষ্কৃতি প্রভৃতি চিত্রিত হয়েছে। জীবনের সহজ রূপই উপন্যাসটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮) বাবু জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটি প্রথম উপন্যাস, পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল জীবনের নানাদিক এতে প্রতিফলিত।

বাংলা উপন্যাসে নারীর জীবনরূপ : একটি রূপরেখা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে পুরুষেরা, পরে নারীরা দাম্পত্য বিষয়ে নতুন ধারণা লাভের সুযোগ পায়, স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসা সম্পর্কেও নতুন ভাবের উদয় হতে থাকে। ... দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* (১৮৬০) নাটকে দাসী আদুরীকে বাড়ির বউ সরলতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ, আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভালবাসত?" উত্তরে আদুরী প্রমাণসহ জবাব দিয়েছিল : "মোরে বড্ডি ভালবাসত, মোরে বাউ দিতে চেয়েছিল।" অলংকার দিতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে এখানে ভালোবাসার চরম প্রকাশ দেখানো হয়েছিল। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩)-এ সূর্যমুখী স্বামীর প্রেমবঞ্চিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

চিঠি লিখেছে, "একথা বলিতে পারি না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন আদর করেন। ... যত্ন এক ভালবাসা আর এক, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি আমরা স্ত্রীলোক সকলেই বুঝিতে পারি?" উনিশ শতকের আগে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। এই উপলব্ধির পশ্চাতে সামাজিক আন্দোলন ও সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও ভূমিকা ছিল।[৮] তবে এখনও পুরুষশাসিত সমাজে নারীর স্বাধীন ইচ্ছা বলে যে কিছু নেই, পুরুষ ইচ্ছা করলেই একাধিক স্ত্রী একত্রে রাখতে পারে। কিন্তু নারীর সে স্বাধীনতা নেই এবং মনোমত সঙ্গী বেছে নেওয়ার কোন অধিকার তার ছিল না—এ তথ্য আরও বেশি সুলভ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁর উপন্যাসে নারীর এই স্বাধীন ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। তাঁর কাছে অবিবাহিত নারী পুরুষের একত্র বাস ঘৃণার বিষয়। তাঁর মতে, বিয়ের মাধ্যমেই কেবল নারী পুরুষের সম্পর্ক বৈধ হতে পারে। *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬) উপন্যাসে এ বক্তব্য আছে যে, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান। এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে, জগন্মাতাও শিবের বিবাহিত' [*বঙ্কিম রচনাবলী*, কাকলী প্রকাশনী, পৃ. ১৪২]

স্ত্রীলোকের স্বামী ব্যতীত অন্য কোন গতি নেই তা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসেও প্রতিবিম্বিত। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সঙ্গে যাত্রার সময় দেবীর পায়ের উপর বিল্বপত্র রাখলে তা পড়ে যায়। ভক্তিপরায়ণা কপালকুণ্ডলা ভীত, শংকিত হয়। তারপরও অধিকারী তাকে স্বামীর সঙ্গে যাত্রার পরামর্শ দেয়। কারণ পুরুষশাসিত সমাজে নারীর একক কোন সত্তা নেই। "... এখন নিরুপায়! এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব, নিঃশব্দে চল।" (তদেব, পৃ. ১৪৪-১৪৫)

কিন্তু বিপরীত সূত্রে লক্ষণীয় যে, স্বামীসঙ্গ, সংসারের যাবতীয় ঐশ্বর্যের মাঝেও কপালকুণ্ডলা সুখ খুঁজে পায়নি। তার মনে পড়ে কাপালিকের আশ্রিতা হয়ে অরণ্যের মধ্যে স্বাধীন জীবনযাপনের স্মৃতি। সেখানে, প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হত না। সংসারের বন্দিজীবন তাকে বিমর্ষ করে রাখত। অরণ্যের স্বাধীন জীবনের জন্য কপালকুণ্ডলার আকাঙ্ক্ষা ছিল গভীর। মনে প্রশ্ন জাগে, পুরুষে পুরুষে, স্ত্রীতে স্ত্রীতে সাক্ষাৎ যদি দোষের না হয়, তাহলে নারী-পুরুষের সাক্ষাৎ কেন দোষের হবে? আবার মতিবিবি প্রচলিত সামাজিক, ধর্মীয় সংস্কার উপেক্ষা করে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছে। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম কিন্তু শেষপর্যন্ত তার কণ্ঠে নারী পুরুষের সাম্যভাব ও নারীর মুক্তির প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রেখে গেছেন। তিনি মতিবিবিকে শেষপর্যন্ত স্ত্রীত্বের আদর্শের ফর্মে বেঁধে ফেলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে থেকে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ও কলকাতা নগরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জটিল মিশ্রণে উদ্ভূত সমাজ সংস্কারের প্রেক্ষাপটে পুরনো মূল্যবোধগুলি ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়তে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের *ইন্দিরা* (১৮৭৩) উপন্যাসে মনোরমা বিধবাদের প্রসঙ্গে বলে, "মুসলমানের নয়, যত দোষ হিন্দুর মেয়ের"। *আনন্দমঠের* গৌরী ঠাকুরাণীর মতও প্রায় এক। 'বঙ্কিমের ভ্রমর তার স্বামীকে প্রতিবাদপত্র লিখলেও [বাংলা সাহিত্যে প্রথম] শেষপর্যন্ত স্বামীর পদরেণু মাথায় নিয়ে জন্মান্তরে সুখী হবার প্রার্থনা জানিয়ে 'ইহলীলা' সংবরণ করেছে।"[৯] বঙ্কিমচন্দ্র নারীর মর্মবেদনাকে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করলেও শেষপর্যন্ত প্রচলিত সামাজিক রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এর প্রমাণ মেলে *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসের ভ্রমর চরিত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

তবুও উপন্যাসে নারীর জীবনচিত্র পর্যবেক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা ঐতিহাসিকই বলা চলে। কারণ, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ভাবগভীরতা ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে প্রকাশ ঘটে, তার মূল্য অপরিসীম। তাঁর উপন্যাস নিয়ে যারা কৌতুক করেছিলেন, তারা বিশেষ করে তাঁর নায়িকা চরিত্রের অনুকরণকারী পাঠিকার ছবি এঁকে মজা পেয়েছিলেন। কিন্তু এই নায়িকাদের অন্তরস্থিত শক্তি যে কতখানি ছিল এবং সেই শক্তি কতখানি পাঠকসমাজে সংক্রমিত হয়েছিল, কৌতুকপরায়ণেরা তা দেখাননি। শত্রুপক্ষের ঘোষণা কিংবা স্বামীর উদ্দেশ্য কথিত ভ্রমরের দৃপ্ত বাক্য—"যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি"—এসবের মধ্যে উনিশ শতকের নবচেতনা ধরা পড়েছে, যেমন পড়েছে হীরার বিদ্রোহ ও শাস্ত্রনিরপেক্ষ নৈতিকতায় বিধবা রোহিণী অথবা সধবা শৈবলিনীর প্রেমে। এসবই আমাদের জন্য নতুন উপকরণ।"[১০] *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) উপন্যাসে প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণী নাম ধারণ করে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত আবার প্রফুল্ল হয়ে ফিরে যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর মধ্যে। প্রথমে প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। ব্যক্তিত্বহীন, দুর্বলচিত্ত স্বামী ব্রজেশ্বর তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে অক্ষম। বাধ্য হয়ে প্রফুল্ল সমাজ-সংসারের বাইরে বের হয়ে এসে অবস্থা বিপাকে বেছে নেয় স্বাধীন জীবন এবং দেবী চৌধুরাণী নাম ধারণ করে। আবার প্রফুল্ল নামে সংসারের গণ্ডীর মধ্যে ফিরে যায়। সূর্যমুখী, মৃণালিনী, ইন্দিরা, চঞ্চলকুমারী, শ্রী, রজনী, শান্তির মধ্যে মুক্ত আকাশে পাখা মেলে উড়বার সাধ লক্ষ করা যায়। কিন্তু ওড়ার চেষ্টাই সার, তাদের ফিরে যেতে হয় অভ্যস্ত গার্হস্থ্যজীবনে। বঙ্কিম নারীর স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। শেষপর্যন্ত স্বামীসেবার মধ্যে নারীজীবনের সার্থকতা দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) সারা জীবনব্যাপী ছিলেন কালসচেতন ও অগ্রসর চিন্তার লেখক। উনিশ শতকের নবজাগরণ তাঁর অন্তঃকরণে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্র-উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তা-সন্ধানী নারীচরিত্রের মুখে সমাজনীতির বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদ শোনা যায়। *চোখের বালি* (১৯০৩)-র বিধবা বিনোদিনী তার তীব্র শারীরিক কামনা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত বিনোদিনীকে কাশী পাঠিয়েছেন চিত্তশুদ্ধির জন্য। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে সর্বগুণে গুণান্বিত করেও তাকে সর্বসুখে বঞ্চিত করেছেন। তবে এটা ঠিক, বিধবার মনেও যে শারীরিক বাসনা জাগরুক থাকতে পারে তা *চোখের বালির* পূর্বে আর কোথাও দেখা যায়নি। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিনোদিনীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নারীর আত্মসচেতনতাবোধের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। "বিনোদিনীর জেগে ওঠা, সে যেন কতদিনের আত্মবিস্মৃত নারীত্বের মধ্যে আত্মবোধের উন্মেষ।"[১১] রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর অতৃপ্ত বাসনার যে ছবি অংকন করেছেন তা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে দুঃসাহসিক কাজ নিঃসন্দেহে। "তার বাসনাবর্ণিল চেতনা বর্ণনাটি লক্ষণীয় ক্ষুধিতহৃদয় বিনোদিনীও নববধূর ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীর জ্বলিয়া উঠিল। অপরাহ্নে বিনোদিনী যখন নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাঁহাকে স্বামী সম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎমুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। ... তাহার শিরায় শিরায় রক্ত জ্বলিয়া উঠিত।" [*চোখের বালি*, অল্পকথা প্রকাশনী, পৃ. ২৮-২৯]

রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*-র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ায় পরবর্তী উপন্যাস *নৌকাডুবি* (১৯০৬)-তে নারীকে তিনি চিরকালীন সংস্কারের বশবর্তী করে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন জাগে, "স্বামী সম্বন্ধের নিত্যতা নিয়ে যে সংস্কার আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মনে আছে তার মূল এত গভীর কিনা যাতে অজ্ঞানজনিত প্রথম ভালোবাসার জালকে ধিক্কারের সঙ্গে সে ছিন্ন করতে পারে। ...কোনো একজন মেয়ের মনে সমাজের চিরকালীন সংস্কার দুর্নিবাররূপে এমন প্রবল হওয়া সম্ভব নয় যাতে অপরিচিত স্বামীর সংবাদমাত্রই সকল বন্ধন ছিঁড়ে তার দিকে ছুটে যেতে পারে।"[১২]

গোরা (১৯১০) উপন্যাসে সুচরিতা-ললিতা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চিরাচরিত গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসে। নারী-পুরুষে যে শ্রেণীভেদ তার বিরুদ্ধে সুচরিতা-ললিতা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা উভয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বলে সনাতন রমণীসুলভ রীতিনীতিকে অস্বীকার করতে পারেছে : "নর-নারীর কার্যক্রমের মধ্যে বিভাজনের ধারণার বিরুদ্ধে ললিতা এবং সুচরিতাই সর্বপ্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিল। তারা উভয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত। সুচরিতা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিল এবং এ বিষয় তার পড়া ছিল। অপরদিকে ললিতার ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়, কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট জড়তাহীন সতেজ উচ্চারণ, ভাব প্রকাশের নিঃসংশয় বল শ্রোতাকে প্রত্যাশিত আনন্দ দান করে। 'ললিতার কাব্য আবৃত্তির মাধুর্য বিনয়কে বিশেষ করিয়া এবং প্রবল করিয়া বিচলিত করিল।"[১৩]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ললিতা অত্যন্ত ব্যক্তিসচেতন এবং প্রগতিশীল নারী এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক—"Lolita was a much greater rebel then Sucharita. She has been portrayed by Rabindranuth as the first women to practise Satyagraha"[৭] ললিতাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী চরিত্র হিসাবে অনায়াসে আখ্যা দেওয়া যায়। "মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে সমস্তই চুপ করে সহ্য করতে হবে সে আমি বুঝিনে। আমাদের পক্ষেও ন্যায়, অন্যায়, সম্ভব অসম্ভব আছে।" [*গোরা*, রাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪২] ললিতা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বলেই তার মধ্যে এমন দৃঢ় ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। সে নিজ ব্যক্তিত্বের গুণে রাতে একাকী বিনয়ের সঙ্গে স্টীমারে চলাচল করে সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়। সমাজকে উপেক্ষা করে নিজের পাত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, আর সুচরিতা আইরিশ গোরাকে বিয়ে করে প্রগতিবাদী মানসিকতার পরিচয় দেয়।

প্রথম পর্যায়ের রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর ব্যক্তিত্ব চিত্রায়ণের ধরনটি সামাজিক সংস্কারের কারাগারে বন্দি থাকলেও বিশ শতকে *সবুজপত্র* (১৯১৪)-এর কাল থেকে তাঁর রচনায় নারীর ব্যক্তিসত্তার জাগরণ লক্ষ করা যায়। দামিনী, বিমলা, কুমুদিনী, লাবণ্য, এলা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। *চতুরঙ্গ* (১৯১৬)-এ ননীবালা চরিত্র সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বালবিধবা ননীবালা গর্ভবতী হলেও জগমোহন তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তবুও সেই দুবৃত্ত-প্রেমিককেই ননীবালা ভালোবেসেছে এবং অন্যাসক্ত না হয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে তুলনায় দামিনী অনেক বেশি জীবন্ত, সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে চায়। শরীরের শুদ্ধতা তার কাছে গুরুত্বহীন, বৈষ্ণবধর্মের লীলাতত্ত্ব তার কাছে অসার। ধর্মের প্রতি এমন ব্যঙ্গ, অবজ্ঞা এর আগে আর কোন নারীচরিত্রে দেখা যায়নি। কিন্তু তারপরও দামিনীকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ জীবন দিতে পারেন নি। বঙ্গীয় যুবকের সার্বিক বিভ্রান্তি ব্যর্থতা ও দুর্বলতাই দামিনীর অচরিতার্থ জীবনের কারণ। নারীর দৈহিক কামনা যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শোভনীয় নয়, তার প্রমাণ গুহার মধ্যে শচীশ অজান্তে দামিনীকে বুকে লাথি

Dhaka University Institutional Repository

মেরে প্রত্যাখ্যান করে। দামিনী বিধবা হওয়া সত্ত্বেও শ্রীবিলাসের সঙ্গে বন্ধনহীন বিবাহসম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বিনোদিনী ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে আমাদের দেশে বিধবাবিবাহের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠলেও আর একধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস দেখাতে পারেনি। দামিনী কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মেয়ে, অনেক বেশি প্রগতিশীল এবং আমাদের সমাজে বিধবাবিবাহের একজন বলিষ্ঠ অগ্রদূতী। তদানীন্তন সমাজপতিদের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে দামিনী চামড়া রঞ্জিত করার কারখানার *[Tannery]* মুসলমান শ্রমিকদের কল্যাণের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিল।

ঘরে বাইরে (১৯১৬)-এর বিমলা চিরাচরিত বন্ধনদশা থেকে মুক্ত হয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল। বিমলার স্বামী নিখিলেশ তাকে বাইরের জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নারীর স্বাধীন সত্তা, তার প্রেমের স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে জাতীয় সমস্যার সঙ্গে নারীকে যুক্ত করতে চেয়েছেন। *যোগাযোগ*-এর কুমুদিনী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও উনিশ বছরের কুমু প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতিতে গভীরভাবে বিশ্বাসী, ধর্মীয় অনুশাসন এমনকি প্রচলিত সংস্কারগুলিকেও সে বর্জন করতে পারেনি। সংস্কৃত কাব্য পড়ে তার মনে হয়েছে উমার তপস্যা নারীধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, আবার সংসারের মেয়েলি শিক্ষা থেকে সে জেনেছে শিবপূজা করলে শিবের মতো বর পাওয়া যায়, মীরার ভজন গেয়ে তার মীরাবাঈকেই নারী জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে মনে হয়েছে। তার থেকে বয়সে অনেক বড় মধুসূদনের সঙ্গে যখন তার বিবাহের সম্বন্ধ হয় তখন সে অন্ধ কুসংস্কারবশে এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। "যার কথা বলছ, নিশ্চয়ই তাঁর আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই আছে।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ অংকিত সমস্ত নারীচরিত্রের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত। এই নারীরা শিক্ষিত এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা অন্বেষণে লিপ্ত। বিনোদিনী, আনন্দময়ী, সুচরিতা, ললিতা, বিমলা, মৃণালিনী, কল্যাণী, দামিনী, কুমুদিনী, নন্দিনী, এলা এবং সোহিনী সকলেই এই শ্রেণীর নারী। এরা আপন বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য নারীদের থেকে ভিন্ন। সকল ভয়কে জয় করে গুরুজনদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে তাদের সকল কর্তৃত্বও তারা অস্বীকার করতে পারে। তবে শেষপর্যন্ত নীরবে পরাজয় মেনে নিলেও, রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র সৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য হল, "তিনি সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিত্বের পটে ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তার বিকাশ সাধন করেন। সর্বোপরি, তীক্ষ্ণমুখ দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার পরিমণ্ডলে কার্যকর থাকে রবীন্দ্রচেতনার নিরাসক্তি।"[১৬]

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকেই নারীমুক্তির পূর্বশর্ত বিবেচনা করেন। তাঁর চিত্রিত প্রথমদিকের নায়িকারা তেমন শিক্ষিত না হলেও শেষদিকের নায়িকারা শিক্ষায় অগ্রসর। এই নারীদের কেউ কেউ যেমন লাবণ্য (*শেষের কবিতা*) এবং এলার (*চার অধ্যায়*) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে। এমনকি তারা (*দুইবোন*) উচ্চতর ডিগ্রীর জন্যে ইউরোপ গমন করে। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে তেমন শিক্ষারই পক্ষপাতী যা ব্যক্তি ও চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। এই কারণেই তাঁর শেষদিকের নায়িকারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যতটুকু শিক্ষিত হোক না কেন, প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতামত আছে। তারা রাজনীতিসচেতন, বিজ্ঞানচেতন, সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষিত নায়িকারা ধর্মের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে। নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তনের ধারাটি অংকন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনায় প্রথম বিবাহবন্ধন ছাড়াই নারী-পুরুষ বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীমুক্তির যে আদর্শ

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ নয়। তাঁর নারীরা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্যিক এবং সমসাময়িককালের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপের মুখোমুখি হয়নি। তাছাড়া সমাজ-নির্ধারিত পোশাক-আশাকের প্রতি তারা কটাক্ষ করেছে এবং পাশ্চাত্য প্রভাবিত জীবনধারার প্রতিও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব ছিল।

বাংলা সাহিত্যে নারীজীবনের চিত্র সার্থকতার সঙ্গে অংকন করেছেন মানবতাবাদী ও নারী জীবন নিয়ে চিন্তাশীল লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। সংসারে অসহায় বঞ্চিত নারীর বোবা কান্না তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ধ্বনিত করেছেন। তবে তাঁর উপন্যাসে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার চিত্র দুর্লক্ষ্য। নারীর বেদনা তাঁকে পীড়িত করেছে কিন্তু কোন পথ দেখাতে পারেনি, দেখাতে পারেনি সমাজব্যবস্থা অতিক্রমের সাহস। শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রে সংস্কার প্রবল। আবার এই নারীর হৃদয়েই বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে প্রেমের দুর্নিবার প্লাবন দেখা দেয়। প্রেমের উদ্দীপনা ও বিরুদ্ধতা নারীকে নিরন্তর অস্থির ও ক্ষতবিক্ষত করেছে। শরৎচন্দ্র নারীকে সর্বাধিক লাঞ্ছিত বর্গ বলে মনে করতেন। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর বিড়ম্বনা ও অবিচার সহজেই তাঁর মমতাকে আকর্ষণ করে নিয়েছে। আবার শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলীকেও তিনি নারীর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন বলে তাঁর নারীর প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল সমপরিমাণে।[১৭] শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যে চিত্র অংকন করেছেন সেখানে নারী গৃহকোণে আবদ্ধ, বিধি-নিষেধের বেড়াজালে কণ্টকিত। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোন সুযোগ ছিল না, নারী কর্তব্যসহিষ্ণু, আর সেবাপরায়ণতার ওপর তার সকল শক্তি ও মনোযোগ নিবেদিত এবং সেবাপরায়ণতা দিয়েই তার মূল্য নির্ধারিত। তবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কিছু নারীচরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষও লক্ষণীয়। তারা সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজের হৃদয়বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অভয়া, কিরণময়ী, বিজয়া, বন্দনা, সরোজিনী, ভারতী, অচলা—এর সবাই প্রচলিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে আপন আপন ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত।

শরৎচন্দ্র গভীরভাবে নারীমুক্তির কথা চিন্তা করেছেন যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর রচিত 'নারীর মূল্য' গ্রন্থটি। অসহায় নারীর বেদনা তাঁকে নিয়ত পীড়িত করেছে। কিন্তু তাঁর এই চিন্তা পুরুষতন্ত্রের করুণা থেকে উৎসারিত। সমাজ নারীকে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে, তিনি তা থেকে নারীর পরিত্রাণের পক্ষপাতী, কিন্তু আবার এ কথাও বলেছেন, 'শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিবার কথা বলিতেছি না।'[১৮] তিনি নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা চাইলেও একনিষ্ঠ সতীত্ব কামনা করতেন। ফলে তাঁর নারীচরিত্র যতই বিদ্রোহিণী হোক না কেন তারা দৈহিক শুচিতা রক্ষা করে চলেছে। যেমন রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের দৈহিক মিলনের কোন চিত্র উপন্যাসে নেই। কিরণময়ী একশয্যায় রাত কাটিয়েও দৈহিক মিলনে অগ্রসর হয়নি। কেবল ব্রাহ্ম নারীচরিত্র অচলাই এদিক থেকে ব্যতিক্রম।

অবহেলিত, নির্যাতিত, অবরুদ্ধ বাঙালি নারীর মুক্তির জন্য বাঙালি মুসলমান লেখিকা হিসাবে বেগম রোকেয়া [১৮৮০-১৯৩২] বলিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন তাঁর কর্মে এবং সাহিত্যে। তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজে নারীর নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ বিষয়ে তাঁর বলিষ্ঠ ও বৈপ্লবিক বক্তব্য—

> "কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন অমনি ধর্ম দোহাই-বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ এই দর্শন গ্রন্থগুলি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ... এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান,

Dhaka University Institutional Repository

কোনো নারী মুনির বিধানে হয়তো তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। ধর্ম আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।"

অবরোধের দারুণ যন্ত্রণা ব্যক্তিগত জীবনেই রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন, অবরোধের যে যন্ত্রণা নিজে ভোগ করেছিলেন তার মধ্যে নারীর মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হতে দেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে, বিভিন্ন লেখায় এই খেদাক্তি ফুটে উঠেছে যে, 'দাসব্যবসা নিষিদ্ধ কিন্তু ঘরে ঘরে নারীদের অবস্থা ক্রীতদাসীদের থেকে উন্নত ভাবতেও পারে না'—এমনি জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে তারা। বেগম রোকেয়ার রচিত সাহিত্যে নারীর নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনার্ত চিত্র অংকিত হয়েছে। তিনি সমাজব্যবস্থার মধ্যে নারী পুরুষের ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন।

রোকেয়ার কাছে নারীমুক্তির অর্থ সমঅধিকার অর্জন ও প্রতিষ্ঠা। সমাজে নারী-পুরুষের সমকক্ষতার জন্যে যদি নারীকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে হয় তবে সেটাই করতে হবে বলে তিনি দাবী করেন। তিনি যে যুগে এমন স্পষ্ট দাবী জানান তখন মুসলিম সমাজে এমন কথা ভাবাও যেত না। সে সময় জাগরণে উদ্বুদ্ধ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের নারী যেমন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কামিনী সেন, কৃষ্ণভামিনী দাসী, সরলা দেবী প্রমুখ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নারীর সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনে অবরোধমুক্তির দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম নারীসমাজের পক্ষে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যখন মেয়েদের অবরোধমুক্তি ও চাকুরি করার বিষয়ে জোর দেন তখন সমাজে তিনি নিন্দিত হন, অথচ এদেশে তখন [১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে] বহু ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান মহিলা চাকুরিরত ছিলেন। নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন রোকেয়া তাঁর *সুলতানার স্বপ্ন* (১৯০৮) গ্রন্থে তা স্পষ্ট; এই গ্রন্থ পাঠে মনে হয় বাংলার অবরোধবাসিনীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বীজ বপন করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল।[১৯] তিনি সুলতানার স্বপ্নে পুরুষতন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন। বেগম রোকেয়ার এই গ্রন্থটি যে পুরুষশাসিত সমাজে নিগ্রহ, লাঞ্ছনা ও দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ নারীসমাজের মূর্ত প্রতিবাদ এবং নারী মুক্তির আকাঙ্ক্ষার এক সফল চিত্র সে সম্পর্কে তাঁর নিজের মনেও কোন সংশয় ছিল না।[২০] রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ এবং নারীতন্ত্রের উদ্‌বোধন কামনা করেছেন। পুরুষের সহযোগিতা ছাড়াও নারী যে অনেক জটিল কাজে পারদর্শী, রাজ্য চালানোর মত গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারে, সংসারে নারী পুরুষের কর্তৃত্ব ছাড়াও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে তাঁর দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ ঘটেছে রোকেয়ার রচনায়। পুরুষতন্ত্রের কঠিন নাগপাশে অবরুদ্ধ নারী সুলতানা স্বপ্ন দেখে–"তিনি তাহার ভগিনী সারার মতো এক অপরিচিতা নারীর সঙ্গে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ফুলবাগান দেখিতে বাহির হইয়াছেন। ... উক্ত নারী তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে স্থানকে তাহারা বলে নারীস্থান। সেখানে পুরুষেরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ আর নারীরা বাহিরে সংসারকর্ম নির্বাহ করিয়া চলে। ... সে দেশে পুরুষ নারীর কথায় ওঠে, নারীর কথায় বসে। নারীর রচিত আইন পুরুষকে পরিলক্ষিত করিতেছে।"[২১] এটা প্রকৃত অর্থে বেগম রোকেয়ার অন্তর্লোকেরই গভীর বাসনার প্রকাশচিত্র।

নারীসমাজকে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য রোকেয়া একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। নারীমুক্তির কথা চিন্তা করে তিনি *পদ্মরাগ* (১৯২৪) উপন্যাসে অগ্নিবর্ষী বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর মতে, নারীর এই হীন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তিই একমাত্র উপায়। এ গ্রন্থে স্বামী-সঙ্গসুখ বঞ্চিতা দীনতারিণী নারীশিক্ষার উন্নতিকল্পে নিজেকে উৎসর্গ করে। কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্দিকা পুরুষতন্ত্রের অত্যাচারের শিকার হয়ে স্বামী-সংসার থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। দীনতারিণী, সৌদামিনী,

Dhaka University Institutional Repository

হেলেন, ঊষা, রাফিয়া সবাই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা নির্যাতনের শিকার। পুরুষতন্ত্রের এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিদ্দিকার কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে–"সমাজের এইসব নালী ঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে। বিনা কারণে পরিত্যক্ত হইতে হইবে, অপমানিতা হইয়া মাতালের সপত্নী সমভিব্যহার ঘর করিতে হইবে, অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘন পালন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই?...এই হতভাগ্য নারীরা সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায়। সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে।"[২২] নারী এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন যে, এ সমাজ শোষণের ছোবলে ঘুণে ধরা ও জরাজীর্ণ। মানবতা এই সমাজে উপেক্ষিত। নারীমুক্তির লক্ষ্যে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রোকেয়া আমৃত্যু লড়াই করেছেন। সিদ্দিকার মুখ দিয়ে তিনি নিজ বক্তব্য তুলে ধরেছেন–"আমরা কি মাটির পুতুল যে পুরুষ ইচ্ছা করিলেই প্রত্যাখ্যান করিবেন? ... আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দেই তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুরমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, আর রাখ তোমার পণ ও তেজ, ঐ দেখ না এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নাব (সিদ্দিকা) আবার স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল। আর পুরুষ সমাজ সগর্ব্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চশিক্ষিত উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহিয়সী, গরিয়সী, হউক না'—কেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার আমাদের পদতলেই পড়িবেই পড়িবে"। আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।"[২৩] এই একপেশে মনোভাব পরিবর্তনের জন্যই সিদ্দিকার এই আত্মত্যাগ, যার অভিলক্ষ্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন।

বস্তুত, বঙ্গীয় সমাজে নারী জাগরণের উদ্বোধক-পর্বটি সমাজ-সংস্কারক মানবতাবাদী পুরুষ ব্যক্তিত্ব দ্বারা সংঘটিত হলেও মুসলমান বাঙালি নারী মুক্তির ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়াই অগ্রণী ব্যক্তিত্ব। এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

তথ্যনির্দেশিকা

১. *সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৬১, পৃ. ২-১

২. রণেশ দাশগুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬, পৃ. ২-৭-৮

৩. দেবীপদ ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের কথা*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৩৬১, পৃ. ৮

৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ. ২

৫. তদেব, পৃ. ১২

৬. তদেব, পৃ. ১৫-১৬

৭. তদেব, পৃ. ১১-২২

৮. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (১ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ কলকাতা ১৯৬২, পৃ. ২১৯

৯. আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫৪

১০. আনিসুজ্জামান, তদেব, পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

১১. জ্যোতির্ময় ঘোষ, *নায়কের সন্ধানে*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৬

১২. অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৪

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নৌকাডুবি*, ভূমিকাংশ, রাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬

১৪. ড. দীপ্তি চক্রবর্তী, *নারীপ্রগতির স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ*, জয়পূর্বা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১০১

১৫. ড. দীপ্তি চক্রবর্তী, তদেব, পৃ. ১২১

১৬. সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, একুশে প্রকাশনী,সংস্করণ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৯৫

১৭. গোলাম মুরশিদ, *নারীপ্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, নয়াউদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৫৮-১৫৯

১৮. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা*, পুঁথিঘর, কলকাতা, পৃ. ৮৯

১৯. গোলাম মুরশিদ, রাস *সুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১২৩

২০. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনির্ভাসিটি প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৯, পৃ. ৭১, ৭৩, ৭৪

২১. মোতাহার হোসেন সুফী, *বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১, পৃ. ১৪২

২২. আব্দুল কাদির, সম্পাদিত, *পদ্মরাগ*, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩২১-৩২২

২৩. আব্দুল কাদির, সম্পাদিত, তদেব, পৃ. ৩৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
উপন্যাস রচনায় নারী

পাশ্চাত্য নারী ঔপন্যাসিক

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের উপন্যাস সাহিত্যে নারী ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতকে আত্মজীবনী রচনার মাধ্যমে নারীর উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। সপ্তদশ শতকের শুরুতেই ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় সমাজ ও পারিবারিক জীবনে সামন্ততন্ত্রের অবসান শেষে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটে। ফলে সমাজ ও পারিবারিক জীবনে জাগে ভাঙনের ঢেউ। পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানে ও যন্ত্রশিল্পের বিকাশে নারী তার কর্মক্ষেত্র হারিয়ে ফেলে। আগে তাঁত বোনা, রুটি বানানো, বিয়ার তৈরি, মোম ও সাবান তৈরি প্রভৃতি কুটিরশিল্পের মাধ্যমে নারী অর্থ উপার্জন করত। যন্ত্রশিল্পের উত্থানে নারী ওইসব স্বাধীন উপার্জন হারিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে নারী রোজগারের নতুন পন্থা হিসাবে সাহিত্য রচনাকে বেছে নেয়। এক্ষেত্রে উপন্যাসের আঙ্গিকই ছিল তাদের পছন্দনীয়। কারণ উপন্যাসের পাঠকপ্রিয়তা বিদ্যমান। ফলে উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নারী লেখকদের আগ্রহ সঞ্চালিত হতে দেখা যায়। ঔপন্যাসিক শার্লট ব্রন্টির একটি চিঠি থেকে জানা যায়, উনিশ শতকে ইউরোপে এক বছর গৃহপরিচারিকার কাজ করে যেখানে রোজগার হত ২০ পাউন্ড, সেখানে উপন্যাস রচনা করে রোজগার করা যায় ১০০ পাউন্ড। ফলে পেশা হিসাবে উপন্যাস রচনা বেশি লাভজনক। যন্ত্রশিল্পের উত্থানে কুটিরশিল্পের বিলুপ্তির ফলে নারীর হাতে ছিল অখণ্ড অবসর। তাছাড়া নারী তখনও ব্যবসা, প্রশাসন, রাজনীতির ক্ষেত্রেও খুব একটা সক্রিয় ছিল না। এ কারণে সে সময় নারী, রচিত প্রণয়মূলক উপন্যাস বাজারে আসতে থাকে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকে নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করে, শুরু করে ভোটাধিকার আন্দোলন।

নারীর অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয় ঘরকন্নার মধ্যে। সাহিত্যের অন্যান্য আঙ্গিক যেমন কবিতা, নাটক প্রভৃতি রচনার জন্য প্রয়োজন যে মুক্ত ও উপযুক্ত পরিবেশ, নারীর পক্ষে সে ধরনের পরিবেশ দুর্লভ। সে তুলনায় উপন্যাস গৃহস্থালী কাজের ফাঁকেও লেখা যায়। তাছাড়া উপন্যাস কল্পনাপ্রসূত এবং জীবনের অতিতুচ্ছ ঘটনার বর্ণনা সেখানে প্রাধান্য পায় বলে এই আঙ্গিক নারীর পক্ষে সহজতর ছিল। এখনও বিশ্বব্যাপী নারী লেখকেরা লেখার মাধ্যম হিসাবে উপন্যাসকে প্রাধান্য দেন। প্রসঙ্গত ভার্জিনিয়া উলফ্ (১৮৮২-১৯৫১)-এর *A Room of One's Own* (১৯২৯) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া যায়। এই গ্রন্থে ভার্জিনিয়া উলফ্ সমকালীন সমাজে নারীর অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন একটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে এবং আলোকপাত করেছেন নারী-পুরুষের বৈষম্যের প্রতি। লেখকের মতে শেক্সপিয়ারের বোন সমকালে শেক্সপীয়ারের সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সামাজিক অসাম্যের কারণে তার প্রতিভা বিকশিত হয়নি বরং রুদ্ধ হয়েছে প্রতিভা বিকাশের সকল পথ।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টাদশ শতকে আধুনিক উপন্যাসের সূচনাপর্বে ইউরোপে কোন নারী ঔপন্যাসিক ছিলেন না। উনিশ শতকের শুরুতে জেন অস্টিন (১৭৭৫-১৮১৭) নারী তার জগৎ ও জীবনকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করে, সমাজে সমাজে পুরুষের প্রাধান্য কতটুকু এবং সে প্রাধান্যকে নারী কিভাবে গ্রহণ করে ইত্যাদি প্রসঙ্গকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর *Pride and Prejudice* (১৭৯৬-১৭৯৭) নারীত্বের গৌরবময় মহিমা প্রকাশ করেছে। অপরদিকে পুরুষ যে মোহময় দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে শুধু নারীর রূপসুষমা বর্ণনায় মনোনিবেশ করে তা থেকে নারীকে মুক্ত করে বাস্তবতার ভিত্তিভূমিতে স্থাপন করেন ঔপন্যাসিক শার্লট (১৮১৬-১৮৫৫) ও এমিলি ব্রন্টি (১৮১৮-১৮৪৮)। সেখানে নারী আত্মজিজ্ঞাসায় মুখর, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। নারী-পুরুষে যে বৈষম্য বিরাজমান তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয় তাঁর উপন্যাসে। পুরুষ-রচিত উপন্যাসের প্রাথমিক পর্যায়ে ইউরোপে নারী ছিল প্রতিবাদহীন। পুরুষের ইচ্ছার পুতুল হওয়া বা কোন ক্ষেত্রে ক্ষীণ প্রতিবাদ ছাড়া নারীর আর কোনো কৃতিত্ব দেখা যায়নি। নারীর এই অবস্থায় ব্রন্টি ভগ্নিরাই প্রথম উপন্যাসে নারীত্বের সুরের প্রকাশ ঘটান। এই দুই ঔপন্যাসিকের হাতে নারীচরিত্র বিশেষ তাৎপর্যে উপস্থাপিত হয়ে একটি ভিন্ন সুরের প্রবর্তনা ঘটায়। এই সুরটি হল এই যে, এঁদের উপন্যাসে নারীর স্বাধীন বৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। তারা পুরুষের মোহময় দৃষ্টিকে আবিষ্ট করার চেষ্টায় ব্যস্ত নয়। আচার-আচরণে শান্ত সংযত কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও আত্মসচেতন। নারীর সহজাত প্রবণতা তথা অন্যদের ভালবাসা ও ভালবাসা পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের সহজাত বাসনা প্রকাশে তারা সংকোচহীন। নারীচরিত্রের এই অনুদ্‌ঘটিত দিকটি তাঁদের উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন—

> "পুরুষের আবেগময় দৃষ্টির মধ্য দিয়ে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য ও অন্তরসুষমা প্রায় আদর্শলোকে মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। নারীর স্বজাতি-সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও কঠোর সত্যপ্রিয়তা এই আদর্শ জ্যোতিকে অনেকটা ম্লান করিয়া উপন্যাসের নায়িকাকে বাস্তবতার স্পর্শ করাইয়াছেন, স্ত্রী ঔপন্যাসিকের বর্ণিত নারী চরিত্রে দেহ-সৌন্দর্যের আধিক্য বাস্তব-স্তুতির অতিরঞ্জনের সুর নাই; আছে গভীর বিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসা ও নিজ অধিকার সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র, ধূমায়িত বিদ্রোহোন্মুখতা, এই বিদ্রোহের সুর সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রী পুরুষের অধিকার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে অনুযোগের তীব্রতা ইংরেজী উপন্যাসে সর্বপ্রথম Bronte ভগিনীদের উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করে।"[১]

উনিশ শতকের শুরুতে নারীদের পুরুষের ছদ্মনামে সাহিত্য রচনার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। জর্জ ইলিয়ট (১৮১৯-১৮৮০) ছদ্মনামে উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মেরী অ্যান ইভান্স। জর্জ ইলিয়টের প্রথম দিকের উপন্যাসে রমণীসুলভ বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও প্রথম দিকের উপন্যাসে লেখকের নাম পরিচয় অপ্রকাশিত থাকায় সমালোচকগণ তাঁর রচনা সম্পর্কে নানা প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন। এমনকি অনেকে তাকে পুরুষ লেখক বলেই মনে করেছিলেন। তাঁর শেষদিকের উপন্যাসে সংহত প্রকাশ ও চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে জন্ম থেকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে নারীর জীবন অতিবাহিত করার পর্যায় অর্থাৎ পুরুষের প্রভুত্ব বদলের ধারণাটি পরিবর্তিত হতে শুরু করে। যত কড়া শাসনেই রাখা হোক না কেন এই পরিসরেই নারী তৈরি করে নেয় নিজস্ব জগৎ, নিজস্ব সংস্কৃতি। নারী তার নিজস্ব মূল্যবোধ বিশিষ্ট ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গড়ে নেয় উপ-সংস্কৃতি। ক্রমে এই উপ-সংস্কৃতি নারী সাহিত্যিকের লেখার অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের উপন্যাস রচনায় নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ। উপন্যাসে চৈতন্যপ্রবাহ (Stream of consciousness) প্রকরণের জন্য তিনি বিশ শতকের প্রধান ঔপন্যাসিকের মধ্যে সহজেই জায়গা করে নেন। উপন্যাস-আঙ্গিকেও আধুনিকতার উদ্‌গাতা ভার্জিনিয়ার রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—*The Voyage Out* (১৯১৫), *Mrs. Dalloway* (১৯২৫), *To the Light House* (১৯২৭), *The Waves* (১৯৩১)। তবে ভার্জিনিয়া ভাববাদী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী। তাই সমাজের পটভূমিকায় মানবচরিত্র অংকনকে তিনি অত্যন্ত স্থূল মনে করেন। তিনি মনে করেন মানুষের মনের সঙ্গে সমাজের কোন যোগ নেই। মানুষের মনের চেতনাপ্রবাহ আপনাতে আপনি বিকশিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং মানবমনের গভীরে যে চেতনাপ্রবাহ গতিময় তা বাইরের জগৎ বা ঘটনা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এই চেতনাপ্রবাহের গতির স্বরূপই হল বাস্তব। ভার্জিনিয়া মানবমনের এই চেতনাপ্রবাহের গতির জটিল স্বরূপকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। বিশেষত জেমস্ জয়েসের Uhysres (1917-18) তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু জয়েস যেখানে ডাবলিন শহরের স্থানকালকে অস্বীকার করতে পারেননি সেখানে মিসেস উল্‌ফ তা করেছেন। তাই 'মন' নামক বস্তুটি তাঁর কাছে দেহহীন, মৃত্তিকার স্পর্শবিহীন বৃন্তহীন পুষ্প হয়ে উঠেছে।[২] তাঁর উপন্যাসের মতই চেতনাপ্রবাহরীতিতে রচিত আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *A Room of One's Own*। এই গ্রন্থে সাহিত্যের প্রকৃতি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা, বাস্তবে এবং সাহিত্যে নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকার মধ্যকার বিশাল ব্যবধান সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, নারীর সাহিত্য রচনার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য, সমাজবিরোধিতা ও বিপুল বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে গৃহকোণ-আবদ্ধতা তথা তার নির্বাসন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা।

সূচনাপর্বে ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজের ভাবনা ছিল নারী উপন্যাস পাঠ করে নিজেকে সতী-সাধ্বী পতিগতপ্রাণা স্ত্রী হিসাবে গড়ে তুলবে এবং সেবায়, ভালবাসায় সংসার ভরে তুলবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কল্পনাও করেনি নারী একটি বিপ্রতীপ ধারা সৃষ্টি করে উপন্যাস লিখবে বা নিজের রচনায় নিজেদের মনোভঙ্গী উপস্থাপন করবে, পাঠকের সমক্ষে নিয়ে আসবে পুরুষতন্ত্র কর্তৃক অত্যাচার-অনাচারের চিত্র এবং সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবে। বিশ শতকের শেষে এই বিপ্রতীপ ধারাটিকেই লক্ষ করা যায় নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বিকাশের প্রতিস্থাপক শক্তি হিসাবে।

বাংলা উপন্যাস রচনায় নারী

বাঙালি নারী শতাব্দীর পর শতাব্দী বন্দিজীবন যাপন করেছে। আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি যে, উনিশ শতকের শুরুতে সেই বন্ধন কিছুটা শিথিল হতে থাকে। এ সময় রেনেসাঁস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বঙ্গীয় মনীষীরা নারীর শিক্ষা নিয়ে ভাবিত হতে থাকেন। বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স। তিনি তাঁর *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৯৫২)-এ খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এরই দুই দশকের মধ্যে প্রকাশিত হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৮৫-১৯৩২) *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬), *ছিন্নমুকুল* (১৮৭৬)। স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ঐতিহাসিক ও সামাজিক। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য *মালতী* (১৮৭৯), *স্নেহলতা* (১৮৯২), *হুগলীর ইমাম বাড়ি* (১৮৯৪), *কাহাকে* (১৯৯৮)। *স্নেহলতা* উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই উপন্যাসটিতে জগৎবাবুর রূঢ়ভাষিণী প্রভুত্বপ্রিয়া স্বামীগর্বে গর্বিতা আদরের মেয়ে অভিমানিনী টগর,

Dhaka University Institutional Repository

উদার কিন্তু দুর্বলচেতা গৃহস্বামী ও শান্তস্বভাব, সেবাকুশলা স্নেহলতা সকলকে নিয়ে এক চমৎকার পারিবারিক চিত্র তৈরি হয়েছে। চারু ও বিধবা স্নেহলতার পরস্পরের প্রতি প্রেম সঞ্চারই উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। কিন্তু তাদের প্রণয় বর্ণনা অপেক্ষা বিধবা বিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যুক্তিমূলক আলোচনাই উপন্যাসের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। *হুগলীর ইমাম বাড়ি* উপন্যাসে মহম্মদ ও মুন্না—এই দুই ভাইবোনের মধ্যে স্নেহমধুর সম্পর্ক প্রধান উপজীব্য। *কাহাকে* উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এক নারীর প্রণয় ও ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী চিত্রিত। এই উপন্যাসের নায়িকা মণি বিয়ের আগেই একজন পুরুষকে ভালোবেসে সতীসাধ্বী বঙ্গরমণীর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দশকের পেক্ষাপটে সে অবলীলায় খুবই ভয়ঙ্কর কথা বলেছে যে, সে ভালোবেসেছে বিয়ের আগেই। পুরুষটিকে ভবিষ্যৎ-স্বামী ভেবেও ভালোবাসেনি, বরং চরম বিদ্রোহের কথা হচ্ছে সে প্রেমে পড়েছে একাধিকবার। নিষ্ঠাবতী সতী নারীর ভাবমূর্তি সে ভেঙেচুরে দিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সে বিশ্বাস করে সাম্যে, শুধু নারীই পূজা করবে প্রেমিককে, আর প্রেমিক পূজা করবে না প্রেমিকাকে—এটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।[৩] *কাহাকে* উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য—"এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে আগাগোড়া স্ত্রীলোকের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক আছে, যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের আস্ফালন আছে, ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের তুলনামূলক আলোচনা আছে, কিন্তু সকলের উপর দিয়া একটি স্ত্রীহস্তের লঘু কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়।"[৪]

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা এই ধারণা ব্যক্ত করেছি যে, বঙ্গীয় মুসলিম নারীমুক্তির অগ্রদূত ও বিশিষ্ট লেখিকা বেগম রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাসে বলিষ্ঠরূপে নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা নারী বলেই সে সমাজের সকল অনাচার নির্দ্বিধায় মেনে নেয়নি। যে স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে, সে পুনরায় গ্রহণ করতে চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে সিদ্দিকা।

অনুরূপা দেবীর (১৮৮২-১৯৫৮) *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫), *মহানিশা* (১৯১৯) উৎকৃষ্ট রচনা। যদিও অনুরূপা দেবীর সৃষ্ট নারীচরিত্র প্রচলিত সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে তথাপিও শেষপর্যন্ত সেই কেন্দ্রেই ফিরে এসেছে। "অনুরূপা দেবী হিন্দুবিধানে দীক্ষিত প্রথাগত ঔপন্যাসিক; *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫) লিখেছেন তিনি বেদমন্ত্রের মহাশক্তি প্রমাণের জন্যে, কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও নারী-পুরুষের দীর্ঘকালীন লৈঙ্গিক রাজনীতি ও বিরোধের চিত্র। তাঁর *মন্ত্রশক্তি*ও নারীকেন্দ্রিক, তাঁর নায়িকা, রাধারাণী বা বাণীর বিয়ে ও স্বামীর সাথে অপসম্পর্ক এর বিষয়।"[৫] উপন্যাসের শুরুতে নারী সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। সে বিয়ে নামক প্রহসন থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে, চেয়েছে পুরুষের লালসা থেকে নিজের শরীরকে রক্ষা করতে। কিন্তু লেখক একটু একটু করে বাণীকে পুরুষতন্ত্রের অধীনস্থ হবার দীক্ষা দিতে থাকেন। ফলে বিদ্রোহিণী বাণীর মুখেই আবার ধ্বনিত হয় অন্য সুর। সে নিজেই স্বামীর দাসী হয়ে সাধ্বী স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। "বাণী চরিত্রের বিশেষত্ব তাহার গভীর ধর্মভাব ও ভক্তিপ্রবণতা। স্মরণ করিলে মন্ত্রশক্তির প্রভাব তাহার মনোভাব পরিবর্তনের পক্ষে একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়; কেননা কেবলমাত্র অমরনাথের চরিত্রগৌরব তাহার অনন্য দৃঢ়তাকে গলাইতে পারিত কিনা সন্দেহ; এই উদাত্ত, যুগ-যুগান্তরের স্মৃতিবিজড়িত মহামন্ত্র অনুক্ষণ তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া তাহাকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে তীব্র অনুশোচনাপূর্ণ করিয়া তুলিল এবং তাহার সমস্ত অহংকার চূর্ণ করিয়া তাহাকে স্বামীর উদ্দেশ্যে ছুটাইল।"[৬] নারীর এই পরিণতির মূল কারণ হল তখনও বঙ্গীয় নারীকে পুরুষ-নির্দিষ্ট নারীধর্মের সতীলক্ষ্মীর আইডিওলজির চাপের মধ্যে লিখতে হয়েছে। অনুরূপা দেবীর *জ্যোতিহারা* (১৯১৫) গ্রন্থে এক

Dhaka University Institutional Repository

দাদামশায়ের জবানিতে সমর্থন করা হয় শাস্ত্রে শূদ্র ও নারীর অনধিকারকেও। ফলে অনুরূপা দেবী নারী আন্দোলনে সামিল হয়েও লিখেছেন *মা* উপন্যাস। সেখানে টাকার লোভে বিনাদোষে পুত্রবতী বধূকে বিতাড়িত করা হয় স্বামীগৃহ থেকে, বধূ একটি প্রতিবাদের ভাষাও উচ্চারণ করতে পারে না। রাম-সীতার আদিরূপ এ আখ্যানে নিহিত ছিল বলেই মা এত সমাদর পেয়েছিল পাঠকসমাজে; যদিও এ উপন্যাসে পুরুষের বহুবিবাহকে অন্তত সমস্যাপট হিসাবে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন লেখিকা, 'মা' মাগো, সতীনের উপর মানুষ কেন মেয়ে দেয়! গঙ্গায় তো এখনও জলের কোন অভাব হয়নি।' অর্থাৎ ক্ষীণভাবে হলেও নারীজীবনের সমস্যার দিকটি সংলাপে ভাষারূপ পেয়েছিল। তাঁর *মহানিশা* (১৯১৯) উপন্যাসটি দুই পরিবারের দৈনন্দিন জীবনচিত্র নিয়ে রচিত। একদিকে লক্ষপতি ব্যবসায়ী মুরলীধর অপরদিকে দারিদ্র্য-পীড়িত ভাগ্যবঞ্চিত বিধবার দুঃখ-যন্ত্রণার চিত্র। তাঁর *পথহারা* উপন্যাসের কাহিনী বিপ্লববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসটি নারীজাতি সম্বন্ধে লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতা, সহজ ও সংস্কারলব্ধ অভিজ্ঞতার প্রমাণ অর্থাৎ নারীর নিজস্ব সংস্কৃতিমণ্ডলের প্রকাশরূপ।

নিরূপমা দেবীর (১৮৮৩-১৯৫১) উপন্যাসের সংখ্যা স্বল্প হলেও কৌশলগত দিক থেকে তা সমৃদ্ধ। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেরই মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেমের বিরোধ ও দাম্পত্য জীবনের সংঘর্ষ। বিষয়বস্তু বা উপাদান বৈচিত্র্যহীন গার্হস্থ্য জীবন থেকে আহরিত। পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি এবং তা উত্তরণের চিত্র ঔপন্যাসিক নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "তাহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি, সুকুমার চিন্তাশীলতা ও জীবন সমালোচনার অন্তর্নিহিত একটি কোমল করুণ ভাব তাঁহার নারী হস্তের লঘু স্পর্শটি চিনাইয়া দেয়। তিনি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, কোথাও তিনি বিদ্রোহের নিশান ওড়ান নাই, তীব্র উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বহু শতাব্দীর নির্মম কণ্ঠরোধের প্রতিশোধ লন নাই।"[৭] অর্থাৎ সমালোচকদের এই বিবেচনা পুরুষতান্ত্রিক হলেও নারী ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির দিকটাই বিবেচ্য হতে পারে। *অন্নপূর্ণার মন্দির* (১৯১৫)-এ প্রথম নিরূপমা দেবীর সেই ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সতী চরিত্রটি অসাধারণ সৃষ্টি। তার দৃঢ় তেজস্বিতা, নীরব সহিষ্ণুতা ও আত্মসম্মানবোধ তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তার আপাত কঠিন দৃঢ়তার অন্তরালে লুকিয়ে আছে নরম কোমল প্রেমময় মন। সতী তার লেখা পত্রে হৃদয়ভাবের যে প্রকাশ ঘটিয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। *দিদি* (১৯১৫) উপন্যাসে দেখানো হয়েছে নারীর প্রথাগত দেবী হওয়ার ছকটি। বঞ্চিত জীবনে সুরমার দেবীর মহিমা নিয়ে জীবন কেটেছে। স্বামীসঙ্গ তার কাম্য ছিল কিন্তু স্বামীর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণে স্বামীর প্রতি সুরমা বিমুখ। কিন্তু নিরূপমা দেবী শেষপর্যন্ত সুরমাকে পুরুষতন্ত্রের অধীন করেছেন। "সুরমাকে অবশেষে নিরূপমা বিন্যস্ত করেছেন পুরুষতন্ত্রের ছকে, চাপিয়ে দেয়া দেবীর ভূমিকা পালন করে সে ক্লান্ত, যার জীবনে পুরুষের প্রয়োজন প্রায় কেটে গেছে, উদ্যোগ নেন তাকে অনিচ্ছায় মেনে নেয়া দেবীর আসন থেকে দাসীর আসনে বসানোর। তবে তিনি দাসীর গ্লানিকে অস্বীকার করেন নি; একদিন একস্থানে একজনকে সে না বলিয়া গিয়াছিল, সেইস্থানে সেই ব্যক্তিকে আর একবার বলিতে হইবে 'হ্যাঁ'। নারীজন্মের অপমান ও যন্ত্রণাকে নিরুপমা অস্বীকার করেননি, তবে মেনে নিয়েছেন; সুরমা নিজের জীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর উপন্যাসের শেষে বিসর্জন দেয় তার অস্তিত্বকেও; বলে, 'নারীর দর্পতেজ-অভিযোগ কিছু নেই, আছে কেবল ভালবাসা, কেবল দাসীত্ব।' নিরুপমা সুরমাকে বসিয়েছেন পুরুষতন্ত্রের পদতলে। নিরুপমা তাঁর অপচয়িত দেবীকে পরিণত করেন অসহায় দাসীতে, জানিয়ে দেন যে নারীর মুক্তি নেই; নারীকে বন্দী থাকতেই হবে ছকে ও যন্ত্রণায়।"[৮] বস্তুত

Dhaka University Institutional Repository

সপত্নী প্রণয় থেকেই *দিদি* উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের সমস্যাপট গড়ে উঠেছে। স্বামী-পরিত্যক্ত প্রথম পত্নী স্বামীকে সপত্নীর স্বামী হিসাবে দেখতে চেয়েছে, আর যখন সেই স্বামী তারই প্রণয় যাচনা করে চলেছে তখন তাকে প্রত্যাখ্যানও করতে পেরেছে। এক হিসাবে এও এক প্রতিবাদ, যদিও সে প্রতিবাদ সমাজ-নির্দিষ্ট আইডিওলজির আওতার ভিতরেই। *দিদি* উপন্যাসের এই নায়িকার মত রবীন্দ্রনাথের *মধ্যবর্তিনী* গল্পের হরসুন্দরীও তার স্বামীকে সপত্নীর হাতে দান করেছিল। কোন আত্মসুখের কথা নারীর মুখে উচ্চার্য নয়, তাঁরা বলবেন কেবল আত্মনিগ্রহের কথা, সেই আত্মনিগ্রহের ছবিই নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, *দিদি* কিংবা *অন্নপূর্ণার মন্দির* যার দৃষ্টান্ত।

নিরুপমা দেবী *শ্যামলী*-তে (১৯১৮) চরিত্র হিসাবে নির্বাচন করেছেন শ্যামলী নামের এক বধির, পাগলি নারীকে, কাব্যিক নামটি ছাড়া আর সবই যার শোচনীয়। তাঁর নায়িকা যে বধির, পাগলি এটা তাৎপর্যপূর্ণ। নিরুপমা হয়তো এমন একটি নায়িকা বেছে নিয়েছিলেন চরম ভাবাবেগ সৃষ্টির জন্যে, কিন্তু এটাকে আমাদের মনে হয় প্রতীকী; নারীমাত্রই পুরুষতন্ত্রের কাছে বধির, পাগলি। তারা যতই শুনতে, বলতে, চিন্তা করতে পারুক, পুরুষতন্ত্র সব নারীকেই কালা-বোবা করে রেখেছে। শ্যামলী বধির, পাগলি হলেও তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে সবকিছু। নিরুপমা তাকে বারবার 'জন্তু' 'জানোয়ার' বলেই নির্দেশ করেছেন। চরিত্রটি নারীর চরম দুর্দশার রূপ, তবে নিরুপমা তাকে দিয়েছেন এমন একজন স্বামী, যে তাকে মানুষের জীবন দিয়েছে। পুরুষের ওপর দিয়েছেন তিনি বধির পাগলিকে অর্থাৎ নারীকে মানুষ করে তোলার ভার। এ-কাহিনী বাস্তবের নয়, ইচ্ছাপূরণের, সব নারীই যদি পেত এমন পুরুষ, তাহলে তাদের জীবন মানুষের জীবন হয়ে উঠত। সমস্ত নারীর মত বিয়েই তার প্রধান সংকট। তার বিয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু তার পিতার আগ্রহে বিয়ে হয়ে যায় ছোটবোনের স্বামী অনিলের সাথে। শ্যামলী নিজের জন্য যতটা সমস্যা তার চেয়েও বড় সমস্যা বাবার জন্য। নিরুপমা দেবী নারীকে প্রথাগত ছকে বন্দি করেই অংকন করেছেন, সেই সঙ্গে প্রকাশ করেছেন ছকবন্দি নারীর জন্য বেদনা।[৯]

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪) উপন্যাস রচনায় কৃতিত্বের পচিয় দিয়েছেন। তাঁর *জন্মঅপরাধী* উপন্যাসে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিপীড়নের চিত্র অংকন করেছেন। যথাবিধি এখানেও সেই সত্যটি প্রকটিত যে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। উপন্যাসের নায়িকা অপেরা নির্যাতিত, নিপীড়িত সমগ্র বঙ্গনারীর প্রতিনিধি, তার চেয়ে বড় অপরাধ নারী হয়ে জন্মানো। শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর উপন্যাসে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের চিত্র অংকন করেননি, যেমন করেছেন বেগম রোকেয়া ও শান্তা দেবী। তিনি প্রথাগত ছককে ভাঙেননি, বরং তার মধ্যে থেকেই ভেঙে দিয়েছেন প্রচলিত সুখী জীবনযাপনে অভ্যস্ত নারীর ছকটি। উপন্যাসটিতে পিতৃতন্ত্রে নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত, অপেরা শ্বশুরবাড়িতে সম্মান পায়নি, তার দায়িত্ব শ্বশুরবাড়ির সম্মান রক্ষার। শৈলবালা নারীর হৃদয়-যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন এভাবে—"হায় গো বিধাতা, তোমার সুপবিত্র বিধানের নিকট সশ্রদ্ধ সম্মানে মাথা নোয়াইয়া হাসিমুখে যেখানে আত্মোৎসর্গ করিয়া চলাই নারীহৃদয়ের স্বভাবধর্ম সেখানে কেনই যে এমন অস্বাভাবিক অধর্ম্মের উত্তেজনার বর্বর নৃশংসতা জাগিয়া ওঠে, সে প্রশ্নের উত্তর তুমিই জান নারায়ণ।" নারী তার অসহায় যন্ত্রণার অবসান ঘটায় মৃত্যুর মাধ্যমে। *জন্ম-অভিশপ্ত*-তে (১৯২১) অত্যাচারিতা স্ত্রীর অন্তরালাপে অসহায়ের তিক্ত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। পিতৃতন্ত্র ও দারিদ্র্য কীভাবে নারীকে অধস্তন ও অমর্যাদাকর অবস্থানে বন্দি রাখে তার অন্তঃসার আমরা শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখনীতে প্রত্যক্ষ করি।

সীতা দেবী (১৮৯৪-১৯৭৭) ও শান্তা দেবী (১৮৯৬-১৯৮৪) নারীসমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির উদ্‌গাতা। তাঁরা নারীমনের নিভৃতলোকে যে অন্দরমহল তথা গৃহসংস্কৃতি বিরাজমান তার বিপরীত চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের উপন্যাসের নারীচরিত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিবিধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বাস্তবতার অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত নারীরা পুরুষের সাহচর্যে অভ্যস্ত হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তে নবতর প্রণয়চেতনার উন্মেষ সম্পর্কেও সচেতন। এই নবতর প্রণয়চিত্রই সীতা দেবী, শান্তা দেবীর উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তাদের নারীচরিত্র নানা ধরনের পেশায় নিয়োজিত। নারীসুলভ কমনীয়তার তুলনায় তাদের ব্যক্তিত্ববোধই বেশি আকর্ষণ করে। হৃদয়ানুভূতির প্রকাশে তারা অন্তর্মুখী নয় বরং পুরুষের কাছে আপন মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটায় বিনা দ্বিধায় এবং পুরুষের সমান অধিকার দাবী করতেও কুণ্ঠিত নয়। মোট কথা, সীতা দেবী, শান্তা দেবী নারীপুরুষের সমকক্ষতার বিষয়টিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

শান্তা দেবীর *জীবনদোলা* (১৯৩৮) বিধবা গৌরীর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্র। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে বালবিধবা গৌরীর দুঃসহ জীবন এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সেই জীবন থেকে মুক্তির কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। শান্তা দেবী নারীকে চিরাচরিত ধারা থেকে বের করে আনতে চেয়েছেন। প্রথম থেকে তিনি বিয়ে ও পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। গৌরীর বাবা হরিকেশর বিধবা মেয়েকে সধবার ন্যায় প্রতিপালন করেন। গৌরীর শ্বশুরবাড়িতে এ সংবাদ পৌঁছালে সমালোচনার ঝড় ওঠে। গৌরী যে মুহূর্তে জানতে পারে সে বিধবা সেই মুহূর্ত থেকে তার জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে। "... বাঙালীর মেয়ে সে আপন বঞ্চিত জীবনের কথা যতটুকু বুঝিল তাহাতেই নিরানন্দ ম্লান ছায়ায় তাহার ফুলের মত মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। অজানা সেই মানুষের মৃত্যু তাহার কাছে অর্থহীন হোক পৃথিবীর কাছে তাহার বহু অধিকার যে সেই মানুষটিই হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে হিন্দুর মেয়ের মনে সে কথা ধরা পড়িলই।"[১০] শান্তা দেবী স্বামীত্বের ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে তীক্ষ্ণমুখ দিয়েছেন।

আরেক নারী ঔপন্যাসিক আমোদিনী ঘোষ তাঁর উপন্যাসে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। সংসারের আপাত-দৃষ্ট চিত্রের অন্তরালেও যে ক্লেদাক্ত, বীভৎস ক্লেদাক্ত ছবি লুকিয়ে থাকতে পারে তা চিত্রিত হয়েছে। তাঁর *ফস্কাগেরো* উপন্যাসে অল্পবয়সী স্ত্রী বয়স্ক স্বামীকে বাদ দিয়ে সমবয়সী পুরুষকে ভালবাসতে চায়। নারীর মাতৃমূর্তি তার কাছে অর্থহীন। পুরুষতন্ত্রের কঠোর বন্ধনকে ফাঁকি দিয়ে সে পরপারে পাড়ি জমায়, প্রকাশ করে পুরুষের প্রবল প্রতাপের প্রতি ঘৃণা।[১১] *দীপের দাহের* (১৯০৪) নায়িকা সামাজিক আইনকে অস্বীকার করেছে। বিয়ের মন্ত্রের জোরে সে হিন্দুবধূ হতে পারেনি। তার জীবনে বিয়ের মন্ত্রের কোন মূল্য নেই। প্রেমিকের সাথে সম্পর্কই তার কাছে সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৪) উপন্যাসের শৈবলিনীর মত বিয়ের পরও পূর্ব প্রণয়ীর প্রতি এই নায়িকাটি অনুরক্তা। তবে তাদের দুজনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিবাহোত্তর প্রেমে শৈবলিনীর মনে পাপবোধ কাজ করেছিল, কিন্তু *দীপের দাহে* তার কোন আভাস পাওয়া যায় না।

বিধবারাও যে মানুষ, তাদেরও মন আছে জীবনকে উপভোগ করার অধিকার আছে, সে বিষয়ে সোচ্চার নারী ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবী। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রচনাকার হলেন নিরুপমা দেবী। তাঁর *দিদি* উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, বালবিধবা উমা বৈধব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, তারপরও তাকে খেলাচ্ছলে ফুল পরতে দিতে রাজি নয় সুরমা, কারণ বিধবার ফুল পরতে নেই। শৈলবালা ঘোষজায়াও বিধবার শুচিশুভ্র পবিত্রতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গিরিবালা দেবীর *রায়বাড়ি* উপন্যাসে বিধবা সরস্বতী ভাগ্যবিড়ম্বিতা। তার জীবন শুষ্ক মরুভূমি, আছে কেবল আচার-বিচারের শুচিবায়ুতা। শূন্যজীবনে আচার বিচারই তার একমাত্র সম্বল। আবার সাবিত্রী রায়ের *পাকা ধানের মই* উপন্যাসের নায়িকা আন্নাকালী তার নারীজন্ম অভিশাপ বলে মনে করে।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখি পুরুষরচিত উপন্যাসে নারী তাদের ভাবাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী উপস্থাপিত। যুগ যুগ ধরে তারা নারীকে পতিভক্ত করে সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। নারীর সৌন্দর্য তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চিত্রিত হয়েছে। এই ধারার বাইরেও নারীর যে নিজস্ব একটা জীবন আছে, বিবাহিত নারীও যে অপর পুরুষকে ভালবাসতে পারে, শারীরিক কামনা-বাসনাকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারে, আশালতা সিংহের *অমিতার প্রেম* তার প্রমাণ। পুরুষ সাহিত্যিকদের উপন্যাসে কেবল নারীর সৌন্দর্যে পুরুষের মুগ্ধতার চিত্র পাওয়া যায়। এর বিপরীতটিও যে হতে পারে তা পুরুষের উপন্যাসে নেই। নারীও যে পুরুষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারে তার প্রমাণ অমিতা। অমিতা এমন একজন মেয়ে যে নিজের মুখে বলতে পারে শরীরের উন্মাদনার কথা এবং তা বিবাহিত স্বামীকে নিয়ে নয়—এটাই লক্ষ করার বিষয়। পুরুষরা মেয়েদের চুলের গন্ধ পাবে, অসংবৃত শরীর দেখে আনন্দ পাবে—এটাই সাহিত্যিক পরম্পরা। এই পরম্পরাকে উল্টে দিতে পেরেছেন আশালতা। অমিতার অন্তরালাপে একদিনের শরীরী স্পর্শের স্মৃতি—"অমিয়র কাছে এসে দাঁড়াতেই তার মাথা থেকে সেই চিরপরিচিত প্রিয় সুগন্ধ পাওয়া গেল, খুব ক্ষীণ গন্ধ। ... সেইটুকু গন্ধের ইঙ্গিতেই তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবশ হয়ে যেতে চাইলো, অমিয়র পাঞ্জাবীর গলার বোতামটা খোলা, ওর বুকের মধ্যস্থলের লোমশ অংশের একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কেবল ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে অমিতার এত ভাল লাগছিল...।"

সময় ও সমাজের বিবর্তিত ধারার পরিপ্রেক্ষিতে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ বঞ্চনার কাহিনী উপন্যাসে রূপায়িত হতে থাকে। ক্রমে তাঁরা উপন্যাসে উপস্থাপন করতে থাকেন অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন, ব্যক্তিত্বসচেতন নারীকে। তবে এখানেই নারী লেখকরা থেমে থাকেননি। ক্রমে রাজনৈতিক বিষয়ও তাদের উপন্যাসের মূল থিম হয়ে ওঠে। বিশেষত বিশ্ব শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারী ঔপন্যাসিকের যেমন সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তেমনি লেখার বিষয়ও জটিল ও বহুমাত্রিক জীবনচেতনায় হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ। সাবিত্রী রায়ের *স্বরলিপি* (১৯৫২), *মেঘনাপদ্মা* (১৯৬৪), সুলেখা স্যানালের *নবাঙ্কুর*, মহাশ্বতা দেবীর *পালামৌ* (১৯৯২), *কৈবর্ত খণ্ড* (১৯৯৪), *হাজার চুরাশির মা* ইত্যাদি উপন্যাসে রাজনীতিকে এবং বিক্ষুব্ধ দেশকালপটে নারীর সংকট ও উত্তরণ প্রয়াসকে বিষয়ীভূত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী অনন্য প্রতিভা "মহাশ্বেতা উপন্যাসের ক্ষেত্রে নবগতা হইয়াও নারী রচিত উপন্যাসের পরিধি ও বিষয়বৈচিত্র্যকে আশ্চর্যরূপে বাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার জীবন অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র পথগম্য, তাহার রূপায়ণদক্ষতাও সেইরূপ বিস্ময়কর। সাধারণ নারীর জীবনবীক্ষণে যে একটা সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা দেখা যায়, পারিবারিক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচিত ঘাত প্রতিঘাতের প্রতি একান্ত ও অব্যবহিত মনোযোগ লক্ষিত হয়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য তাহাকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া নানা নূতন পথে, অভিজ্ঞতার অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়াছেন ও নানা অপরিচিত জীবনযাত্রার ধারা আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।"[১৩] প্রথম পর্যায়ে থাকলেও পরবর্তীকালে রোমান্টিক প্রেমের স্থান মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে রোমান্টিক প্রণয় বা দৈনন্দিন জীবনচিত্রের স্থান দখল করেছে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং নিম্নবর্গের জীবনরূপ। বস্তুত সাবিত্রী রায়, সুলেখা স্যানাল কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নারীরা মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। নারীর সংসারাতিরিক্ত বহির্জগৎ ও নৈর্ব্যক্তিক কাজের জগতকে পুরুষ লেখকরা গুরুত্ব দেন না—যেমন দেন ইদানীং কালের নারী রচয়িতারা। আর তাই বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরাণী* প্রফুল্ল হয়ে ঘাটে বাসন মাজতে বসে। রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়ে* লক্ষ করা যায় এলা রাজনৈতিক কর্মী হয়েও ব্যক্তিগত প্রণয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়। সতীনাথ ভাদুরীর *জাগরী*'র

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের মা রাজনৈতিক বন্দি হলেও তার মাতৃসত্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। অপরদিকে সাবিত্রী রায়ের *স্বরলিপির* (১৯৫২) নায়িকা সাগরী পার্টির নির্দেশে স্বামী-সংসার ত্যাগ করে। নারী তার মনুষ্য সত্তা সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন, সে গৃহগত জীবনের ছক থেকে বহির্জগতের অভিমুখী। পুরুষ লেখকরা পদস্খলিত নারীকে বড়জোর সতী করে তোলেন। কিন্তু নারী ঔপন্যাসিকেরা তাদের জীবনের বহির্জগতিক সফলতার দিকটি অংকন করে।

প্রতিভা বসুর উপন্যাসে নতুন যুগের অস্থির সমাজের চিত্র অংকিত। তাঁর *মনের ময়ূর* (১৯৫২)-এর নায়িকা অনসূয়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজে চরম আঘাত হেনেছে। অনসূয়া সমাজ-পরিবারের কঠোর শাসন উপেক্ষা করে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে ছাড়াই বসবাস আরম্ভ করে। তাঁর *বিবাহিতা স্ত্রীতে* (১৯৫৮) সুজাতা দোষী না হয়েও পুরুষতন্ত্রের লালসার ফসল গর্ভে নিয়ে অপরাধী হিসাবে জীবন বিসর্জন দেয়। অথচ আসল অপরাধীর দোষ সম্পর্কে পিতৃতন্ত্র অন্ধ—এ বক্তব্যই এখানে প্রতিবেদিত। তবে বিশ শতকের শেষার্ধে এসে দেখা যায় যে, নারী পুরুষতন্ত্র, নির্দিষ্ট বিবাহ সংস্কার ভেঙে ক্রমশ বাইরে বেরিয়ে আসছে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর প্রথম উপন্যাসেই [*প্রেম ও প্রয়োজন*] বিবাহ-সংস্কার ভেঙে ফেলেন। পরবর্তীকালে রচিত বিখ্যাত উপন্যাসত্রয়ের তথা ট্রিলজির প্রথম গ্রন্থ *প্রথম প্রতিশ্রুতি* (১৩৭১), দ্বিতীয় গ্রন্থ *সুবর্ণলতা* (১৩৭৩) এবং তৃতীয় গ্রন্থ *বকুলকথায়* (১৩৮০) নারীকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের অনেকাংশ জুড়ে বিস্তৃত দেশকালসমাজ প্রেক্ষাপটের পালাবদলে প্রতিস্থাপন করে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও অগ্রসরমান করে চিত্রিত করেন। আশাপূর্ণার ট্রিওলজিতে নারীচরিত্র ব্যতিক্রমী নয় বরং ঐতিহ্যবাহী হয়েও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, আত্মকণ্ঠস্বর ও মনুষ্যধর্মের অনুসন্ধানে, নির্মাণে ও আত্তীকরণে ক্রমশ সক্রিয় ও রূপান্তরিত। নারীচরিত্র অংকনে তিনি কখনোই হিংস্র, উত্তেজিত নারীবাদী প্রকল্প তুলে ধরেননি। তারা যেমন নিপীড়নে, অত্যাচারে ক্লিষ্ট, তেমনি আবার বিদ্রোহী, প্রতিবাদী, মুক্তিকামী, তারা যেমন গৃহগত নারী তেমনি বিশ্বগত ও সৃষ্টিশীল মানবসত্তাও। আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজির নারীচরিত্রগুলি কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে রূপায়িত সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

সার্বিকভাবে উপন্যাস রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে নারী চিরাচরিত ফর্ম ভেঙে বের হতে পারেনি। সমাজাদর্শ ও ভাবাদর্শভিত্তিক পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীরা নারীচরিত্র অংকন করেছেন। কিন্তু ক্রমেই পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। নারী লেখকরা তাঁদের রচনায় এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করেন। যেখানে নারী কেবল নারী হিসাবে নয়, একজন মানুষ হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। এখানে নারী তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। আপাত বর্ণোজ্জ্বল জীবনের অন্তরালে তারা যে বর্ণহীন, একঘেয়ে, বন্দি জীবন-যাপন করে তা সহজ গার্হস্থ্য ভাষায় যেমন অভিব্যক্ত, তেমনি কাব্যময় ভাষায় জীবনের আবাহনগীতও অনুরণিত ।

নারীর লেখনীতে উপন্যাস-সমালোচনা পদ্ধতি

নারীর উপন্যাস রচনার পরিসরই তাকে ক্রমে করে তোলে নারী সাহিত্যসমালোচক ও উপন্যাস সম্পর্কে চিন্তাশীল নান্দনিক। এ সূত্রে বিশ শতকের উপান্তে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ ঘটতে থাকায় বিশেষ করে নারী রচিত উপন্যাস আলোচনায় নতুন মাত্রা পরিলক্ষিত হতে থাকে। প্রচুর নারী সমালোচক সাহিত্যালোচনায় অগ্রসর হন। স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তাঁরা যে সব সাহিত্যাদর্শের সূত্র তুলে ধরেন তাতেই তৈরি হয় নতুন এক আলোচনার ধারা। বস্তুত নারী রচিত সাহিত্যের সমালোচনা ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হতে থাকে বহুমুখী বিশ্লেষণধারা, পদ্ধতি, লক্ষ্য, বিষয়বস্তুর অসংখ্য খাতে। সাধারণভাবে বলা

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারে, নারী রচিত সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু দিক চিহ্নিত করা সম্ভব যা উপন্যাস বিশ্লেষণের নন্দনতত্ত্বকে প্রভাবিত করছে এবং যা আমাদের বর্তমান গবেষণায় পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কিছু সংজ্ঞার্থ প্রণিধানযোগ্য।

১. সাহিত্যে নারী চরিত্র কীভাবে চিত্রিত হয়েছে বা নারীদের সম্বন্ধে কী জাতীয় মন্তব্য করা হয়েছে এই জাতীয় বিশ্লেষণ আলোচ্য তত্ত্বে গৃহীত যা লেখক-লেখিকা উভয়ের রচনাকর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২. নারী লেখকদের রচনায় কীভাবে সমসাময়িক নারীর চরিত্র ও অবস্থা ফুটে উঠেছে অর্থাৎ কলমহাতে কীভাবে বোনদের দেখছেন, তাতে প্রমিলারাজ্যের রহস্য কেমন করে ভিতর থেকে উন্মোচিত হয়েছে তার প্রতিবেদন তুলে ধরা। সাহিত্যের বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, উপন্যাস রচনায় নারীদের প্রাধান্যের কারণ উদঘাটন।

৩. নারী লেখকদের রচনা অথবা নারী-পুরুষ উভয়ের লেখায় চিত্রিত নারী চরিত্রগুলিকে সমালোচকরা লৈঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কীভাবে দেখেছেন তা ব্যাখ্যা করা।

৪. পাঠিকা হিসাবে মেয়েদের কী ভূমিকা, মেয়েরা সাধারণত কী ধরনের লেখা পছন্দ করে, এই পছন্দের সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণ বোঝা সম্ভব কিনা—এইসব প্রশ্ন উত্থাপন করা। এই ধারার সমালোচনা হয়তো reader response ঘরানার কাছাকাছি।

৫. লেখিকা ও পাঠিকা ছাড়াও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেয়েদের অন্য ভূমিকা ইতিবাচক বা নেতিবাচক আছে কিনা তা যাচাই করা।

৬. কোন কোন সমালোচকের মতে, সরাসরি যেখানে মেয়েদের কথা ওঠেনি বা মেয়েরা কথা বলেনি, সেখানেও ভাষার মাধ্যমে, টেকস্টের ফাঁকে ফাঁকে এক ধরনের নারীত্ব, নারীসুলভ গুণ (বা দোষ) ফুটে উঠতে পারে। উত্তর-আধুনিক বিনির্মাণের পদ্ধতি এদিকেই অগ্রসর হয়েছে। অথবা নারীত্ব, পৌরুষ দুই-ই অতিক্রম করে দেখা দিতে পারে অর্ধ-নারীশ্বরের রূপ।

৭. লেখিকার ওপর লেখিকার প্রভাব বা নারীর দৃষ্টিতে লেখিকাদের রচনার মূল্যায়ন।[১৪]

নারীর রচিত সাহিত্য সমালোচনা বিচিত্র, বহুমুখী ধারায় দুই দশক যাবৎ বিস্তৃতি রূপ পাচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে পূর্ববর্তী মার্কসবাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও অন্যান্য মতবাদ, ইজম, উত্তর-আধুনিকতা, অস্তিত্ববাদ ও অন্যান্য চিন্তা-চেতনাও। আমাদের অভিসন্দর্ভে এইসব তত্ত্বকাঠামো যতটুকু প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে ততটুকুই ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত, আমরা আশাপূর্ণা দেবীর নারীচরিত্র চিত্রায়ণে তাঁর জীবনদৃষ্টি ও প্রকরণকলাকেই মুখ্যত বিবেচনা করব।

তথ্যনির্দেশিকা

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২৭৯-২৮০

২. হুমায়ূন আজাদ, *নারী*, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায়, তদেব, পৃ. ২৮৮

৪. তদেব, পৃ. ২৮৯

৫. হুমায়ূন আজাদ, তদেব, পৃ. ৩৫৪, ৩৫৫

৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২৫৫, ৩৫৬

৭. তদেব, পৃ. ৩৪৩

৮. সুতপা ভট্টাচার্য, *মেয়েলি পাঠ*, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০০, পৃ. ২৬

৯. সুতপা ভট্টাচার্য, *তদেব*, পৃ. ২৬

১০. তদেব, পৃ. ২৭

১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৩৫৯

১২. সুতপা ভট্টাচার্য, তদেব, পৃ. ৩৬

১৩. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আশাপূর্ণা দেবীর জীবন ও শিল্পব্যক্তিত্ব

গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শক্তিশালী লেখনীর অধিকারী আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করে। বাংলা সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হলেও তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক। এই বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভা আশাপূর্ণা দেবী উত্তর কলকাতায় তাঁর মাতুলালয়ে ১৯০৯ সালের ৮ জানুয়ারী [বাংলা ২৪ পৌষ ১৩১৫] শুক্রবার জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মা সরলাসুন্দরী দেবী, বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের আট ভাইবোনের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন পঞ্চম। গুপ্ত পরিবারের আদি নিবাস হুগলী জেলার বেগমপুর হলেও আশাপূর্ণার শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায় বৃন্দাবন বসু লেনের এক ভাড়া বাড়িতে। ঠাকুরমার যৌথ পরিবারে অতিবাহিত করলেও ঠাকুরমা নিস্তারিণী দেবীর স্মৃতি তাঁর মনে উজ্জ্বল ও প্রেরণাদায়ক। আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যকর্মেও ঠাকুরমার উপস্থিতি লক্ষিত হয় নানা চেহরায়।

নিস্তারিণী দেবীর কঠোর অনুশাসনে গুপ্ত পরিবারের মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ার কোন উপায় ছিল না। তার পাঁচ ছেলেরও মায়ের বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না । আশাপূর্ণা নিজেও এর ব্যতিক্রম নন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ তাঁর হয়নি। পারিবারিক রক্ষণশীলতার কঠোর অনুশাসনেই তিনি পৃথিবীকে দেখেছিলেন। তবে বাইরের জগৎ দেখার দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণভাবে স্বশিক্ষিত আশাপূর্ণার সাহিত্যপাঠ ও উপলব্ধির বলয় থেকে গড়ে উঠেছে।

পারিবারিক আবহাওয়া

বিশাল একান্নবর্তী পরিবার ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে আসার পর আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্য পাঠের অবাধ সুযোগ লাভ করেন। তাঁর বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন শিল্পী। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই তাঁর বাবা সম্পর্কে বলেন, 'আমার বাবা খুব মজলিশি মানুষ ছিলেন, বিস্তর গুণ ছিল তাঁর'।[১] কর্মজীবনে হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন সি. ল্যাজারাস কোম্পানির কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা *ভারতবর্ষ* [সম্পাদক জলধর সেন]-এর প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্র তিনিই এঁকেছিলেন। এ ছাড়াও *মানসী* এবং *মর্ম্মবাণী*তেও তিনি ছবি আঁকতেন। সমকালীন অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের সাথেও তাঁর পরিচয় ছিল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ণ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, ফণিভূষণ গুপ্ত। কিন্তু রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান হওয়ায় এসব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আশাপূর্ণার পরিচয় ঘটেনি।

আশাপূর্ণা দেবীর বাবার জীবনে একশো রকম পরমার্থ থাকলেও তাঁর মায়ের জীবনে একটিই পরমার্থ ছিল। আর সেটা হচ্ছে সাহিত্য পাঠ। খালি বাড়িতে চলত দুই বিপরীত হাওয়া। তা সত্ত্বেও গড়ে উঠেছিল একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেই আশাপূর্ণার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাবা রক্ষণশীল চিন্তাচেতনার অধিকারী হওয়ায় মেয়েদের লেখাপড়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু মায়ের কল্যাণে এই রক্ষণশীল পরিবেশেও সাহিত্যচর্চার ছিল অবাধ সুযোগ। শিক্ষিত পরিবারের কন্যা সরলাসুন্দরীর সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ এবং সচেতনতা বৃন্দাবন বসু লেনের জনারণ্যে হারিয়ে গেলেও; পরবর্তী সময়ে নিজস্ব নিভৃত কোণটি খুঁজে নিয়েছিল আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। 'আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যের অন্যতম বিষয়ই হল, পরিবারের যৌথ, বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর পিতৃপরিবারে, মায়ের জীবনে।'[১] পরবর্তী জীবনে আশাপূর্ণা দেবীর যে সাহিত্য-মানস গড়ে উঠেছিল তা তিনি লাভ করেছিলেন মায়ের জীবনাদর্শ থেকে।

শিক্ষাগ্রহণ

আশাপূর্ণা দেবী কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। মাত্র আড়াই বছর বয়সে আরম্ভ হয় তাঁর পাঠক্রিয়া। অন্যান্য বাঙালি পরিবারের মতই আশাপূর্ণার পারিবারিক আবহাওয়া ছিল নারীর স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার প্রতিকূল। পারিবারিক অনুশাসনের কারণে বার বছর বয়সেই তাঁকে অনুশাসনের ঘেরাটোপে বন্দি হতে হয়। কিন্তু আশাপূর্ণার লেখাপড়ার প্রতি ছিল অদম্য স্পৃহা এবং জগৎ-জীবন সম্পর্কে তৈরি হয় অনুসন্ধিৎসা। আশাপূর্ণার নিজের লেখনীতেই এ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়—

> অতি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণের পরম সুযোগে স্কুলে যাওয়ার বালাই নেই, নেই ভূগোল, ইতিহাস মুখস্থ করার, কারণ স্কুলে পড়লেই যে মেয়েরা ফ্যাশন আর বাচাল হয়ে উঠবে, এ তথ্য আর কেউ না জানুক আমাদের ঠাকুরমা ভালভাবেই জানতেন এবং তার মাতৃভক্ত পুত্রদের পক্ষে ওই জানার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ছিল না।
>
> অতএব পরম আনন্দে মুক্ত জীবনের স্বাদের মধ্যে বিচরণ। 'পাঠ্যপুস্তক' শব্দটার সঙ্গে নিদারুন অপরিচয়, অপাঠ্য পুস্তক গলাধঃকরণের অখণ্ড অবকাশ, সে বস্তুর অভাবও নেই।[৩]

আশাপূর্ণা দেবী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও তাঁর পাঠক্রিয়া তাতে বন্ধ থাকেনি। তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ বাংলা পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন মা সরলাসুন্দরী দেবী, ছিলেন তিনটি গ্রন্থাগারের সদস্য, সেগুলি হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী ও চৈতন্য লাইব্রেরী। এ সব লাইব্রেরি থেকে তিনি নিয়মিত বই পেতেন। এছাড়াও বাড়িতে আসত অনেক পত্র-পত্রিকা *প্রবাসী*, *ভারতবর্ষ*, *মানসী* ও *মর্ম্মবাণী*, *অর্চনা*, *বঙ্গদর্শন*, *মালঞ্চ*, *নারায়ণ*, *সাধনা*, *সবুজপত্র*, *ভারতী*, মস্ত লাল মলাটের *বালক*, ছোট মাপের *শিশু*, *শিশুসাথী*। বাড়িতে *হিতবাদী* ও *স্টেটসম্যান* নামে দুটি খবরের কাগজও আসত। এছাড়াও ছিল বঙ্কিম রচনাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, শরৎ রচনাবলী, হেমচন্দ্র রচনাবলী, কালীপ্রসন্ন সিংহের *মহাভারত* এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের যাবতীয় গ্রন্থাবলী।

আশাপূর্ণা দেবী ছেলে বেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। মেয়েলি খেলাধুলার তুলনায় ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলার প্রতিই তাঁর বেশি আকর্ষণ ছিল। তবে সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল কবিতা মুখস্থ করা। দুরন্ত এই মেয়েটিকে শান্ত করার জন্য মা সরলাসুন্দরী দেবী তাকে বই হাতে ধরিয়ে কোন উঁচু স্থানে বসিয়ে দিতেন। আর তখুনি দুরন্ত মেয়েটিও শান্ত হয়ে যেত। চলত তার অবিরাম বই পড়া। এভাবেই খুব দ্রুত কবিতা মুখস্থ করে ফেলতেন আশাপূর্ণা। স্কুল কলেজে পড়তে না পারার জন্য ছেলেবেলায় তার কোন আক্ষেপ ছিল না। মাতৃসান্নিধ্যে ছেলেবেলাটা কেটেছে এক আনন্দপূর্ণ জগতে। পরবর্তীতে অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তাঁকে আক্ষেপ করতে দেখা গেছে। তবে আড়াই বছর বয়সে যে বইয়ের লাইনগুলো উল্টো করে পড়ার মাধ্যমে তাঁর পাঠক্রিয়া আরম্ভ হয়, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

বোধোদয়ের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আশাপূর্ণা দেবী কলকাতা শহরেই জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর শৈশবের কলকাতার সঙ্গে বর্তমান কলকাতা শহরের অনেক বেশি তফাৎ। যদিও কখনো কখনো ঘোড়াগাড়ি চেপে চিকের আড়ালে বসে থিয়েটার দেখতে যাওয়া, আবার কখনো কোন নিমন্ত্রণ রক্ষা করা বা বেড়াতে যাওয়ার ফাঁকে দেখা, তবুও কলকাতা শহর আশাপূর্ণার খুব প্রিয় ছিল। তাঁর ছেলেবেলায় কলকাতা ছিল 'সোনার কলকাতা'। আশাপূর্ণার বার বছর বয়সে এই দেখাটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আশাপূর্ণার নিতান্ত শৈশবেই তাঁর বড়দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আর এক দিদি রত্নমালা এবং ছোট বোন সম্পূর্ণা—এই তিনে মিলে ছিলেন একাত্মা। আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলেছেন—"আমরা তিন বোন ছিলাম, যেন একটি ট্রিলজির অখণ্ড সংস্করণ। এক মলাটে তিনখানি গ্রন্থ।"[৪] বইপড়া, কবিতা মুখস্থ করা ইত্যাদি তিনজনের একসাথেই চলত। বাড়ির ছেলেরা লেখাপড়া করত, তাদের ছিল আলাদা জগৎ। আশাপূর্ণা দেবীর মা-বাবার সংসারে অপেক্ষাকৃতভাবে সাহিত্যগ্রন্থই বেশি ছিল। তাঁদের আপার সার্কুলার রোডের ১৬৬ নম্বর বাড়িতে গ্রন্থপাঠের পরিবেশ ছিল মনোরম। এই বাড়ির কাছাকাছি আর একটি বাড়িতে বাস করতেন এক দম্পতি। স্ত্রীটির অগাধ সাহিত্যক্ষুধা থাকলেও তিনি ছিলেন অক্ষর পরিচয়হীন। ফলে সাত বছরের আশাপূর্ণার ওপর ভার পড়লো তাকে সাহিত্য পাঠ করে শোনানোর। এভাবে অতি অল্প বয়সেই রোহিণী, চারুলতা, সাবিত্রীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাদের দুঃখ তাঁর কিশোরী চিত্তকে অভিভূত করত। এইসব সাহিত্যিক নারীচরিত্রাবলীর দুঃখপূর্ণ জীবনাভিজ্ঞতার পাঠ দিয়েই আশাপূর্ণা দেবীর উপলব্ধি ও অনুভূতির জগৎ তৈরি হতে থাকে। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য সম্পর্কে পারিবারিক অবস্থানগত বৈপরীত্য ছাড়াও ওইসব উপন্যাসের চরিত্রও তাঁর মনোজগতে যন্ত্রণাবোধের সৃষ্টি করেছিল। "ধীরে ধীরে মনের মধ্যে তৈরি হতে থাকে যেন আর একটা বোধের জগৎ, উপলব্ধির জগৎ। সেখানে অফুরন্ত অনুভূতির প্রবাহ। সে-অনুভূতি কিছুটা বোধের বাইরে, কিছুটা যেন বোধের জগতে ধাক্কা মেরে যায়।"[৫]

সাহিত্যরচনার সূচনা

আশাপূর্ণা দেবীর মা-বাবা আর একবার বাড়ি বদল করেন। কিছুদিন অন্যবাড়িতে বসবাসের পর ফিরে আসেন আপার সার্কুলার রোডের ১৫৭/১ নম্বরের নিজেদের নতুন বাড়িতে। এ বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যে দিদি রত্নমালার বিয়ে হয়ে যায়। সঙ্গী হারিয়ে অপর দুই বোন নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। সেই নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য দু'বোন এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসেন। নিজেদের স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে একটি চিঠি পাঠান উত্তরের প্রার্থনা জানিয়ে। তাদেরকে অবাক করে দিয়ে অচিরেই এসে যায় প্রার্থিত উত্তর। এতে দু'বোনের সাহস আরো বেড়ে যায়। এরই ফলস্বরূপ তের বছর বয়সে ছাপার অক্ষরে প্রথম আশাপূর্ণা দেবীর লেখা বের হয়। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের সময় তাঁর মানসিক অবস্থা ছিল 'ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির মতই'।

কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যজীবনের সূচনা। তাঁর প্রথম সাহিত্যকীর্তি একটি কবিতা 'বাইরের ডাক' বাংলা ১৩২৯ [১৯২২] সালে *শিশুসাথী* পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাটি প্রকাশের পর অবশ্য একটি সমস্যাও হয়েছিল। সেটি সম্পর্কে আশাপূর্ণা নিজেই বলেছেন—'কাউকে না জানিয়ে পাঠানোর জন্য কবিতার পাশে লেখিকার নামটা যে আমারই নাম, বাড়িতে সেটা প্রমাণ করতে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল।'[৬] প্রথম রচনার জন্য আশাপূর্ণা যে পুরস্কার পেয়েছিলেন তার আনন্দই ছিল আলাদা। পরবর্তী জীবনে তিনি অবশ্য আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম পুরস্কারই তাঁকে সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত করত। কবিতা প্রকাশের পর 'শিশুসাথী' থেকে গল্প পাঠানোর অনুরোধ আসতে থাকে। তাঁর প্রথম গল্প 'পাশাপাশি' এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ক্রমশ অন্যান্য ['মৌচাক', 'খোকাখুকু'] পত্রিকায়ও তাঁর গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময় তাঁর লেখা ও পড়া—দুইই সমান গতিতে চলছিল এবং তাঁর উপলব্ধি ও অনুভূতির জগৎও ব্যাপ্ত হচ্ছিল। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য তাঁকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করত। এ ব্যাপারে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—"যখন আমার খুব কম বয়স তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে—আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি, ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড় বেশি তফাৎ। ...এটা আমাকে খুব বিদ্ধ করত। ...সব জায়গাতেই দেখতাম পুরুষের প্রবল প্রতাপ।...অল্পবয়সি মেয়েদের বিশেষ করে বউদের জীবনে ছিল মহানিশা! সেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করত, কেন এমন অবিচার।"[৭] কৈশোরেই আশাপূর্ণা দেবীর মধ্যে সহমর্মিতার বোধও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি হয়েছিল।

বিয়ে ও সংসারজীবন

আশাপূর্ণা দেবীর জীবনের পট পরিবর্তন হয় পনের বছর বয়সে। কৃষ্ণনগরের মাঝেরপাড়া নিবাসী নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও সরোজিনী দেবীর প্রথম পুত্র কালীদাস গুপ্তের সাথে বাংলা ৬ শ্রাবণ ১৩৩১ [১৯২৪] সালে আশাপূর্ণা দেবীর বিয়ে সম্পন্ন হয়। আশাপূর্ণা দেবীর শ্বশুরবাড়ি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। নারীর লেখাপড়া, সাহিত্যপাঠ বা লেখার পরিবেশ সেখানে ছিল না। এরূপ পরিবেশে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত কেবল নতুন পঞ্জিকার পাতা উল্টিয়েই কাটাতে হয়েছে অনেক অলস দুপুর। আশাপূর্ণা দেবীর স্বামী কালীদাস গুপ্ত চাকুরি করতেন কলকাতার মার্কেন্টাইল ব্যাংকে। সপ্তাহে একদিন তিনি কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে যেতেন। যাতায়াতের অসুবিধা লাঘবের নিমিত্তে ভবানীপুরে বাসা ভাড়া করে মা, বাবা, স্ত্রী ও ভাইদের রমেশ মিত্র রোডের বাড়িতে নিয়ে আসেন। এর ফলে আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হয় আশাপূর্ণার পড়া এবং লেখা। কলকাতার বাসায় আসার পর তাঁর লেখার গতি আর কখনোই ব্যাহত হয়নি। শ্বশুরবাড়ির কেউ এতে বাধারও সৃষ্টি করেনি। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম, দায়-দায়িত্ব শেষ করে রাতের নির্জনে তিনি খাতা খুলে বসতেন, লিখে যেতেন একের পর এক চমক সৃষ্টিকারী লেখা।

আশাপূর্ণার স্বামী কালিদাস গুপ্তেরও ছিল সাহিত্যপ্রীতি। স্ত্রীর সাহিত্যরচনার প্রতি ছিল তাঁর উদার সমর্থন। পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন ছিল আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যরচনায় প্রেরণা সঞ্চারক। তিনি স্বামীর কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিলেন। বিবাহিত জীবনে প্রথম দিন থেকেই স্বামী তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। এ বিষয়ে আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলেছেন, "এমনকি আমার লেখা যারা ভালবাসত এবং সেই সূত্রে আমাকেও যারা ভালোবাসত, তাদেরও উনি একান্ত প্রীতির চোখে দেখতেন। এমনও হত যাঁরা আসতেন তাঁদের অনেকেই আমার সঙ্গে কাজের কথা সেরে নিয়ে ওঁর সঙ্গেই গল্প করে, কথা বলে বেশি সময়টা ব্যয় করতেন।"[৮] পরবর্তী জীবনে আশাপূর্ণা দেবী যেসব সভাসমিতিতে অংশ নিয়েছেন সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন স্বামী কালীদাস গুপ্ত। দীর্ঘ চুয়ান্ন বছরের দাম্পত্য জীবনে উভয়ে সুখ-দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৬ সালে সতের বছর বয়সে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। ১৯২৬-১৯২৯-এর মধ্যে পুষ্পরেণু, প্রশান্ত ও সুশান্ত—এই তিন সন্তানের জন্মদানে তাঁর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময় কঠোর সাংসারিক দায়দায়িত্ব ও সাহিত্যরচনা সমান তালে চলতে থাকে। ধর্মের প্রতিও আশাপূর্ণা-কালীদাস দম্পতির পূর্ণ আস্থা ছিল। শাশুড়ি "সরোজিনী দেবীর সন্ন্যাসী ভাই স্বামী পূর্ণানন্দের কাছে দীক্ষা নেন তাঁরা দু'জনে, আশাপূর্ণার কুড়ি বছর বয়সে। এই দীক্ষা গ্রহণের অনতিবিলম্বেই প্রথমে কালীদাস গুপ্ত, পরে আশাপূর্ণা নিরামিষাসী হয়ে যান—প্রাত্যহিক এই সংযম অটুট ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। "আশাপূর্ণা নিজে রন্ধনপটিয়সী, সুগৃহিণী ছিলেন কিন্তু সতর্ক পাঠকের মনে হয়েছে, হয়তো নিরামিষ খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস থেকেই, আশাপূর্ণার গল্প উপন্যাসে ঘর-সংসার-রান্নাবান্নার কথা বারবার এলেও আহার বিষয়ে তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত কম।"[৯] ইতোমধ্যে তাঁরা বাড়ি পরিবর্তন করে রমেশ মিত্র রোড থেকে টাউনসেন্ড রোডে যান, সেখান থেকে যান ৭৭ বেলতলা রোডে।

সাহিত্যসাধনা : প্রথম পর্যায়

কবিতা লেখার মধ্য দিয়েই আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যজীবনের সূচনা। পরবর্তীকালে গল্প উপন্যাস রচনা করলেও সাহিত্যজীবনের শেষপর্যন্ত কবিতা লিখেছেন। তবে তাঁর কবিতা বেশির ভাগই আত্মীয়-স্বজনদের বিয়ে উপলক্ষে রচিত। কখনো আবার কিছু দেশাত্মবোধক কবিতাও লিখেছেন। কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন অনেক গল্প। পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গ্রন্থ *ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা* [১৩৪৫ শ্রাবণ]। এরপর প্রকাশিত হয় তাঁর অপর গল্প-সংকলন *জল আর আগুন* [১৩৪৬]। গ্রন্থটি প্রকাশের পর অনেকেই মনে করেছিল এটি সম্ভবত নারীর ছদ্মনামে কোন পুরুষের রচনা। এর কারণ হিসাবে বলা যায়, তিনি বাইরের জগতে পরিচিত ছিলেন না। কখনো কোন সম্পাদক বা প্রকাশকের নিকটও যাননি। রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা এবং বধূ হওয়ার কারণে দীর্ঘদিন বাইরের জগতের সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর যোগাযোগ ছিল না।

১৯৪৭ সালে প্রথম আশাপূর্ণা দেবী বাইরে আসেন। সে সময় তাঁর বয়স আটত্রিশ বছর। কবি নরেন্দ্র দেবের অনুরোধে ক্যালকাটা কেমিক্যালের উদ্যোগে *কথাশিল্প* নামক গল্প-সংকলন কেন্দ্র-কর্তৃক আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে প্রথম তাঁর বাইরে যাত্রা। এর আগে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকের সাথে আশাপূর্ণা দেবীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। পুরুষ লেখকেরা বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠী গঠন করে নিজেদের মতামত প্রকাশ করলেও বাংলার নারী লেখকরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী সমকালীন দেশকাল সম্পর্কে সচেতন থেকেও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। চল্লিশের দশক ছিল ভারতীয় রাজনীতির উত্তাল সময়। পারিবারিক জীবন-কাঠামোতেও এ সময় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। নারী হয়ে ওঠে আত্মআবিষ্কারস্পৃহ ও অধিকার-সচেতন। রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকার কারণে দেশাত্মবোধক সাহিত্যরচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর বক্তব্য—"বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই লিখতে পারিনি। আমাদের সময় ঘরেই তো থাকতে হত। বাইরে বেরোনোর সুযোগ তেমন ছিল না, একটু আধটু যা শুনেছি তাতে লেখা যায় না। তাই লিখিনি।"[১০] তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়ের ছোঁয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আশাপূর্ণা দেবীর কিছু গল্প-উপন্যাসে [*সুবর্ণলতা*] উঠে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যসাধনা : দ্বিতীয় পর্যায়

পঞ্চাশের দশকে এসে পারিবারিক এবং বাইরের জীবন—উভয় ক্ষেত্রেই আশাপূর্ণা দেবীর ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। ক্রমেই পরিচিত জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট দিকপাল এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নরেন্দ্র দেব, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, মহাশ্বেতা দেবী, পরিমল গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন মজুমদার, সুমথনাথ ঘোষ, কবিশেখর কালিদাস রায়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অনুরূপা দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, প্রভাবতী দেবী, ড. রমা চৌধুরী, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে এসব কবি-সাহিত্যিকের কারো কারো সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আবার কেউ কেউ একসঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যসম্মেলনে যোগদান করতে করতে আত্মার জন হয়ে গেছেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসা প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন—"এ কথা অনেকজন অনেক সময়ই বলেছেন, 'সাহিতক্ষেত্রে এসে আপনি যেসব বিশিষ্টজনদের দেখেছেন, তাদের কথা একটু লিখুন না।' কখনো কখনো পত্রপত্রিকা থেকে 'ফিচার' সংগ্রহকারীরা একান্ত অনুরোধও জানিয়েছেন, কিন্তু সেরকম লেখার উৎসাহ আসেনি।...মনে হয়েছে এ ধরনের লেখা তো কতই হয়েছে, হচ্ছে, 'যাঁদের দেখেছি, যাঁদের সান্নিধ্যে এসেছি' ইত্যাদি আবার সেই ধরনের লেখায় নতুনত্ব কি হবে? তা ছাড়া যাদের দেখেছি তাঁদের কতটুকুই বা দেখেছি? জীবনের আসল সময়টিই তো আমার কেটে গেছে অন্দরমহলের অন্তরালে। সে বয়সে থাকে আবেগ আগ্রহের চোখ, আর বিশিষ্ট বিখ্যাত এবং প্রিয় কবি-সাহিত্যিকদের দেখার জন্য ব্যাকুলতা। যাঁদের দেখে ধন্য হতে পারতাম, এমন জনেরা তো থেকে গেছেন কেবলমাত্র বইয়ের পাতার মধ্যে। দেখাদেখির সুযোগ এসেছে অনেক পরে প্রায় পরিণত বয়সে।...অবশ্য সেই 'পরে আসার' ঘাটতিটি যে পূরণ হয়নি তা নয়, প্রত্যাশার অধিকই হয়েছে। এসে পড়ে দেখলাম অনেক অগ্রজ সাহিত্যিকদের মধ্যে আমার জন্যে জমানো রয়েছে অনেকখানি স্নেহ। আমার জন্যে রাখা রয়েছে অনেকখানি সমাদর আর ভালবাসার আসন। সে এক পরম প্রাপ্তি।"[১১]

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম উপন্যাস *প্রেম ও প্রয়োজন* প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প দিয়ে যাত্রারম্ভ হলেও আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যজীবনের প্রধান পরিচয় গড়ে উঠেছে মূলত উপন্যাসের সুবিশাল পটভূমিকায়। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পর তিনি থেমে থাকেন নি, লিখে গেছেন একের পর এক গল্প-উপন্যাস এবং সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যিক জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন 'ঔপন্যাসিক হিসেবেই আমার পরিচয় কিন্তু ছোটগল্প দিয়েই আমার সাহিত্য জীবনের শুরু।'[১২]

সাহিত্যক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারও তিনি এই সময়েই পেয়েছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'লীলা পুরস্কার' প্রদান করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর পত্রিকা প্রদান করে 'মতিলাল ঘোষ পুরস্কার'। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় আশাপূর্ণা দেবীকে 'ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক' প্রদান করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদান করে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার'।

সাহিত্যসাধনা : তৃতীয় পর্যায়

একান্ন বছর বয়সে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আশাপূর্ণা দেবী স্বামী, সন্তান, নাতনিকে নিয়ে নিজের সংসার গড়ে তোলেন। এখান থেকে পরবর্তী দশ বছর পর ১৯৭০ সালে তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন নিজের বাড়িতে উঠে

Dhaka University Institutional Repository

যান। এই বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখতেন চলমান জীবনের গতিপ্রবাহ। সত্তরের দশকে এসে আশাপূর্ণা দেবী বিভিন্ন সাহিত্যসভায় যোগদান করতে থাকেন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পর আশাপূর্ণা দেবী বিভিন্ন সাহিত্যসম্মেলনে যোগদান করে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা করেছেন। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৪ সালে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেন। এ ছাড়াও এপ্রিল ১৯৭২ সালে শিলিগুড়িতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে জামশেদপুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মলনে, ১৯৮৯ সালে দিল্লীতে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এসব সম্মেলনে তিনি সাহিত্য কি, সাহিত্য কেন, সাহিত্যের কর্তব্য কি, সাহিত্যের দায়িত্ব কি ও কতটা সুদূরপ্রসারী, বিগত ও বর্তমান সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা, বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসব বিষয়ে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর নিজস্ব মতামত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, 'তারাশঙ্কর জন্মদিবস উদ্‌যাপন সমিতি'র আমন্ত্রণে যান লাভপুরে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের বাসগৃহে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'রবিবাসর'-এর সদস্যদের মধ্যে মহিলা হিসাবে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তা ছাড়া আশাপূর্ণা দেবীর নিজের বাসভবন গোলপার্ক ও গড়িয়ায় অনেকবার বসেছে 'রবিবাসর'-এর আসর।

সত্তরের দশকেই আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর উপন্যাস অনূদিত হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে আশাপূর্ণা দেবীর *অগ্নিপরীক্ষা* হিন্দীতে অনূদিত হয়। বলা যায়, সত্তরের দশক তাঁর সাহিত্যজীবনের সর্বাধিক ঐশ্বর্যময় সময়। এই দশকটি একই সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর পাওয়া এবং হারানোরও দশক। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর *প্রথম প্রতিশ্রুতি*। পরবর্তীতে এই উপন্যাসের পরবর্তী ধারা হিসাবে প্রকাশ পায় সুবর্ণলতা (১৯৬৭) ও *বকুলকথা* (১৯৭৪)। *প্রথম প্রতিশ্রুতি* উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, ভূষিত হন নানা পুরস্কারে। এই উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেন। লাভ করেন ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সম্মান এবং সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।' পেয়েছেন 'সম্মানসূচক ডক্টরেট' ডিগ্রিও। ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার আশাপূর্ণা দেবীকে 'সাহিত্য আকাদেমি ফেলো' নির্বাচিত করেন।

প্রাপ্তির পাশাপাশি হারিয়েছেনও অনেক কিছু। ১২ মার্চ ১৯৭৮ সালে দীর্ঘ চুয়ান্ন বছরের সুখ-দুঃখের নিত্যসঙ্গী স্বামী কালীদাস গুপ্ত পরলোকগত হন। প্রিয় সঙ্গীর বিয়োগব্যথা তাঁর হৃদয়ের গহনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। বাইরের জগতে তার প্রকাশ না থাকলেও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে হারিয়ে ফেলেন দুই দাদা, চিরদিনের সঙ্গী দিদি রত্নমালা ও ছোটবোন সম্পূর্ণাকে। এর কিছুদিন পরেই পরলোকগত হয় সবচেয়ে প্রিয় বোন লেখা এবং ভাই সত্যেন্দ্রনাথ। তবে প্রিয়জনদের বিয়োগব্যথা আশাপূর্ণা দেবীর কলমকে থামিয়ে দিতে পারেনি। ১৯৯৫-এর দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি একের পর এক উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু একসময় তাও বন্ধ করতে হয়। তাঁর কলম থেমে যাওয়ার দু'তিন মাসের মধ্যেই ১৩ জুলাই ১৯৯৫ সালে এই বিরল প্রতিভা ইহলোক ত্যাগ করে।

জীবন-ভাবনা

কঠোর সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও সমকালীন যুগের প্রবণতা আশাপূর্ণাকে স্পর্শ করেছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় অনেক বদল ঘটেছে সমাজের, সমাজ-মানসিকতার। পুরনো

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধগুলো একে একে ভেঙে গেছে, পরিবর্তন ঘটেছে দৃষ্টিভঙ্গীর। এই পরিবর্তনের ধারা আশাপূর্ণা দেবীর লেখায়ও ছায়া ফেলেছে। তবে পুরো মাত্রায় নয়। তিনি জীবনের স্বাভাবিক সত্য, মঙ্গল ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। 'তাঁর 'আধুনিকতা' সবটাই নিজস্ব থেকে শেখা।' তা এতটুকুও ধার করা নয়। তিনি স্বশিক্ষিত, স্কুল-কলেজের ইংরেজিশিক্ষিত নন। "আমার মা-মাসিমারা যেমন, তিনিও তেমনই। অথচ কী করে তিনি নাগাল পান আধুনিকতার মূল্যবোধের, সন্ধান পান মোক্ষম, মৌল সব যন্ত্রণাগুলোর, কী ভাবে তিনি ধরতে পারেন চলতি যুগের নাড়িটা চেপে! সার্থক বদ্যির মেয়ে।" আশাপূর্ণা দেবী সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্যিক-জীবন ও সংসার-জীবন—দু'টিকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সংসারকে অবহেলা করে তিনি কখনোই সাহিত্য রচনায় নিমগ্ন থাকেন নি। তাঁর নিকট লেখিকা-জীবনের তুলনায় সংসার-জীবন ছিল অনেক বেশি গুরুত্ববহ। আশাপূর্ণা দেবীর নিজের মন্তব্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়—"আমি নিজের সাহিত্যজীবনকে কখনোই আমার ঘর-সংসার-পরিবার জীবনের ওপরে স্থান দিতে পারিনি। আমি সংসারের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে করতে চাই, করেছিও। জীবনটা যে নিছক শিল্পীজীবন এ-বোধ তো সেকালে আমাদের তৈরি হয়নি।"[১৩] আশাপূর্ণা দেবীর সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নিরন্তর অনুশীলন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপ্রক্রিয়া। তাঁর কর্মপ্রক্রিয়া কেবল সংসারধর্ম পালন এবং সাহিত্যরচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; পড়তেনও প্রচুর। আড়াই বছর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পাঠক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং এটি আধুনিক সাহিত্যিকদের নিকট সময়ের দাবী বটে।

আশাপূর্ণা দেবী জীবন সম্পর্কে ছিলেন গভীর আশাবাদী। তিনি কখনোই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেননি। জীবনের অবক্ষয়ের দিকগুলোই তাঁর কাছে শেষ কথা নয়। অবক্ষয়ের মাঝেও তিনি জীবনের সুষমার দিকটি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—"আমার এই দীর্ঘ জীবনের সাহিত্যকর্মের মধ্যেই হয়তো কখনো কখনো পৃথিবী সম্পর্কে দিয়েছে হতাশা। তাই বলে আমি কখনও অবক্ষয়ের ছবিকে জীবনের শেষকথা বলে মনে করি না।"[১৪] জীবন সম্পর্কে এই গভীর বিশ্বাস ও আস্থাই তাঁর সকল সাহিত্যকর্মের মধ্যে উচ্চারিত।

সাহিত্য-ভাবনা

জীবন ও সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। তবে জীবনের দ্বারা সাহিত্য যতটা প্রভাবিত, সাহিত্য দ্বারা জীবন ততটা নয়। আশাপূর্ণার মতে, সার্থক সাহিত্য তাই যা পাঠকমন জয় করতে পারে। সংসারে এমন কোন জীবন নেই যা সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে না; আপাততুচ্ছ জীবনই লেখকের লেখনীর ক্ষমতার গুণে অসাধারণ হয়ে প্রকাশ পায়। যুগে যুগে সমাজ-মানসিকতায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার প্রভাব সাহিত্যেও পড়ে। তবে সাহিত্য কোন কিছুকে যাচাই ব্যতীত গ্রহণ করে না। আশাপূর্ণার মতে, "সাহিত্যের আর একটি ধর্ম সবকিছুকে যাচাই করে নেওয়া। প্রচলিত বিশ্বাস, প্রচলিত মূল্যবোধের ধারণা, চিরাচরিত সংস্কার, বন্ধন, সবকিছুকে সে ভেঙে ভেঙে দেখতে চায়, দেখতে চায় তার উপরকার মোহ আবরণটি উন্মোচন করে করে। তারপর করতে বলে তার নূতন মূল্যায়ন।"[১৫]

সাহিত্যে জীবনেরই রূপায়ণ ঘটে। পরিবর্তনশীল এই জগতে যুগ, সমাজ, সমাজ-মানুষের মানসিকতা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। সাহিত্যে এই পরিবর্তনশীল সমাজ-মানসের ভেতর-বাহির দু'টোই সমানভাবে প্রকাশিত হয়। আশাপূর্ণার মতে, সাহিত্য প্রতি পদক্ষেপেই নূতন পরীক্ষায় চঞ্চল, এবং

Dhaka University Institutional Repository

সর্বদাই দুঃসাহসিক পথের যাত্রী। সাহিত্যের ধর্মই অস্থিরতা। আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টিসম্ভারের প্রাচুর্যে আশাপূর্ণা দেবী আশাবাদী। সাহিত্য তাঁর কাছে প্রিয়জনতুল্য। তিনি সাহিত্যকে দলিল বলে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'মানুষের এই নিতান্তই আহার নিদ্রার বন্ধনে বন্দী জীবনসত্তার অন্তরালে অবস্থিত শিবসত্তার আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতাই সাহিত্যের কারণস্বরূপ।' এই অর্থে তিনি অনেকটাই রাবীন্দ্রিক সাহিত্যাদর্শের অনুপন্থী। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যকে জৈবিক অস্তিত্বের অতিরিক্ত বলে মনে করেন। আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্যকে কোন একটা কালসীমায় খণ্ডিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে, সাহিত্য হচ্ছে যুগ যুগান্তরসঞ্চিত মানস-চেতনার একটি অবিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার আলোক।

তথ্যনির্দেশিকা

১. তথ্যসূত্র, *আশাপূর্ণা দেবী*, উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারী ২০০৪, পৃ. ১০

২. তদেব, পৃ. ১১

৩. আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা*, কলকাতা পুস্তকমেলা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, পৃ. ৪

৪. আশাপূর্ণা দেবী, তদেব, পৃ. ৩৪

৫. তদেব, পৃ. ৭

৬. তথ্যসূত্র, আশাপূর্ণা দেবী, তদেব, পৃ. ১৬

৭. 'দেশ', ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ [সাক্ষাৎকার—চিত্রা দেব], তথ্যসূত্র—*আশাপূর্ণা দেবী*, উপাসনা ঘোষ, তদেব, পৃ. ১৯

৮. তদেব,

৯. উপাসনা ঘোষ, *আশাপূর্ণা দেবী*, তদেব, পৃ. ২০

১০. 'দৈনিক বসুমতী', ২৫.১.১৯৮৩, তথ্যসূত্র *আশাপূর্ণা দেবী*, তদেব

১১. আশাপূর্ণা দেবী, *সুবর্ণলতা*, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. পৃ. ১৬০

১২. আশাপূর্ণা দেবী, তদেব, পৃ. ৩৭

১৩. আমরা সবাই, 'সময়ের পথে কিছু স্মৃতি', নূপুর গুপ্ত, ১ম পর্ব ২য় সংখ্যা, শারদীয়া, তথ্যসূত্র উপাসনা ঘোষ, তদেব, পৃ. ৩৩

১৪. তদেব, পৃ. ২১

১৫. তদেব, পৃ. ১৪৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রথম প্রতিশ্রুতি : গার্হস্থ্য ও সারস্বত জীবনালেখ্য

আশাপূর্ণা দেবীর রচনাসম্ভার বিপুল কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নাটক, গল্প ও উপন্যাসসহ প্রায় আঠারশ'র কাছাকাছি। এর মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা আড়াইশরও বেশি। কথাসাহিত্যিক হিসাবে তিনি শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরি। বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকের লেখকরা জীবন পর্যবেক্ষণকে মুখ্য করে উন্মোচন ও রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন জীবনমঞ্চের কুশীলবদেরকে এবং তাদের অভিলক্ষ্য ছিল জীবনকে জীবনের মতোই রূপান্বিত করা। এ-ধারারই বিরল বিস্ময় আশাপূর্ণা দেবী। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, মধ্যবিত্ত বাঙালির পারিবারিক অবস্থানটির প্রতিবন্ধকতা জয় করে তিনি নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আরও লক্ষণীয় যে, যে জীবনযাপনের আবহে তাঁর এই প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সেই জীবনের ধারাবাহিক সময়কে উপন্যাসের পটভূমি ও জীবনচিত্র করে তোলার সাবলীল দক্ষতা।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম উপন্যাস *প্রেম ও প্রয়োজন* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু একজন কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সর্বাধিক পরিচিতি বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী উপন্যাস—*প্রথম প্রতিশ্রুতি* (১৯৬৪), *সুবর্ণলতা* (১৯৬৭) ও *বকুলকথা* (১৯৭৪) রচনার জন্য। প্রকাশকালের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুধাবন করা যায় যে, প্রথম উপন্যাসের অনেক পরে ষাটের ও সত্তরের দশকের উত্তাল সময়পটে পরিণত শিল্পী ব্যক্তিত্বরূপেই এই ত্রয়ী উপন্যাস রচিত। আর উপন্যাসত্রয়ীতে যে কাহিনীপট ও সময় পরম্পরা বিধৃত তা উনিশ শতকের অনেকাংশ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ একজন পরিণত কথাশিল্পী বঙ্গীয় সমাজ ও সময়ের পরম্পরাকে তুলে ধরেছেন বৃহৎ পটভূমে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবাহিত সমাজ, সময় ও মানুষদের নিয়ে তিনি রচনা করেছেন জীবনের অভিযাত্রা। বলা বাহুল্য, এই অভিযাত্রা নারী জীবনের প্রজন্মের ধারাবাহিকতা কন্যাসন্তানের ক্রমানুসারে নির্ধারিত।

বৃহত্তর সমাজচিত্রের দিক দিয়ে উপন্যাস এর "একদিকে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত কৃষি উৎপাদন নির্ভর বাঙালির নগর কলকাতায় এসে চাকুরিজীবী শহরবাসী হয়ে ওঠার ইতিহাস; আর অন্যদিকে প্রচেষ্টা।"[১] বাংলা উপন্যাসে উনিশ শতকের সময় এ জীবনের প্রতিচ্ছবি বিচিত্র রূপে ও বহুমাত্রিক তাৎপর্যে রূপায়িত হয়েছে প্রথিতযশা কথাশিল্পীদের লেখনীতে। বিশেষত বিগত কালের ইতিহাস—যাতে উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে বহির্জীবনের রূপ-রূপান্তরের নানা কাহিনীপটে বিন্যস্ত হয়ে—যেখানে পুরুষচরিত্রই মুখ্য! এই ধারায় আশাপূর্ণা দেবী একটি পৃথক প্রতিবেদন উত্থাপন করলেন। *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-তে তাঁর বক্তব্য—"বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চারিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের,

Dhaka University Institutional Repository

যুগের, সমাজ, মানুষের, মানসিকতা। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয় । তবু রচিত ইতিহাসগুলো চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।"[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় জুড়ে উপন্যাসটির কাহিনীপট ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবর্তী, তার জন্ম ও পারিবারিক সূত্রে আত্মপ্রকাশের প্রথম ক্ষেত্র ছিল নিত্যানন্দপুর গ্রামে রামকালী চাটুজ্যের বৃহৎ একান্নবর্তী সংসারে। পিতা রামকালী কৈশোরে গৃহত্যাগ করে ভবঘুরে হয়েছিল। যে সময় আশ্রয় নিয়েছিল রাজকবিরাজ গোবিন্দ গুপ্তর অর্থাৎ কালের দিক দিয়ে নবাবি আমলের শেষ পর্যায় ও সামন্ত-সমাজ ভাঙনের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট। উপন্যাসের যখন শুরু তখনকার সময় এগিয়ে গেছে সেই সময়ে যখন রামকালী গ্রামে ফিরে এসে ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে করেছে এবং একমাত্র সন্তান সত্যবতীর জন্ম হয়েছে। সত্যবতীর বালিকা বয়স-ঔপন্যাসিক লিখছেন নয় বছর, এখান থেকে মূল কাহিনীর সূত্রপাত। দুটি গ্রামের পটভূমি আছে উপন্যাসে-নিত্যানন্দপুর ও বারইপুর, যেখানে অতিবাহিত হয়েছে সত্যবতীর গ্রামীণ জীবন, কালের দিক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ, দ্বিতীয়ার্ধে সে নগর কলকাতার অধিবাসী। গ্রাম ও নগরের এই দ্বৈত জীবনপ্রতিবেশে সত্যবতীর যে 'প্রত্যহের প্রবর্তমান' ইতিহাসটি রচিত তা একইসঙ্গে গার্হস্থ জীবনের বৃত্তান্ত ও সারস্বত সন্ধিৎসার জন্যে নিভৃত লড়াই। গার্হস্থ্য বৃত্তান্তে আছে নারী পুরুষের বৈষম্য, দাম্পত্য সম্পর্কের সদর্থ-সন্ধান, পার্শ্বচরিত্রের সঙ্গে জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক জটিলতা ইত্যাদি। সারস্বত জীবন রচনার আন্তর্তাগিদে লক্ষণীয় শিক্ষার জন্য নারীদের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম এবং নিজের সৃজনশীল সত্তা গড়ে তোলার জন্য একটি মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ না পাওয়ার গোপন-কান্না। এই উভয় সূত্রের অবকাঠামোটি তৈরি হয়েছে গ্রাম ও নগরের বিভাজনে, "গ্রাম-শহর এ উপন্যাসে এক পরিচিতি উপমান, কেবল ভৌগোলিক উপস্থিতি নয়; নবকুমার (সত্যবতীর স্বামী) আর সত্যবতীর মানসিক বৈপরীত্যও আশাপূর্ণার মননে ধরা দিয়েছিল ঐ গ্রাম-শহরেরই প্রতিতুলনায়।"[৩] বস্তুত উপন্যাসটিতে আপাতদৃশ্যপটে ওই বিভাজন আছে বটে, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁর অন্তদর্শী জীবনভিজ্ঞতায় একথাও জানেন যে, "শহর দ্রুতছন্দে আবর্তিত হয়, গ্রাম ছায়াচ্ছন্ন উঠোনে পড়ে ঘুমায়। ...তা মনের গড়নেরও শহর মফস্বল আছে বৈকি। নইলে যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন উত্তাল হয় আর নবকুমার সে আবর্তন টেরও পায় না?" [প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃ. ৩৬৬][৪] সত্যবতীর মনের এই আলো ও গতিছন্দই তৎকালীন দ্বান্দ্বিক জটিলতাকীর্ণ সমাজ ও পারিবারিক জীবন সংঘর্ষে তাকে করে রেখেছে সদা সক্রিয় ও আপসহীন। এবং শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের মৃণালের মতো সংসার জীবন পরিত্যাগী।

সত্যবতী চরিত্রের তেজস্বিতা ও প্রতিবাদী স্বভাবটি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা রামকালীর কাছ থেকে প্রাপ্ত। রামকালী অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল ব্রাহ্মণের মেকি সংস্কার, গ্রহণ করেছিল কবিরাজি বৃত্তি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক সমাজ পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণে পেশারও বিবর্তন দেখান যা কর্মদক্ষতা, অর্থবিত্ত ও সম্মানেরও বৃদ্ধি ঘটায়। এই পৈতৃক চালচিত্রটি সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রথম সূত্র, নিছক মেয়েমানুষ নয়। সত্যবতী মানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছে, এটি চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে একধরনের মুক্ততা এনে দেয় যে কারণে সত্যবদী অনেক সময় পিতার কোন কোন সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করতে পেরেছে। যেমন, কাহিনীতে লক্ষ করা যায় রাসু নামের চরিত্রটির দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে সত্যবতী পিতার বিরুদ্বাচরণই করছে। আশাপূর্ণ দেবী স্বয়ং বলেছেন যে, তাঁর সত্যবতী 'প্রতিবাদের প্রতীক'। খুব সূক্ষভাবে নিরীক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

করলে অনুধাবন করা যায় যে, রচয়িতার আত্মজৈবনিকতা এখানে পরিস্ফুট। বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর ভাস্য থেকে আমরা জানি যে, নিজের জীবনের আশৈশবসঞ্চিত অনুচ্চারিত ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে তিনি সত্যবতীর মধ্যে মূর্ত করছেন।[৫]

সত্যবতীর মনে প্রথম জিজ্ঞাসা উদ্‌গত হয় বাল্যবয়সে সমবয়সী বালকসঙ্গীদের সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বন্দ্বে। বালক-বালিকার প্রভেদ যতটুকু শারীরিক গঠনের কারণে, তারও বেশি পারিবারিক অবস্থান ও মর্যাদাগত বৈষম্যনীতি এ কথাটি সত্যবতী শুরুতেই বুঝে নিয়েছিল। পরিবারে ছেলের উচ্চ মর্যাদা, যেমন তাকে ভাবিত করে, তেমনি স্বয়ং তীব্র প্রশ্ন উচ্চারণ করে সে নয় বছর বয়সেই-'মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ। মেয়ে মানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে।' [তদেব, পৃ. ২২] কিংবা পিতার সঙ্গে অনায়াসে তার তর্কিত অবস্থান গ্রহণ—"এত যদি না দরকারের কথা তো মেয়ে মানুষের জন্মবার বা দরকার কি, তাই বলতো বাবা শুনি একবার।' [তদেব, পৃ. ১০৯] অথবা, নেড়ু যখন পুরুষের দাবীতে অহংকার করে বলেছিল যে সংসারের ভাল কাজ ছেলেরা করবে আর খারাপ কাজগুলি মেয়েদের করা উচিত তখন সত্যবতীর এই বিধানকে ঐশ্বরিক বলে মনে হয়নি—"ওসব ব্যাটাছেলেরাই ছিষ্টি করেছে।" [তদেব, পৃ. ১০৮] অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রের উর্ধ্বতন অধস্তন ছকবদ্ধ নারী-পুরুষের বৈষম্যনীতিটি সত্যবতীর কাছে শৈশবেই ছিল স্পষ্ট। উনিশ শতকে একটি গ্রামের বালিকার কণ্ঠে এইসব বক্তব্যকে মনে হতে পারে লেখক কর্তৃক আরোপিত। কিন্তু সমাজে যখন এ-ধরনের সমানাধিকার সচেতন বালিকাদের অস্তিত্ব অসম্ভব ছিল না, অগোচরে ক্ষীণ পরিসরে অনেক সত্যবতীই ছিল অস্তিত্বশীল, আশাপূর্ণা দেবী সেই নিরুচ্চার-নিভৃত কণ্ঠগুলিকে মুখর করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত, রাসুসুন্দরী দেবীর [১৮০৯-১৮৯৭] 'আমার জীবন' [১৮৬৮] গ্রন্থেই আমরা তৎকালীন অবরুদ্ধ নারীদেরকে যে জীবনরূপটি প্রত্যক্ষ করি, তাতেও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে নারীর মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও সমাজনীতি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা।

সত্যবতীর শিক্ষালাভের তৃষ্ণা ছিল গভীর। সমবয়সী ছেলেদের পাঠশুনে নয় বছর বয়সে সে পড়তে শেষে। সঙ্গী বালক নেড়ুর লেখার উপকরণ নিয়ে তার অনুকরণ করতে করতে সে লিখতে শিখে যায়। উনিশ শতকের শুরুতে গ্রামে নারীর জন্যে শিক্ষাগ্রহণ করা ছিল রীতিমত অমঙ্গল। প্রথম *প্রতিশ্রুতি*-তে নেড়ু যখন সত্যবতীর দোয়াত-কালি ছোঁয়ার কথা সবাইকে বলে দেওয়ার ভয় দেখায় তখন সত্যবতীর নির্ভীক উত্তর -"কেন মেয়ে মানুষ তালপাতে হাত দিলে কি হয়? কলকেতায় তো কত মেয়ে লেখাপড়া করে।[তদেব, পৃ. ১০৩] স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠার মধ্যদিয়েই সত্যবতীরা সারস্বাত-জীবনাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ খুঁজে নিয়েছে। বাংলার নারী মুক্তির আরেক মহৎ প্রতিভা বেগম রোকেয়াও শৈশবে পাঠ নিতেন গোপনে। আশাপূর্ণ দেবীও এর ব্যতিক্রম নন, তাঁর স্মৃতিচারণ—

> "কবে পড়তে শিখেছিলাম, কবে পড়তে জানতাম না তা মনে পড়ে না। আমাদের ঠাকুরমার সংসারে মেয়েদেরও বর্ণপরিচয় করানোর মত আধুনিকতার পাট ছিল না। ওসব ছেলেদের জন্যে। ছেলেদের জন্যে ইস্কুল, ছেলেদের জন্যে মাস্টার।"[৬]

বস্তুত ঔপন্যাসিকের স্বতন্ত্র্য এখানেই যে, তিনি শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের বৈষম্যবাদকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেন।

চরিত্ররূপ গঠনের প্রশ্নে ঔপন্যাসিক সত্যবতীকে যেহেতু স্বনির্ভর ও আত্মসচেতন ব্যক্তি হিসাবে দাঁড় করাতে চান তাই স্বশিক্ষিত সত্যবতী সর্বদাই তর্ক করে, প্রতিবাদী হয় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় এবং কিছু যুক্তিও তৈরি করে। সত্যবতীর যুক্তিবোধ গ্রন্থপাঠ থেকে অর্জিত নয়, কিংবা নয় উনিশ শতকীয় রেঁনেসাস

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবান্বিত যুক্তিবাদী শিক্ষা প্রবাহের সংস্পর্শজাত। এটি তার চরিত্রের স্বাধীনতা, একটি দৃষ্টান্ত "মেয়ে মানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা স্বরসতীর হাতে থাকে না?" [প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃ. ১০৪] এই ন্যায় অন্যায় বিবেচনার শিক্ষা তার একান্তই নিজস্ব, নিজের ভেতরের সহজাত আলোই তাকে যুক্তিবাদী করেছে। আর সহজাত বোধগুলিকে তীব্র ও শক্তিশালী করেছ তার এই শিক্ষাগ্রহণ ও স্বনির্মিত ব্যক্তিত্ব।

পরবর্তী কলকাতা-জীবনে সত্যবতীর যে জীবনযন্ত্রণা ও তার বিরুদ্ধে লড়াই এবং নারীদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্ঠা লক্ষ করা যায় তা তাকে উনিশ শতকীয় নবজাগৃতির আলোকাভিসারীতে পরিণত করেছে। জীবনের নানা প্রান্তে তাকে শিক্ষাপ্রসারের জন্য লড়াইরত দেখা যায়। তার প্রথম ছিল নিকেজে শিক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীল সত্তাটিকেও পরিচর্যা করা। সাহিত্য স্রোতের যে মৌখিক ছড়া-ব্রতগাণ পার্বনগীতের ধারা হাজার-হাজার বছর ধরে নারীর সৃষ্টি ক্রিয়াকে সক্রিয়তা দিয়েছ তারও অংশীদার সত্যবতী-সেই নয় বছর বয়স থেকেই সে মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে সকলকে আনন্দ দান করত। সত্যবতী তার পিসতুতো দাদা জটার বউ পেটানোর নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়া বেঁধে গ্রামের ছেলেদের শিখিয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও প্রতিভার গুণেই সে একাজ করেছিল। যেমন—

"জটাদাদা পা গোদা
যেন ভোঁদা হাতী
বউ-ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারুক লাথি।" [প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃ. ২৮]

শুধু তাই নয় এটুকু বয়সেই সত্যবতী ত্রিপদী ছন্দে দেবীবন্দনা করেছে। সত্যবতীর মধ্যে ছিল সৃজনশীলতার প্রতিশ্রুতি সৃজনশীলতার শক্তিতেও সত্যবতী তার কাল ও সমাজ প্রতিবেশে স্বতন্ত্র। যেমন—

"এসো মা জননী দুর্গে ত্রিনয়নী
এসো এসো শিবজায়া,
সন্তানের ঘরে এসো দয়া করে
মহেশ্বরী মহামায়া!" [তদেব, পৃ. ১১৪-১১৫]

উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজে নারীশিক্ষার প্রচলন না থাকলেও অক্ষরজ্ঞানহীন নারী তার সহজাত প্রতিভাবলে ছেলেভুলানো গান, রূপকথার গল্প মুখে মুখে রচনা করে। এগুলোর সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। যেমন—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিবে কিসে।"

আবার,

ময়না, ময়না, ময়না
সতীন যেন হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে শিক্ষিতজনের মার্জিত ভাষার ব্যবহার না থাকলেও সাহিত্যিক রস উপস্থিত। এগুলোর পাঠে মনে এক ধরনের আনন্দের সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত তৎকালীন নারী সমাজ সহজাত প্রতিভার গুণে নানারূপ চারুশিল্প, যেমন-চিকন সূচীর কাজ, বস্ত্রে ফুল তোলা, মাটি ও সোনার নানারূপ খেলনা প্রভৃতি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তখনকার এক একটি কাঁথা বয়ন নিপুণতায় কাশ্মিরী জামিয়ারের চেয়ে সুন্দর ছিল। অনেকে আবার গীতাভিনয়েও পারদর্শী ছিলেন। তবে *প্রথম প্রতিশ্রুতি*'র সত্যবতীর মধ্যে বাল্যবয়সে যে সৃজন-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তার সেই সৃজনশক্তির সম্যক স্ফূর্তিলাভ করতে পারেনি যদিও পরবর্তীকালে সে কলকাতায় এসে স্বামী নবকুমারের শিক্ষক ভরতোষ মাস্টারের কাছে ইংরেজির পাঠ নিয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে চেয়েছে অন্য নারীদের শিক্ষিত করতে। শঙ্করীর বিধবাবিবাহজাত সন্তান সুহাসিনী (তখনও সমাজে অবৈধ সন্তানরূপেই গণ্য) ও নিজের সন্তান সুবর্ণলতাকে সত্যবতী উন্নত শিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা করে দেয়। এছাড়াও সে কলকাতায় দুপুরবেলায় সকলের অজান্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশেপাশের পাড়ার বয়স্ক মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করেছে। কন্যা সুবর্ণলতাকেও এই মন্ত্রই দিয়েছিল-''বিদ্যাই হচ্ছে আসল, বুঝলি? মেয়েমানুষের বিদ্যাসাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা।...তাই তাদের সবাই হেনস্থা করে।...আর যেসব মেয়ে মানুষরা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে, বিদূষী হয়েছে? কত গৌরব তাদের-কত মান্য। সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে।' [সুবর্ণলতা, পৃ. ১৫৬] সুবর্ণলতাকে ঘিরে সত্যবতীর এই শিক্ষামন্ত্র বাস্তবায়িত হয়নি বাল্যবিবাহের অভিশাপে। আর সেই আঘাতে সত্যবতী গৃহত্যাগ করে কাশীবাসী হয় এবং সেখানে গড়ে তোলে বালিকা বিদ্যালয়, সংসার ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তে ছেলেকে নির্দেশ দিয়ে যায়-ত্রিবেণীতে মায়ের নামে 'ভুবনেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করার। এ-বৃত্তান্ত উনিশ শতকের এক শিক্ষাব্রতী নারীর একক সংগ্রামের রূপালেখ্য, তার সারস্বত জীবন রচনার ধারাবাহিক প্রয়াস।

উপন্যাসের সূচনামুহূর্ত থেকে আমরা অবহিত হই যে, সত্যবতীর আট বছর বয়সেই গৌরীদান ঘটে গেছে। স্বভাবত সেই আট বছর বয়সের বিয়েতে সত্যবতীর কোন ভুমিকা ছিল না, কিন্তু তা নিয়ে সারাজীবন সে ছিল প্রশ্নকাতর- ''বাবা বাবা গো, দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্তর মেয়ে আমি তোমরা না দেখে-শুনে এমন ঘরেও দিয়েছিলে? এত তুমি বিচক্ষণ আর এই তোমার বিচার।'' [তদেব, পৃ. ১৮৩] কর্মোদ্যগী, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পিতাও যে গৌরদানের পুণ্য অর্জনের লোভ দমন করতে পারে না এবং নিজ কন্যাকেও বলিদান করে থাকে পিতা রামকালী প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সত্যবতীর এই প্রশ্ন এখানে অপত্য স্নেহের মধ্যে ক্রিয়াশীল পিতৃতন্ত্রের প্রবল প্রতাপকেই সামনে নিয়ে আসে।

তৎকালে বঙ্গীয় নারীর সর্বাধিক নিপীড়ন ঘটত বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে এবং দাম্পত্য জীবনক্ষেত্রে। বহুকাল ধরেই বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ পুরুষসমাজের অবিশ্বাস-এই মনস্তত্বটিও জড়িত ছিল-''অষ্টম বর্ষে গৌরীদান, নবম বর্ষে পৃথ্বীদান ও দশম বর্সে পবিত্রলোক প্রাপ্তি এত রকম পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে কে? বাল্যবিবাহের মূলে নারীর প্রতি একধরনের অবিশ্বাসও কাজ করে।''[৭] হিন্দুশাস্ত্রমতে, বার বৎসর বয়সাবধি কোন মেয়েকে পিতৃগৃহে অবস্থান বিধিসম্মত নয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে কন্যার পিতার নরকগামী হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে শাস্ত্রে। উনিশ শতকের প্রথিতযশা, নারীবাদী মনীষীরাও তৎকালীন সমাজবিধি অনুসারে বাল্যবিবাহ করেন, যেমন : রামমোহনের আট বছরের মেয়ে বিয়ে করেন, এমনকি বঙ্কিমেরও বিয়ের সময় পাত্রীর বয়স ছিল পাঁচ। আলোচ্য উপন্যাসে বিষয়দুটো

Dhaka University Institutional Repository

সত্যবতীর নিজের জীবনে যেমন ছিল, মর্মান্তিক সত্য, তেমনি অন্যান্য চরিত্রের ক্ষেত্রেও কমবেশি বিপর্যয়ের কার্যকারণ স্বরূপ। যে নবকুমার নামের পুরুষটির সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে হয় সে ভীরু, লাজুক, মুখচোরা প্রকৃতির, সত্যবতীর স্পষ্টতা, প্রতিবাদীচিত্ত ও সক্রিয় কর্মকাণ্ডের সমান্তরালে নবকুমার অসম ব্যক্তি। এখানেই দাম্পত্য জীবনের গভীর সংকট লুক্কায়িত। কলকাতাবাসী হয়েও নবকুমার বন্ধুবান্ধবদের পরচর্চার চশমায় পৃথিবীকে দেখে, নিজের চোখ তার তৈরি হয়নি। বিপরীতে, সত্যবতী ঘরে আবদ্ধ থেকেও গড়ে তোলে নিজস্ব চিন্তালোক, দৃষ্টিকোণ। অর্থাৎ উনিশ শতকীয় রেনেসাঁস ছুঁয়ে যায় সত্যবতীকে-নবকুমারকে নয়। সত্যবতীর মনেই 'যুগচক্রের' ছায়া পড়ে। বস্তুত নারীর এই অন্তরীণ চিত্তলোকের মধ্যেও পৃথিবীর পরিবর্তন জীবনের সংকট ও তা উত্তরণের সাহস অর্জনের ইতিহাসটি ঔপন্যাসিকের আধেয়। সে-অর্থে *প্রথম প্রতিশ্রুতি* নারীবাদী সাহিত্যধারার স্বতঃস্ফূর্ত নির্মাণ।

নবকুমার সত্যবতী ব্যবীত আরও তিনটি দম্পতির জীবনক্রম আছে উপন্যাসে, যার সব কয়টিই ভাঙনের মুখে পড়ে। শৈশবে দেখা নিত্যানন্দপুর গ্রামেও একটি দ্বিতীয় বিয়ের সংকট সত্যবতীকে সচেতন করে তুলেছিল, তার জাঠতুতো দাদা রাসুর দ্বিতীয় বিয়ের কারণে প্রথম স্ত্রী ষোড়শী সারদার মধ্যে যে যন্ত্রণা ও ব্যর্থতা এবং গোটা সংসার জীবনেই যে গভীর সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল সে-অভিজ্ঞতা সত্যবতীর প্রথম পাঠ। যথারীতি সে প্রতিবাদও করেছিল 'নিয্যস বাবার অন্যাই হয়েছে'-ওই দ্বিতীয় বিয়ে ঘটানোতে।

সত্যবতীর পালিতা কন্যা সুহাসিনীরও বিয়ে হয়ে যায় অনেকটা আকস্মিকভাবে বয়সে বড় ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে। শিক্ষক ভবতোষ কন্যাসম অল্পবয়সী সুহাসিনীকে বিয়ে করতে কুণ্ঠিত হননি। সত্যবতী আপাতভাবে সান্ত্বনা পেয়েছিল যে, শিক্ষকের কাছে আজীবন শিক্ষালাভের এটা হল গুরুদক্ষিণা। নির্জ্ঞান চেতনায় লুক্কায়িত সংস্কারবশত ভেবে নিয়েছিল শিবের সঙ্গে উমার বিয়ে পুরাণপ্রতিমাতুল্য ভবতোষ-সুহাসিনীর দাম্পত্য সম্পর্ক, কিন্তু আধুনিকতাবোধে এ প্রশ্নও জাগে যে, বয়সে বড় ভবতোষ কতটুকু শারীরিক তৃপ্তি দানে তথা দাম্পত্য মিলনের ক্ষেত্রে সার্থক করে তুলতে পারবে সুহাসিনীর জীবন্

উপন্যাসে তৃতীয় বিয়ের সমস্যাটি অতি মর্মান্তিক। এই বিয়ের বলি সত্যবতীর পরিণত বয়সের সন্তান-সুবর্ণলতা। এবং এর অভিঘাতে ভেঙেচুরে যায় নবকুমার-সত্যবতীর দাম্পত্য জীবন। শুধু দাম্পত্যজীবনই নয়-পরিবর্তিত হয়ে যায় সত্যবতী আর কন্যা সুবর্ণলতাও সম্পূর্ণ জীবন ও সম্পর্ক। প্রসঙ্গটি আলোচনার পূর্বে সত্যবতীর জীবন পরিক্রমায় গৃহজাত অবস্থানটির একটি রূপরেখা অংকন করা আবশ্যক।

বিবাহিত জীবনে সত্যবতী বালিকাবধূ এবং যথারীতি শ্বশুরবাড়িতে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিধিনিষেধ ও নির্যাতনের শিকার। শাশুড়ির বধূ নির্যাতনের সরল সত্য চিত্রই এ-উপন্যাসের শেষ কথা নয়, প্রতিপাদ্য বিয়স হল নির্যাতনকারী শাশুড়ি এলোকেশী সত্যবতীর দৃঢ়তা ও প্রতিবাদের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অচলায়তন ভাঙার প্রশ্নে সত্যবতী অবশ্য বধূসুলভ নম্রতা ও ঘোমটা পরিত্যাগ করেনি; সম্মান প্রদর্শনের ঘেরাটোপে থেকেও অনেকবারই শাশুড়ির অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। সবচেয়ে প্রবল প্রতিবাদ ছিল পরনারীতে আসক্ত-শ্বশুরের বিরুদ্ধে তার অবস্থান গ্রহণ শ্বশুরের 'রাত চরা' অভ্যাসকে সে ঘৃণা করেছে এমনকি 'চরিত্রহীন' শ্বশুরকে সে প্রণামও করেনি। সতেজে ঘোষণা করেছে-'এক হিসাবে উনি তো পতিত।' [তদেব, পৃ. ১৮৬] এই দৃঢ়তা ও সমুন্নত রুচিবোধ দিয়ে সে অর্জন করতে চেয়েছিল আত্মনির্ভরতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ববোধ-যা তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ-নারীদের জন্য অনুমোদন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে বহুবার সে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নিজের দায়িত্ব-দুঃখ স্বীকার করেই। শাশুড়ির নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য পিতা রামকালী তাকে ফিরিয়ে নিতে এলেও সে আত্মমর্যাদার প্রশ্নে পিতৃগৃহে ফিরে যায়নি—নিজের ভবিষ্যৎ নিজে তৈরি করে নিয়েছে, আত্মশক্তি দিয়েই মুখোমুখি হয়েছে অমার্জিত স্নেহহীন শাশুড়িরও, মুক্ত করতে চেয়েছে নিগৃহীত নিরাশ্রয়ী অন্য নারীদেরও জীবন।

এক্ষেত্রে তার প্রথম নির্মাণ শঙ্করীর সন্তান সুহাসিনী এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টা কন্যা সুবর্ণলতা। সুহাসিনীকে শিক্ষিত করে নিজের সিদ্ধান্তেই বিয়ে দিয়েছিল। পারিবারিক ক্ষেত্রে তাকে লড়াই করতে দেখা যায় স্বামী নবকুমারের অসুস্থতার সময় ঝুঁকি নিয়ে সাহেব ডাক্তার ডেকে আনার সিদ্ধান্তে। এ উদ্দেশ্যে সে ঘাটের পথে গলার হার খুলে দিয়েছিল স্বামীর বন্ধু নিতাইয়ের হাতে, তাতে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল মরণাপন্ন নবকুমার। ঘটনাটি যেমন সত্যবতীর দায়িত্ববোধের পরিচয়, তেমনি আধুনিক চেতনারও প্রকাশ। সে আরও লড়াই করেছিল নিতাইয়ের স্ত্রী ভাবিনীর নয় বছরের বোন পুঁটির অকালমৃত্যু নিয়ে। এ ক্ষেত্রে সত্যবতী কারো সমর্থন ও সহযোগিতা পায়নি। মেয়েদের জন্য একজন মেয়ের লড়াই কীভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় প্রিয়জনদের অসহযোগিতায় সেই চিত্র আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে সুস্পষ্ট বলেই তিনি একপাক্ষিক মতাদর্শের লেখক নন।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বাল্যবিবাহের যে অভিশাপ তার বিরুদ্ধে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে পাস হয়েছিল 'সহবাস সম্মতি আইন' [Age of Consent Bill]। প্রথম প্রতিশ্রুতি-তে পুঁটি ছিল এক 'প্যাকাটির মতো' নয় বছরের বালিকা যার স্বামী 'দোজপক্ষের বর' 'সাজোয়ান একটা তাগড়া বেটাছেলে, বৌ মরে যেয়ে খাই খাই অবস্থা।' পুঁটি স্বামীর শয্যায় যেতে অসম্মত হত বলে তাকে 'নোড়া দিয়ে ছেঁকে মেরে ফেলেছিল' স্বামী ও শাশুড়ি। এ মৃত্যুর কোন শাস্তি হয়নি। —"সকল খুনের শাস্তি আছে, বৌ খুনের তো আর শাস্ত নেই।" [*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ৩৭৯] বস্তুত, যে-প্রশ্নটি সত্যবতীকে আজীবন আন্দোলিত করেছে তা হল "পুরুষের পক্ষে 'বিবাহ' একটি ঘটনা মাত্র, অথচ নারীর পক্ষে চির অলঙ্ঘনীয় কেন?" বিবাহ-প্রশ্নটির এই ক্ষেত্রে এসে যায় সামাজিক পারিবারিক বন্ধনের বিষয়টিও। সত্যবতী পরবর্তী উপন্যাসে 'সুবর্ণলতা'য় আত্মজার কাছে লিখিত চিঠিতে এই সমস্যাকেই বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। এর নেপথ্যে আছে তার নিজ বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনযাপনের পরেও নবকুমার তার মনের কাছাকাছি আসতে পারেনি।

বস্তুত, বাংলা উপন্যাসে-কবিতায় নারী-পুরুষের মানসিক স্তরের মধ্যে যে বৈষম্য প্রতিচিত্রিত সেখানে পুরুষ-যোগ্য মনের নারীর অভাবে ব্যর্থ-এটাই দেখা যায়। নারীও যে সমমনা সঙ্গী পাচ্ছে না সে কথাটি খুব বেশি উচ্চারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথই *যোগাযোগ* উপন্যাসে সে কথাটি রূপায়িত করেন শ্রেণীসত্য ও রুচি-মতাদর্শের আলোকে। সত্যবতীর ট্রাজেডি এখানেই যে, তার স্বামী নবকুমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কন্যা সুবর্ণলতাকে বাল্যবিবাহ দিয়েছিল। তার দাম্পত্যজীবনে স্বামী নবকুমারের এই প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মর্মান্তিক ঘটনাটিই সত্যবতীর জীবনের সবচেয়ে বড় পরাজয়। নবকুমারের বিশ্বাসঘাতকতার সে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বেগম রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাসের সিদ্দিকা চরিত্রটিকে। সে জমিদারী ছেড়ে 'তারিণী ভবন'-এ দুঃস্থ নারীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। পুনরায় স্বামীর প্রেম বা আহ্বানেও সংসারে ফিরে যায়নি। তার বক্তব্য-"আমরা কি মাটির পুতুল যে পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে, 'সুযোগ' জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না, তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন

Dhaka University Institutional Repository

করিব, সেদিন আর নাই...। আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা-ঠাকুমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, "আর রাখ তোমার পণ আর তেজ-ঐ দেখনা এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নাব আবার স্বামী সেবাই জীবনের সার করিয়াছিলেন," আর পুরুষ সমাজ সগর্ধ্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চাশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হোক না কেন-ঘুরিয়া-ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবে। আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে। সংসার ধর্মই জীবনের সার ধর্ম নহে।"[৮] বিবাহবন্ধনের অচ্ছেদ্যতার অর্থ কতটুকু মান্য এবং কতখানি তা জীবনসত্য যে প্রশ্ন সত্যবতীরও। এক্ষেত্রে তার আঘাত মর্মঘাতি, কেননা সুবর্ণলতা তার স্বপ্নপূরণের অবলম্বন, একমাত্র কন্যা যাকে হতে হল বাল্যবিবাহের শিকার। দ্বিতীয়ত, স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা। অসুখের ঘোরে একদিন নবকুমারকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল সত্যবতী যে সে কখনও বাল্যবিবাহের অভিশাপে কন্যাকে গ্রস্ত করে না। সেদিন নবকুমার ভেবেছিল সত্যবতীর এই পাগলামির সঙ্গে ছলচাতুরিতে দোষ নেই তাই সে কথা দিয়েছিল, এইরকম পারস্পরিক ছলচাতুরির ভিতেই যে সংসার সে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এই সিদ্ধান্তে যে, "স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকেই।" [*সুবর্ণলতা*, পৃ. ২৮৩]। অর্থাৎ প্রথম প্রতিশ্রুতি শেষপর্যন্ত অধিকার পরিসর বৃদ্ধির আখ্যান।

উপন্যাস শুধু প্রধান চরিত্রজীবনীর উপর দাঁড়িয়ে থাকে না, তার সঙ্গে বিজড়িত থাকে অন্যান্য বহুজীবন। সেই সব পার্শ্ব প্রধান-অপ্রধান চরিত্রাবলীর বর্ণায়নে রচয়িতা যেমন মূল চরিত্রকে স্পষ্ট করেন, তেমনি সমকালীন দেশকাল-জীবনকেও রূপান্বিত করেন। এমন কয়েকটি নারীচরিত্রের নাম ভুবনেশ্বরী, এলোকেশী, মোক্ষদা, সৌদামিনী, সারদা ইত্যাদি। এরাই বিধৃত করে আছে অন্তঃপুরের সেই ইতিহাস সর্মকালে যা নারীর লেখনীতে তেমন লিপিবদ্ধ হয়নি। অন্তঃপুরের নারীজীবনের প্রথম আত্মজৈবনিক প্রকাশ লক্ষ করা যায় রাসসুন্দরী দেবীর [১৮০৯-১৮৯৭] 'আমার জীবন' [১৮৬৮] রচনায়। এই ব্যতিক্রমধর্মী রচনাটি নারীর ভাষণে ভাবনায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থাধীন পরিবারতন্ত্র, নারীদের পরাধীনতা মুক্তিবাসনা ও শিক্ষাহীনতা, অভ্যাসবদ্ধ গার্হস্থ্য ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে নারীর দাসত্ব ও ইত্যাদির স্বাক্ষ্য। উদ্বৃতি–"বার বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই হইতে আমি আমার পিত্রালয়ের অতুল স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাধীনা হইয়াছি। ...আমি পুস্তক সে একটু পড়িতে পারি, তাহাও পড়িবার সময় পাই না। বিশেষ কেহ দেখিয়া কি বলিবে, এই ভয় অতিশয় হয়। মনও কোন মতে বুঝে না, ভাবিয়াও উপায় দেখি না।...আমার ননদ তিনটি আছেন, তাঁহারা যদি আমাকে পুঁথি পড়িতে দেখেন, তবে আর রক্ষাও নাই। ...বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান শত্রু ছিল। সকল বিষয়েই আমার বড় বয় হইত, আমি ভয়েই মরিতাম।"[৯] অবরুদ্ধ নারীজীবন যতটা বহির্সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত, তারাও বেশি চালিত হত এই 'ভয়' থেকে। বলা বাহুল্য, 'ভয়টি' সহস্র বৎসর ব্যাপী সমাজবিধি ও পারিবারিক মতাদর্শ কর্তৃক সৃষ্ট যা নারীর দেহমজ্জায় ও নির্জ্ঞানলোকে দৃঢ়ভাবে শিকড়ায়িত।

প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে পার্শ্বচরিত্ররা বঞ্চনা ও জীবনবেদনার শিকার স্ব-স্ব জীবনের ঘেরাটোপে। সত্যবতীর মা ভুবনেশ্বরী একজন আপাত-সুখী গৃহিণী, কখনো প্রতিবাদমুখর নয় সত্যবতীর মতো। সে কারো জীবনের শান্তি নষ্ট করে না, জীবনভর সবাইকে ভয় ও ভালবেসে গেছে। আলোচ্য উপন্যাসের উজ্জ্বলতম পুরুষ চরিত্রটিকে স্বামী হিসেবে পেয়েও ভুবনেশ্বরীর জীবনে গভীর ফাঁকি ছিল। স্বামী রামকালনি যে অহংবোধ একদিকে 'মানুষকে মানুষের মর্যাদা' দেওয়ার শিক্ষাস্নাত সেই অহংবোধেরই নঞর্থক অন্তশ্চাপে ভুবনেশ্বরী অবজ্ঞার, করুণার-পাত্রীতে পরিণত হয়। স্বামীর প্রবল প্রতাপের কাছে তার নতজানু, সন্ত্রস্থ জীবনূপটি কোনক্রমেই সমমর্যদা সম্পন্ন ও উজ্জ্বল ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

বিপরীতক্রমে সত্যবতীর স্বামী নবকুমার তার মা এলোকেশীর প্রতাপে ভীত, শাশুড়ি রূপেও এই নারীটি নির্যাতনকারীর ভূমিকায় উপস্থাপিত। এমনকি নিজের স্বামী নীলাম্বর যে অসৎচরিত্র, পরনারীর প্রতি আসক্ত সে-ও এলোকেশীর দাপটে সন্ত্রস্ত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে আবিষ্কার করা সম্ভব স্বামীর লাম্পট্য ও নারী হিসেবে স্বীয় আত্মমর্যাদাশূন্যতা থেকেই উৎসৃষ্ট হয়েছে এই ধরনের প্রভুত্ববাদী আচরণ ও বিকৃত মুখরতা। তৎকালীন সমাজ স্বীকৃত পুরুষের বহুগামিতা ও রক্ষিতা পোষণের বিপরীত প্রতিক্রিয়াই দেখান আশাপূর্ণা দেবী এলোকেশীর মধ্যে। নারীর জীবনরূপে ও সংসারে অবস্থানের এই আপাত ক্রোধ প্রতাপ ও নির্যাতনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়ে আসলে তিনি এলোকেশীকে করে তোলেন করুণার পাত্রী। বিবাহবন্ধনের যে সামাজিক সম্পর্ক-যাকে হিন্দুধর্ম আত্মিক ও জন্মান্তরের সম্পর্কের অভিধা দিয়েছে তাতে স্ত্রীর ভূমিকা পুরুষতান্ত্রিক আর্থসমাজ ও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে হয়ে গেছে অতি নগন্য। আলোচ্য উপন্যাসে সত্যবতীর ননদ সৌদামিনী তেমনি একটি নগন্য স্ত্রীর ভূমিকায় চিত্রিত। খুব অল্পবয়সে সৌদামিনীকে তার স্বামী ত্যাগ করে খেয়ালবশে আরেকটি বিয়ে করে। যে বিয়েকে ঘিরে নারীর জীবন খুঁজে ফেরে সুখ, জীবনভোগের সাধ, কিছুটা হলেও বধূ-জননীর অধিকার তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সৌদামিনী। কিন্তু পৌঢ় বয়সে স্বামী মুকুন্দ মুখুয্যের একজন গৃহকর্মনিপুর্ণা ঘরণীর প্রয়োজন দেখা দিলে সৌদামিনী 'ভাঁটা পড়া বয়সে' স্বামীর আশ্রয়ে জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে পায়। বিনা দোষে খেয়ালবশত তাকে পরিত্যাগ করে শেষ বয়সের প্রয়োজনে পুনঃগ্রহণ-এই ঘটনাটি নারীর মূল্যহীন, তুচ্ছ অবস্থাকেই প্রতীকায়িত করে। এমনকিভাবে রাসুল স্ত্রী সারদাও বঞ্চিত হয়েছিল স্বামীসঙ্গ থেকে দ্বিতীয় বিয়ের কারণে। সারদার তবু একটি বছরের পুত্র সন্তান ছিল; কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী। সুক্ষদৃষ্টিতে এখানে নারী-জীবনের ভিন্ন একটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেন-ভরা যৌবনেই সারদাকে ভাবতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, "সারদা অনেক দিন স্বামীসঙ্গ পেয়েছে, সারদার ছেলের বয়স এখন বারো! ভাবা যায়, সারদার জীবনের ভোগপাত্রের দিকে হাত বাড়ানো শোভন নয়, স্বামীর অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে ভাঁড়ারের হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে বার করাই এখন তার উচিত?" [তদেব, পৃ. ২১৬]। অর্থাৎ ব্যক্তি সারদার কোন সত্তাই স্বীকৃত নয়। এ-সূত্রে লগ্নভ্রষ্টা পটলীকেও উল্লেখ করা যায় যাকে রামকালী চাটুয্যে বিপদ থেকে উদ্ধার করে সারদার স্বামী রাসুল সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। আপাত অর্থে ঘটনাটি পটলিকে লগ্ন ভ্রষ্টার বিপদ থেকে উদ্ধার বলে মনে হলেও আসলে তা পটলির পিতামহের সামাজিক সম্মান রক্ষার ব্যাপার মাত্র। পরিবার তন্ত্রে ও অভিভাবকগণ তাদরে সামাজিক সম্মান রক্ষার্থে যে-কোন নারীকেই গ্রহণ বা বর্জন করত।

বিধবা নারীদের কারো কারো মধ্যে সংসার ক্ষেত্রে আপাত দাপট লক্ষণীয়, এ-ও বঞ্চিত নারীদের মনস্তাত্ত্বিক বিক্রিয়ামাত্র। অপগত মুক্তি মোক্ষদার মধ্যেই সত্যবতী শৈশবকালেই প্রত্যক্ষ করেছিল এ সত্য যে-"অত দাপট তবে কোন ভিড়ের উপর খাড়া ছিল? নাকি কোথাও কোনও ভিত ছিল না বলেই ফোঁপরা দাপটটা অতবড় করে তুলে ধরতেন মোক্ষদা? জানতেন হাতটা একটু শিথিল হলেই মুহূর্তে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে ফাঁকা ইমারত?" [তদেব, পৃ. ২৫১]। "এই তো অন্তঃপুরিকাদের দাপটের ভেতরকার ছবি এলোকেশী বা মোক্ষদার ভয়-জাগানো ব্যক্তিত্ব, ভুবেনশ্বরী বা সারদার একান্নবর্তী বিপুল সংসারের কর্তৃত্ব -কিছুরই কি সত্যি কোনো মানে আছে? কীসের প্রত্যাশায় শুরু হয়েছিল এদের জীবন, কোন প্রাপ্তিতেই যা ফুরোল সেই জীবন? জীবনের খেলায় এরা কেউই হয়তো জেতেন নি, সত্যবতীও কি হেরেই বিদায় নিয়েছে? ভরা সংসার ফেলে রেখে খালি হাতেই তো ফিরে গেছে সত্যবতী পুরুষতন্ত্রের ফাঁদে হারিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে পরবর্তী প্রজন্মকে ঘিরে তার স্বপ্ন।"[১০] স্বামী নবকুমারের বিশ্বাসঘাতকতায় কন্যা সুবর্ণলতার বাল্যবিবাহের পরে সত্যবতীর গৃহত্যাগ, সংসার জীবন বর্জন কোন সন্ন্যাসবোধে সমাপ্ত নয়-সে বিবাহবন্ধনের অর্থ খুঁজতে খুঁজতেই শেষে এই সত্যে উপনীত হয়ে যে, "স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকেই।" [সুবর্ণলতা, পৃ. ২৮৩]

প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে রামকালী, নীলাম্বর, নবকুমার যুগপরম্পরায় যে সমাজ তৈরি করে রেখেছিল তার বিপরীত-এক নতুন পৃথিবী গড়ার আকাঙ্ক্ষাই ওই অধিকার অর্জনের সংকল্পে নিহিত। এ হচ্ছে অধিকারহীনতা, বঞ্চনা, অর্ধস্তন অবস্থা থেকে উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা-বিজড়িত। আমরা পার্শ্বনারী চরিত্রগুলির জীবনরূপ থেকে সত্যবতীকে দেখি যে, সে সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকার বিপরীত এক প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে চারপাশের নারীদের মধ্যে নিজের মধ্যেও। এই দেখার চোখ বিষয়টিই একটি স্বয়ং প্রতিপাদ্য-সমাজনির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকায় বিপরীত চিত্র। যে প্রখর বুদ্ধি, প্রগাঢ় বোধশক্তি তা ওই সমাজনির্দিষ্ট নারীবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের নির্দেশনা অনুসারে "পুরুষ চায় পরিবর্তন আর নারী চায় স্থায়িত্ব। এ উপন্যাসের বাহক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে 'যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন অধীর হয়, চঞ্চল হয়, আন্দোলিত হয় আর নবকুমার কেন সে আবর্তন টেরও পায় না? শুধু কি তাই? এ উপন্যাসের আখ্যানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয় সত্যবতী, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সত্যবতী, প্রতিকার চায় সত্যবতী-যা সবকিছু পুরুষেরই শোভা পায়, নারীর পক্ষে বেখাপ্পা, আর তার স্বামী নবকুমার ভয়ে ভয়ে সবকিছুই মেনে চলতে চায়, সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায় সত্যবতী সেখানে সাহসের প্রতিমূর্তি, নবকুমারের সেখানে ভীরুতার শেষে নেই। লিঙ্গ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে দেওয়া যে মূলত লিঙ্গ রাজনীতিরই কৌশল আশাপূর্ণা দেবী সেই সত্যটিকেই যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন।"[১১] অর্থাৎ সদর-অন্দর বিভাজনের সূত্রটি লঙ্ঘন করে ও উল্টে দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতীকে করেছেন একইসঙ্গে সদর ও অন্দর সচেতন, রীতিনীতি নিয়ে সত্যবতী সংগ্রাম করে গেছে সারাজীবন আজ তা আর নেই। কিন্তু মানব-মানবীর সম্পর্ক ও অবস্থান যেখানে ক্ষমতা সম্পর্কের দৃশ্য-অদৃশ্য সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ সেখানে সত্যবতীর এই ব্যক্তিগত 'অভিজ্ঞতার প্রকৃত স্বরেরও একটি রাজনৈতিক মাত্রা আছে। এই ব্যক্তিগত স্বরটিই ধরতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী, আর 'ব্যক্তিগত স্বরই তো কথা শিল্পের মানব-মানবীর জীবনরূপ প্রকাশের মূল শর্ত। সত্যবতীর স্বপ্ন ও জীবন সত্যে বিধৃত হয়ে আছে আমাদের 'পিতামহী-প্রপিতামহীদের যন্ত্রণার্ত দিনলিপি'।

তথ্যনির্দেশিকা

১. সত্যবতী গিরি, "সুবর্ণলতা : এক শৃঙ্খলিত নারীত্বের আখ্যান' (প্রবন্ধ), এবং মুশায়েরা', শারদীয় ১৪১০ সংখ্যা, পৃ. ৮৯

২. আশাপূর্ণা দেবী, ভূমিকাংশ, *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, ১৩৭১

৩. সুদক্ষিণা ঘোষ, *প্রথম প্রতিশ্রুতি : ভিতর মহলের ছবি, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস*, সম্পাদনা দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৭১

৪. আলোচনায় উদ্বৃতি ব্যবহৃত হয়েছে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা প্রকাশিত *প্রথম প্রতিশ্রুতি* গ্রন্থের ত্রয়োশ্চত্বারিংশয় মুদ্রণ ১৪০৮

৫. "যখন আমার খুব কম বয়েস তখন থেকেই দেখতাম পারিবারিক জীবনে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের কথাই বলছি-ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে মূল্যবোধের বড়বেশি তফাৎ। মেয়েরা যেন কিছুই নয় আর

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেরাই পরম মানিক, এই রকম ব্যাপার। এ আমাকে খুব বিদ্ধ করতো। কিন্তু আমাদের আমলে তো এমন সাহস ছিল না যে প্রতিবাদ করি, এমনকি গুরুজনের মুখের উপর একটি কথা বললেও তো ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে। তাই মনের মধ্যে রাগ দুঃখ জ্বালাটা জমত। আমার সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনীর নায়িকা রূপে দেখা যায়। এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ১৬

৬. তদেব, পৃ. ৩২

৭. আনিসুজ্জামান, *বাঙালি নারী সাহিত্য ও সমাজে*, সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃ. ৪৪

৮. *রোকেয়া রচনাবলী*, সম্পাদনা : আবদুল কাদির, নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৫৬

৯. রামসুন্দরী দেবী, *আমার কথা*, লিখিত হয় ১৯৬৮ সালে, মতান্তরে ১৮৭৬-এ, আলোচনায় ব্যবহৃত উদ্ধৃতির সূত্র আনিসুজ্জামান ও মালেকা বেগম সম্পাদিত, 'নারীর কথা' সংকলন-গ্রন্থ, মুদ্রক, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২০-২৬

১০. সুদক্ষিণা ঘোষ, তদেব, পৃ. ২৭৯-২৮০

১১. সুতপা ভট্টাচার্য, *মেয়েলি পাঠ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০০, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুবর্ণলতা : আত্মসংগ্রামের স্বরলিপি

নারীর 'মানবী' হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক সময়াবর্তের দ্বিতীয় আলোকবর্তিকা *সুবর্ণলতা* (১৯৬৬) উপন্যাসের সুবর্ণলতা চরিত্রটি। আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসের এই দ্বিতীয় পর্বটিতে আছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রাজনৈতিক মাত্রা, বিশেষত যৌনতার রাজনীতির কথা। এবং এই মাত্রাটি সমস্যাসংকুল ও দ্বান্দ্বিক হয়ে ওঠে সমকালীন দেশকালপটের চলমান রাজনীতি ও পরিবার সমাজকেন্দ্রিক নারীজীবনের অবস্থানগত বৈকল্যে। লেখকের নিজের কথায় : "আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনী, কিন্তু সেটুকুই এ গ্রন্থের শেষ কথা নয়। সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্য-বিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে-সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে, 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধনজর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক। ...আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। যে যোগসূত্র কাহিনীর প্রয়োজনে নয়, একটি ভাবকে পরবর্তীকালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে। ...সমাজবিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনীর মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।"[১]

আশাপূর্ণা দেবীর এই বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্তি-সুবর্ণলতার ইতিবৃত্তই আলোচ্য উপন্যাসের মূল কথা। *প্রথম প্রতিশ্রুতি* উপন্যাসের শেষ অংশে সত্যবতী তার কন্যাসন্তান সুবর্ণলতাকে শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নিজের অপূর্ণতাকে দূর করতে চেয়েছিল। তৎকালীন কলকাতার নগর-পরিবেশেও কন্যা-সন্তানের শিক্ষালাভকে নেতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখা হত—এ তথ্য আমরা পেয়ে যাই সত্যবতীর স্বামী নবকুমারের কাছ থেকেই। সমাজ-মানসের মর্মভেদী সমালোচনা উচ্চারিত হয় নবকুমারের কণ্ঠে—"বলি মেয়েকে বিদ্যেবতী করে হবেটা কি? তোমার ওপর আরো 'এককাঠি বাড়া' হবে, এই তো? গাঁয়ের পাঠশালে পড়েই যদি মায়ের এই মেজাজ হয়ে থাকে, কলকাতা শহরের ফ্যাসানি ইস্কুলে পড়ে মেয়ের কী হবে সে তো দিব্যচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি।"[২] নবকুমারের বিশ্বাসঘাতকতায় *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-র শেষ প্রান্তে নয় বছরের সদ্য-বিবাহিত সুবর্ণলতার শিক্ষাজীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সত্যবতীর সংসারত্যাগের মত কঠিন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া সুবর্ণলতাকে যে দৃঢ় আত্মসচেতন ও অধিকারসচেতন এক নারীতে পরিণত করে তাতেই ফলে ওঠে সত্যবতীর অপূর্ণ স্বপ্নবাসনা ও আত্মত্যাগের দূরসঞ্চারী তাৎপর্য। সত্যবতীর বিশ্বাস—"সুবর্ণ যদি মানুষ হবার মাল-মশলা নিয়ে জন্মে থাকে...হবে মানুষ। ...নিজের জোরেই হবে। তার মাকে বুঝবে।"[৩] এবং এই নিজের জোরে মানুষ হয়ে ওঠার আলেখ্যই *সুবর্ণলতা*। "আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতীর কন্যার নাম সুবর্ণলতা রেখেছেন হয়তো বা খুব সচেতনভাবেই। সত্যবতী নিজের জীবনের পরম সত্যকে আঁকড়ে রেখে বিপুল মানসিক শক্তিতে নিজেকে একা করে নেয়। আর সুবর্ণলতাকে ন' বছর বয়সেই বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরজীবী লতা করে তোলা হলেও সে তার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিত্বের অমলিন দীপ্তি আর কাঠিন্য নিয়ে সুবর্ণের ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়।"[৪] এই বক্তব্য সমার্থক হয়ে ওঠে Simone de Beauvoir রচিত *The Seeond Sex* গ্রন্থের পঞ্চম অংশে 'বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রথম বাক্যটির "MARRIAGE is the destiny traditionally offered to women by society"[৫] দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ১৯৩০-এ যুক্তিতর্কের আলোকে বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁর *Marriage and Morality* নামক গ্রন্থে, "...সত্য নর-নারীর পক্ষে বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব। তবে এর জন্য আগে কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে। উভয় পক্ষের লিঙ্গসাম্য মেনে চলার মতো মানসিকতা থাকতে হবে। উভয়ের অধিকার সমান, এই বোধ থাকা জরুরী। একের স্বাধীনতায় অপরে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। উভয়ের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গতা গড়ে তুলতে হবে। তা ছাড়া মূল্যবোধের মান সম্পর্কে উভয়ের রুচির অনুরূপতা থাকা জরুরী।...বিবাহ সম্ভাবনাপূর্ণ ও সার্থক হতে হলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে উপলব্ধি করতে হবে যে আইনের কেতাবগুলিতে যাই লেখা থাক না কেন, পারিবারিক জীবনে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করা খুবই জরুরী।"[৬] এই বিবাহ-প্রতিষ্ঠানে বন্দি সুবর্ণলতা বিশ শতকের প্রথমার্ধের নারী হওয়ায় স্বকীয় মনোগঠন অনুযায়ী নারীর ব্যক্তিসত্তা সংসার-বহির্ভূত মুক্ত নারীজীবনের জন্য ব্যাকুল এবং নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত।

প্রথম পর্যায়ে সুবর্ণলতা মুক্তির স্বপ্নকে লালন করতে চেয়েছে সংসারগণ্ডির মধ্যেই। শ্বশুরবাড়ির চারদেয়ালে ঘেরা রুদ্ধ জীবনে সে একটুখানি আকাশ দেখার বাসনাই পোষণ করত। তাই সে স্বামী প্রভাসের কাছে চায় নতুন একটা বারান্দা, যেখানে দাঁড়িয়ে সে অস্তিত্বের 'অজস্র অপমানের মধ্যেও বাইরের পৃথিবীর আস্বাদ পেতে পারে। কিন্তু এই সামান্য চাওয়াটুকু শুধু অপূর্ণই থাকেনি, স্বামীর মিথ্যা, হীন প্রতিশ্রুতি তার নিজের কাছেও নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে মূল্যহীন করে দেয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন বাড়িতে কোন বারান্দা রাখা হয়নি। সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন—In Snlvaralate this longing for the outside is expressed by the heroine's pathetic appeal for a balcony from which she could see the street. Needless to say, She is not only denied, but also rediculed."[৭]

'যেমন মা তেমনি ছা হবে"—এই প্রসঙ্গের তিক্ততার ভিত্তিভূমিতে তার সংসার-জীবনের সূত্রপাত। মায়ের গৃহত্যাগজনিত নিন্দায় সুবর্ণলতা প্রতিনিয়ত আহত, অপমানিত ও রক্তাক্ত হলেও স্বভাবগত কারণে এটাই তার প্রতিবাদের ও নিরন্তর সংগ্রামের উৎস। বস্তুত "নিজের ক্ষমতার উপর অনেকখানি আস্থা আর আশা ছিল...সুবর্ণলতার। তাই অনবরত প্রতিকূলতার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের শক্তি নিজের মধ্যেই ক্রমাগত উৎসারিত করে গেছে সুবর্ণ। তাই 'বাঙালি ঘরের বৌ তার আবার প্রতিজ্ঞা'—এই বাক্যের সত্যতা সত্ত্বেও সে স্বামীর প্রতি প্রতিশোধমূলক প্রতিজ্ঞা পোষণ করেও শেষপর্যন্ত কোন প্রতিশোধ-প্রতিজ্ঞাই রাখতে পারেনি। 'হক কথায় জিভ সামলাবো না।' এই ভাষাই সুবর্ণলতার আত্মচারিত্র্য ঘোষণার আয়ুধ, যদিও তা "মূলত তার ভাবনায় তার অন্তর্রুক্তিতেই প্রকাশিত। তাঁর অন্তর্রুক্তিতেই থাকে শরীর সম্পর্কের রাজনৈতিক মাত্রার কথা, যৌনতার রাজনীতির কথা।"[৮] যে পুরুষ প্রভুত্ব করে "সেই মানুষই যখন আবার বৌকে আদর করতে আসে, রাগে সর্বশরীর জ্বলে যায় না? আদর। আদর না হাতি।" [*সুবর্ণলতা*, সপ্তবিংশতি মুদ্রণ ১৪০৭, পৃ. ১৫] সুবর্ণলতা ব্যতিক্রমী নারী হিসাবেই বুঝতে পারে যৌনতার রাজনীতি যা অধিকাংশ নারীই পারে না। তাদের কথা ভেবে সুবর্ণলতার অন্তর্রুক্তি—"বোকা, বোকা, নিরেট বোকা এই জাতটা তাই টের পায় না, অহরহ তাকে নিয়ে কী ভাঙচুর চলছে। ...ভাবছে আহা আমি

Dhaka University Institutional Repository

কি মূল্যবান। আমায় পুজ্যি করছে, আমায় সাজাচ্ছে। আমার দেহটা যে ওর সোনা মজুতের সিন্দুক তা ভাবি না, আমার সাজসজ্জা যে ওর ঔশ্বর্যের বিজ্ঞাপন তা খেয়াল করি না, আমি গহনা কাপড়ে লুব্ধ হই; ভালোবাসার প্রকাশে মোহিত হই।" [*সুবর্ণলতা*, তদেব পৃ. ২৮৫] বস্তুত, আশাপূর্ণা দেবী আলোচ্য নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের দাম্পত্য-রাজনীতির যে দিকটি উত্থাপন করেন তা রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসে কুমুদিনীর মধ্যে আগেই আমরা লক্ষ করি। সুবর্ণলতাও কুমুদিনীর মতই প্রেমবর্জিত দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে বিদ্বিষ্ট। স্থূল কামলোলুপ স্বামীর ঐশ্বর্যের মধ্যে কুমুদিনীর জীবন ছিল অশুচিস্পৃষ্ট ও মর্যাদাহীন। ব্যক্তিত্ব সচেতন "কুমুদিনী তার চেতন লোকে স্তরবহুল; তার ব্যক্তিস্বরূপের প্রাণমূল যেমন নবজাগরণোত্তর মর্যাদাচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধে সঞ্চারিত, তেমনি তা সামন্তবোধে, সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে মূলীভূত। কুমুদিনীর সংঘাত কেবল অমার্জিত, অধিকারলোলুপ উদ্ধত মধুসূদনের সঙ্গে নয়, বস্তুত কুমুদিনীর সংঘর্ষ তার আবাল্যলালিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিজ্ঞতাচালিত নতুন উপলব্ধির।"[৯] যৌনতার এই রাজনীতি সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর যে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা আমরা পাই পরবর্তীকালে রচিত নারীবাদী বিশ্লেষক কেইট মিলেটের *Sexual politics* [১৯৭০] গ্রন্থে। শারীরবৃত্তির রাজনীতি তথা দুর্বল লিঙ্গের ওপর সবল লিঙ্গের আধিপত্য; ভোগ দখলের বিষয়টাই এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশেষভাবে বিবেচ্য। সুবর্ণলতা স্বীয় আত্মসচেতনতা ও জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে এই রাজনীতিকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। তবে শুধু যৌনতা নয়, স্বামীর সঙ্গে বিরাজমান অভিরুচি ও মনন-সংস্কৃতির বৈপরীত্যও সুবর্ণলতার নিয়তি। যে সংসার ও পরিজন সে পেল তা ছিল তৎকালীন কলকাতা নগরে বসবাসরত গ্রামীণ মফস্বলীয় রুচি ও সংস্কৃতিবিশিষ্ট পুরুষদের কূপমণ্ডুকতা ও অভব্য আচার-আচরণে ঠাসা। এই পরিবেশে সে চেয়েছে ভব্যতা, চেয়েছে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ির যোগ স্থাপন করতে, সে দেশের কথা ভাবতে চেয়েছে, পরাধীনতার অবসান চেয়েছে। এটি আসলে এক প্রতীকী চাওয়া। নারীর ব্যক্তিসত্তার মুক্তির প্রশ্নটি কিংবা দাম্পত্য অসাম্যের বিষয়টি যে বহির্বাস্তবের রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা সে গভীরভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। ফলে উপন্যাসে আমরা তার দু'টি প্রতিবাদী ভূমিকা লক্ষ করি।

প্রথম ভূমিকা গৃহপরিসরে প্রাত্যহিক জীবনযাপন পদ্ধতির ক্ষেত্রে। শ্বশুরবাড়ির বদ্ধ পরিবেশে নারীর পরিহাস-ঠাট্টা করার রীতি অস্বীকৃত, সেখানে সুবর্ণলতা অনায়াসে ঠাট্টা করতে পেরেছে তার স্বামী এবং দেবরের নামসাদৃশ্য প্রসঙ্গে। কিন্তু এই অনায়াসভঙ্গি তার শ্বশুরালয়ে অচেনা। সেখানে তুচ্ছ কথা নিয়ে 'তিলকে তাল করার রেওয়াজ।' অকারণ একটা কথা কাটাকাটি, 'অকারণ একটা চেঁচামেচি, অকারণ একটা জটিলতার সৃষ্টি করা'। সংসারে সুবর্ণলতা ভিন্ন তাৎপর্যে 'অকারণ অসন্তোষ' বয়ে বেড়ায়। সে অসন্তোষ হল সভ্যভব্য হয়ে-ওঠা ও চলমান পৃথিবীর আলোবাতাস থেকে বঞ্চিত না থাকা। তার মনকে টানে 'একটুকরো আকাশ', সুবর্ণলতা সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু যখন সে তার 'ঠাকুর জামাই'-এর মত বয়ঃজ্যেষ্ঠ-এর কাছে সমুদ্র দেখার মনস্কামনা প্রকাশ করে তখন তা চূড়ান্ত অপরাধ বলে গণ্য হয়। উপন্যাস জুড়ে আমরা এরকম সহজ সাধারণ ছোটখাটো চাওয়া-পাওয়ার অচরিতার্থতা নিয়েই সুবর্ণলতাকে বাঁচতে দেখি। ব্যতিক্রমী চিন্তাশীলতার কারণে সে সকলের সমালোচনার পাত্রীতে পরিণত হয়।

আঁতুড়ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে তার প্রবল প্রতিবাদ গৃহগত পরিসরে উচ্চারিত আরেকটি ভূমিকা। পিতৃগৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন সুবর্ণলতার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের নীতি অনুযায়ী প্রথম সন্তানের জন্মকালে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতে হয়েছে। আঁতুড়ঘরে ঢুকতে গিয়েই সে বলেছে—"এতসব ময়লা কাপড় বিছানা দিচ্ছেন? ও থেকে অসুখ করে না বুঝি?" "এইখানেই

Dhaka University Institutional Repository

আশাপূর্ণা দেবীর আধুনিকতা। বাইরের জগতে পুরুষের প্রতিবেশী হওয়া অথবা তথাকথিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার আগেও নিজেদের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর করে তোলার প্রগতিশীলতায় তার সুবর্ণলতা এক অসামান্য নায়িকা। বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূর নির্বিরোধ অবস্থানের বিরুদ্ধে তার এই প্রতিবাদ আধুনিকতার ভিন্ন দিশারী।"[১০] তারই উদ্যোগে বাড়িতে খবরের কাগজ এসেছে, মেয়েরা গায়ে সেমিজ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছে, আঁতুড়ঘরকে পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে, সর্বোপরি বাড়ির মেয়েদের ঘরেই পড়তে শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ তথ্য স্মরণযোগ্য যে, আশাপূর্ণা দেবী তৎকালীন সমাজে মুক্তিকামী নারীর আত্মোন্নয়নের যে ইতিবৃত্ত লেখেন তা যেমন একদিকে নারীদের প্রতিবাদ ও অধিকারবোধের বিষয়, তেমনি কিছু কিছু নারী আবার তথাকথিত উচ্চপদস্থ সরকারী স্বামীদের ধনগর্বিতা স্ত্রী, তাদের উন্মাসিকতা, ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রগতির বিপরীত দিকেরও প্রকাশক। এমনি একটি চরিত্র সুবর্ণলতার সেজ ননদ সুরাজের জীবন যাপনের বৈপরীত্য; সে প্রাচীনপন্থী বড় ভাই ও বৌদিদের অবজ্ঞা করে যা লেখক সমর্থন করে না।

শাশুড়ির সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহারের অভিযোগে একসময় সুবর্ণলতা বিতাড়িত হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসে, কিন্তু স্বামীগৃহে আশ্রয়চ্যুত কন্যাকে পিতা নবকুমার স্থান দিতে সাহস করে না। এই পরিস্থিতিতে তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় সুবর্ণলতা বলে "কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে অপমান করবে? কেন? কেন?" সম্মানহীন নিরালম্ব নারীদের অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে যেন সুবর্ণলতা একাই বহন করছে। "সুন্দরের ওপরই তো পৃথিবীর রাগ", তাই সুন্দর সুবর্ণর সুন্দর বিচারশক্তি ও অনুভূতিপ্রবণতা জগৎসংসারের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ক্রোধের সঞ্চার করে। বংশানুক্রমিক সাদৃশ্য সুবর্ণর রক্তকণিকায় একই ঝঙ্কারে ঝংকৃত। 'মানী মায়ের মানী মেয়ের' সেই আত্মসম্মানবোধের একই উত্তাপ, ...মেয়েদের আসল আশ্রয়ের সঠিক ঠিকানার সন্ধানে বারে বারে বিফল হয়ে সুবর্ণ সমস্ত অবরুদ্ধ নারী সমাজের নিরুদ্ধ প্রশ্নকে মুক্তি দেবার দুর্দমনীয় বাসনা...উন্মত্ত চেষ্টায় মাথা কুটে মরে।'...'আত্মঘাতী হবার যত রকম পদ্ধতি আছে, সবই একবার করে দেখে নিয়েছে মানুষটা। কিন্তু আশ্চর্য! শেষপর্যন্ত ত্রুটি থেকে গেছে সমস্ত পদ্ধতিতেই।' সুবর্ণলতার সমসাময়িক নারীকুল কেউই 'রাতদিন মরণের বাসনায় উদ্বেল হয়নি' অথচ সুবর্ণ তার জীবনের রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির সঙ্গে ময়াল সাপের ভয়াল করালগ্রাসের সাদৃশ্য খুঁজে যায় যেখানে 'অদৃশ্য নিষ্ঠুর পেষণে বাইরের চেহারাটা অবিকল রেখেও চূর্ণ করে ফেলে অধিকৃত শিকারের হাড়গোড়।"[১১]

সুবর্ণলতার উদারচেতনা বারংবার প্রতিহত হয়, নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয় তার পরিবেশ ভাঙার প্রতিটি ঘটনা। আর এই অসম্মানের পরিবেশেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুবর্ণলতা কয়েকবার সন্তানের জননী হয়। অভ্যাসের মলিন শয্যায় তার যে, দাম্পত্যমিলন তা নিয়েও সে প্রশ্নবিদ্ধ ও ক্লান্ত। স্বামীর আগ্রহ সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসা-"সে আগ্রহ কি প্রেমের?" 'সে শুধু অভ্যাসের নেশা।' আর তাই স্বামীর আহ্বান তার চেতনাকে বিদ্রোহী করে স্নায়ুদের পীড়িত করে; আত্মাকে জীর্ণ করে।' পরিবেশ ও দাম্পত্যজীবন-এই দুই সাংসারিক ক্ষেত্রে সে নিজেকে যেমন ক্ষয় করেছে তেমনি আত্মক্ষয়ের মধ্যেও জেগে থেকেছে তার আত্মার প্রহরী।

বিপরীত চরিত্র হিসাবে লেখক উপস্থাপন করেন তার স্বামী প্রবোধকে। সে হচ্ছে নবজাগ্রত কলকাতার আলোর বিপরীত অন্ধকারের প্রতিনিধি। "মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের গ্রামীণ জীবন থেকে প্রবোধের মতো পরিবারের পুনর্বাসন ঘটেছে নগর কলকাতায়। ব্রাহ্মণ্য বিধিশাসিত প্রথাগত আচার আচরণে অভ্যস্ত, গতানুগতিক সংস্কার ও বিশ্বাসে লালিত যে জীবনযাপনের ধারায় তারা দীর্ঘকাল অভ্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। "নাগরিক জীবনেও এরা তারই বৈশিষ্ট্য বহন করছে। তাই নবজাগরণের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার প্রবোধ আর প্রবোধের মতো আরও অনেকেই গ্রহণ করতে পারেনি। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে প্রথম থেকেই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি রাধাকান্ত দেব আর তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে শশধর চূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মতো স্বামীরা ছিলেন পরম্পরাসক্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজগোষ্ঠীর। এঁরা ইংরেজি ভাষা আর ইংরেজি প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করেননি। বরং উৎসাহই দেখিয়েছেন। কিন্তু রামমোহন-বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহকর্মীরা যে যুক্তিবাদ আর বিজ্ঞাননির্ভরতার উপর সমাজকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন পড়তে এঁরা তার বিরোধী। প্রবোধ এঁদের মতো মানুষদের চিন্তাভাবনাকেই বহন করছে। কাজেই প্রবোধ ও সুবর্ণলতার চৈতন্যের অসম বিকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি সূত্র পড়তে নারীই এখানে আলোকাভিসারী ও মুক্তমনা পুরুষ নয়।

সুবর্ণলতার দ্বিতীয় প্রতিবাদের ক্ষেত্র আত্মবিষ্কারের লক্ষ্যে তৎকালীন বহির্জাগতিক রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা। উপন্যাসের পটভূমিতে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল পাঠ যেমন আছে তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল এমনকি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও নানাভাবে উল্লিখিত। এমনকি উল্লেখ আছে চরম ও নরমপন্থী কংগ্রেসের প্রসঙ্গও। অন্তঃপুরে বদ্ধ পরিবেশে থাকলেও সুবর্ণলতা যেহেতু যুগপরিবেশ সম্পর্কে সচেতন তাই রান্নাঘরের ছাদে বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে হোম করেছে। আবার বাড়ির সবাইকে নিয়ে স্বদেশী মেলাও দেখতে যায়। স্বদেশমন্ত্রে ব্রতী দুঃসাহসী তরুণ অম্বিকার সংস্পর্শে এসেই তার এই রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। অথচ এই সংস্পর্শ সমাজে ঘৃণিত তথ্য হিসাবে পরিবেশিত হয়। অম্বিকার ঘরে সুবর্ণলতা কবিতাপাঠের তীব্র আকাঙ্ক্ষার জন্যই যেত। কবিতাপাঠের নান্দনিক উন্মাদনায় সুবর্ণলতা সমাজে ও সংসারের তুচ্ছ হিসাবনিকাশ বিস্মৃত হয়েছিল। সে আবিষ্কার করে কবিতায় শুধু দেশের পরাধীনতার কথাই নয়, তারই মত অগণিত বীর পরাধীন মেয়েদের কথাও উচ্চারিত হয়। সুবর্ণলতা কাব্যমন্ত্রে ঝংকৃত হয়, আলোড়িত হয়। তার মুক্তিকামী রুদ্ধ সত্তা পড়তে থাকে।

"নাড়া দিয়ে ভাঙ্ পুরোনো দেওয়াল
কতকাল রবে খাড়া?
শাসনরিক্ত ভ্রূকুটির তলে
মাথা তুলে আজ দাঁড়া।
বীরদাপে যারা করে অন্যায়
তারা যেন আজ ভাল জেনে যায়,
বিষবৃক্ষের উচ্ছেদ লাগি,
মাটিতেও জাগে সাড়া।"

কিন্তু উন্মাদনার মুহূর্তে সুবর্ণলতার 'চিরবাতিকগ্রস্থ স্বামী'র নাটকীয় উপস্থিতিতে পুরানো দেওয়াল অটুটই থেকে যায়। "বিষবৃক্ষের পাতাটি মাত্র খসলো না, মাটির সাড়া মাটির মধ্যেই স্থির হয়ে রইল।" সুবর্ণলতাকে 'নানাবিধ শাস্তি দিলেও সংসার চিরকালের মতো 'শায়েস্তা করে উঠতে পারল না আজ অবধি।' এখানেই সুবর্ণলতার নারীসত্তার বিজয়। শাস্তিকেও সে অনায়াসে অগ্রাহ্য করে। এখানে সত্যবতীর সংসার ত্যাগের সঙ্গে সুবর্ণলতার সংসারে থেকে যাওয়ার পরিস্থিতির পার্থক্য গভীরতর। সত্যবতী স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেয়ে সংসার ত্যাগ করেছিল তীব্র অভিমানে, স্বামীর মত অত্যাচারী ও অশ্লীল অভব্য ছিল না। তবুও সত্যবতী স্বামীকে পরিত্যাগ করেছিল তার চারিত্রিক সবলতার কারণে।

Dhaka University Institutional Repository

এই চারিত্রিক তেজ তার পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার। কিন্তু সুবর্ণলতার জন্য পিতার কোন পৌরুষদীপ্ত সাহস বা আশ্রয় ছিল না, সে একান্তই মায়ের সন্তান—যে মা দৃপ্ত তেজোময়ী। শুধুমাত্র আশ্রয়চ্যুতির ভয়ে, নিরালম্ব অস্তিত্বের কারণে সুবর্ণলতা বাধ্য হয় স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে। নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধানে তার যে সংগ্রাম তা বারবার আপোসের তিক্ততার পর্যবসিত হয়। এখানেই সত্যবতীর চেয়ে সুবর্ণলতার একধাপ পশ্চাৎগতি, কিন্তু আত্মোন্মচনের ধারায়। ব্যক্তিসত্তা অবিরত সংগ্রাম করার জীবনপটে সুবর্ণলতা সত্যবতীর চেয়ে অধিক দ্বন্দ্বপূর্ণ, যন্ত্রণাগ্রস্ত নারী।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে উপনীত হয়ে দেখা যায়—"অবশেষে দক্ষিণের বারান্দা হলো সুবর্ণলতার। রাস্তার ধারে', তার সঙ্গে 'সবুজ রেলিং ঘেরা, লাল পালিশ করা মেঝে, চওড়া বারান্দা। পূর্বে জানালা, দক্ষিণে দরজা। আর কি তবে চাইবার রইল সুবর্ণলতার? আর কি রইল অসন্তোষ করবার, অভিযোগ করবার? উত্তাল হবার? বিষণ্ন হবার?" কিন্তু এতে তার চাওয়ার পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি। কেননা তার মানবসত্তা যেসব প্রত্যয়গুলিকে পেতে চেয়েছে তা সাংসারিক প্রয়োজনে নয়, তা মানব অস্তিত্বের পূর্ণ স্বীকৃতির বিষয়সংশ্লিষ্ট। তাই আপাতদৃষ্টিতে ওইটুকু বারান্দার পরিসর সংসারে পেলেও তার সত্তাগত অতৃপ্তিই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে বিধৃত।

সমাজসংস্কারের ও জীবনপ্রবাহের ধারাবাহিক ক্রিয়ার হিসাবে সুবর্ণলতার জীবনেও সন্তান-সমস্যা প্রবল হয়ে দেখা যায় তার জননী সত্যবতীর মতই। জীবদ্দশাতেই সত্যবতীর নিজ সন্তানের কাছে সমালোচিত ও অপ্রিয় হওয়ার দুর্ভাগ্যপ্রাপ্তি ঘটেছিল। সুবর্ণলতার প্রথম সন্তান চাপাও অনায়াসে বলেছে—"আমার মা"-টির মতন এমন বেহায়া দুটি দেখিনি।' এমনকি তার পুত্রসন্তানও যখন বলে যে, মেয়েমানুষকে নিয়ে রাস্তায় যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—তখন তার কথার প্রতিটি অক্ষরে মুঠো মুঠো অবজ্ঞা ঝরে' পড়তে দেখেও সুবর্ণলতা হার মানেনি। এই প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাষা হয়ে তীব্র পরিতাপসূচক ও বেদনাদীর্ণ সন্তান "রক্তমাংসের ঋণটা অশোধ্য একথা স্বীকার না করে সবটাই অবজ্ঞা দিয়ে ওড়াবে; অথচ 'এই মেয়ে মানুষের দেহদুর্গে আশ্রয় নিতে হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, তাই অবজ্ঞা দিয়ে ঢাকা দিতে হবে সেই ঋণ। তখন আরও আক্রোশে মরিয়া হবে, অন্ধকারের অসহায়তার সাক্ষীকে দিনের আলোয় পায়ে ছেঁচবে, অবজ্ঞা করবে আর ধিকৃত হয়ে বলবে, 'মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ!' সুবর্ণলতা তার ছেলেকে পরিবেশমুক্ত করে নিয়ে এসেছিল, তাই তার ছেলের গায়ে পালিশ পড়েছে।" [*সুবর্ণলতা*, পৃ. ২২৩] এখানে অহংকারপ্রথা ও বিকৃত পৌরুষের প্রকাশই চিহ্নিত, তেমনি যারা বিকৃতরুচি ও মনোভাবের শিকার কিংবা ধারকপোষক তাদেরও উন্মোচন করেন। তারা নারী বা পুরুষ—যাই হোক না কেন, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে লেখক উন্মোচন করেন মানুষের ব্যর্থ প্রয়াসকেও। সুবর্ণলতা সন্তানকে উন্নত রুচি ও সুস্থ মানবতা দিতে চাইলেও সে গভীর বেদনায় নিয়তিরূপে প্রত্যক্ষ করে যে, "দরজিপাড়ার সে গলিটা এসে বাসা বেঁধেছে তার" হালকা ছিমছাম ছবির মত গোলাপী রঙা বাড়িটার মধ্যে। এই সত্য প্রকটিত হয় যে, "সন্তান রক্তমাংস দিয়ে গড়া প্রাণপুত্তলি হলেই তারা সত্যিকার অর্থে আত্মজ হয় না। তবু সে পারুল ও বকুল এই দুই কন্যাকে নিয়ে স্বপ্নের জগৎ গড়তে চেয়েছে। তার ফলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পারুল এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী বকুলকে আমরা প্রত্যক্ষ করি ত্রয়ী উপন্যাসের শেষ পর্বে-'বকুলকথা'য়।

সুবর্ণলতা উপন্যাসটিতে বিধৃত নারীর জীবনরূপের যে কেন্দ্রীয় পরিসরে সুবর্ণলতার অবস্থান তার সবটুকু জুড়েই রয়েছে তার সংগ্রাম ও আত্মোন্মোচনের আর্তনাদ। সমাজ ও পরিবারের প্রতিকূল

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে নিজে নোংরা আর কুশ্রী হয়ে গেছে, ভব্যতা সভ্যতা শালীনতা সৌন্দর্য বজায় রাখবার লড়াইয়ে সে নিজের চরিত্রের সমস্ত সৌন্দর্য শালীনতা জবাই দিয়ে বসে আছে। সে খবর আর নিজেই টের পায় না সে। [*সুবর্ণলতা*, পৃ. ২৩২] এই লড়াই মানুষকে যেমন উত্তরণের শক্তি দেয়, তেমনি তাকে করে তোলে অসুন্দরও। এবং তা-ই হয়ে দাঁড়ায় নারীর ট্রাজেডি, তাই উপন্যাসে লক্ষ করি যে, সুবর্ণলতার দুর্ভাগ্য তার সন্তানেরা মায়ের এই অপরিচ্ছন্ন অসুন্দর মূর্তিটাই প্রত্যক্ষ করে। তাদের বেড়ে ওঠার পর্যায়ে অহরহ মা-বাবার দাম্পত্য কলহ-যুদ্ধ ও সন্ধির অজস্র কলঙ্কিত অধ্যায় তাদেরও মনে বিরাগ উৎপন্ন করে। "তারা জানে সুবর্ণলতার স্বপ্ন সাধনার বস্তু নয়, যুদ্ধের হাতিয়ার মাত্র। এই অদ্ভুত যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে যত বেশি ধাক্কা খাচ্ছে তারা, ততবেশি বিতৃষ্ণ হচ্ছে, ততবেশি আঘাত হানছে, অতএব তারা মাকে ঘৃণা করছে। মা-র দিকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।" [*সুবর্ণলতা*, পৃ. ২৩৩] কাজেই পরিবার ও সন্তান উভয় পরিসরে সুবর্ণলতার সম্মানহীনতাই এ উপন্যাসের নির্মম দিক। পরিণত যৌবনা সুবর্ণলতার অসম্মান যে কত তীব্র ছিল তার বহু দৃষ্টান্ত উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। যেমন স্বদেশী করার জন্য জেলে যাওয়া অম্বিকা ছাড়া পেয়ে সুবর্ণলতার সঙ্গে দেখা করতে এলে তার স্বামী-সন্তানরা অম্বিকাকে তাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় উন্মোচিত হয়ে পড়ে সুবর্ণলতার তথাকথিত গৃহিণীত্বের অন্তঃসারশূন্যতা। নাট্যকার ইবসেনের *A Doll's House*-এর নোরা নিজের পারিবারিক জীবনের অবস্থানের এই ফাঁকি বোঝার পরই পুতুলখেলার সংসার তাগ করে পথে বেরিয়েছিল। কিন্তু সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতাকে বঙ্গীয় পারিবারিক জীবন কোনরকম মুক্তিই দেয়নি। এরপরও সে তার মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে এবং লিখতে চেয়েছে স্মৃতিকথা, যেমনটি আমরা পাই রামসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী *আমার কথায়* [১৮]।

কিন্তু আত্মকথা লিখতে গিয়েও সুবর্ণলতা পরিবারের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে। আত্মকথার প্রথম পাতায় ভুল ছাপার নমুনা স্বামীপুত্রের হাসির খোরাক জোগালে সে নিজেই নির্মমভাবে ধ্বংস করে দেয় তার আজীবনের সঞ্চয়, চিরকালের গোপন ভালবাসার ধন। রবীন্দ্রনাথের *খাতা* গল্পেও লক্ষ করা যায় অনুরূপভাবে এক বালিকার আত্মপ্রকাশের বাসনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাতে চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন হিন্দুসমাজ নারী আর শূদ্রকে শিক্ষার অধিকার দেয়নি। অধিকার অর্জনের সচেতন সংগ্রাম শেখায় শিক্ষাই, যা নারীরা কিছুটা মাত্র পেয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। *প্রথম প্রতিশ্রুতি*তে সত্যবতী যেভাবে শিক্ষার বৈষম্য নিয়ে প্রখরভাবে সচেতন ছিল এবং স্বকীয় কাব্যপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে বিকশিত করতে পারেনি, তারই পরম্পরায় সুবর্ণলতা আত্মকথা জাতীয় রচনায় নিয়োজিত হতে চেয়েছিল আত্মপ্রকাশের স্বরলিপি রচনা করতে। তাই যে রচনা সে অভিমানাহত হয়ে নিজেকে উন্মীলিত করতে চেয়েছিল। তাই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে কীভাবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সে তার পঠনপাঠনকে অক্ষুণ্ন রেখেছে। তার মা সত্যবতী এক বালিকাবধূর হত্যার প্রতিবাদ করে লক্ষ লক্ষ বালিকাবধূকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। আর সে তার বদ্ধজীবনের মধ্যেও সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে নিজে মুক্তি পেতে চেয়েছে। চারপাশের সহবন্দিনীদেরও তার ভাগ দিতে চেয়েছে। সুবর্ণলতা এই সূত্রে শিল্পী আশাপূর্ণা দেবীরই আত্মপ্রক্ষেপের একটি দিক। যিনি সুবর্ণলতার জবানিতে বলেন, "জগতে এমন হৃদয়বান মহৎ পুরুষও আছেন, যিনি নিরুপায় মেয়েমানুষের এই যন্ত্রণা অনুভব করেন, তাকে ব্যক্ত করার ভাষা জোগান।" [*সুবর্ণলতা*, ৩২৩] মধ্যযুগের সাহিত্যেও প্রত্যক্ষ করা যায় পুরুষলেখকগণ নারীচরিত্রের জবানিতে মেয়েদের সামাজিক-পারিবারিক অবস্থানগত বৈপরীত্য ও যন্ত্রণাকে প্রতিকায়িত করেছেন। উনিশ-বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথের গল্পে-উপন্যাসে আমরা দেখি ওই জবানিতে অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও বেদনাচঞ্চল।

Dhaka University Institutional Repository

আশাপূর্ণা দেবীর লেখকসত্তা নারীর এই জবানি তৈরিতে যে ধারাবাহিক নারীজীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন তার মূলস্বরটাই নারীর আত্মমুক্তি ও সত্তা গঠনের সংগ্রামী চেতনায় নির্মিত। সত্যবতী বা সুবর্ণলতার ব্যক্তিজীবন সেই সংগ্রামে হয়তো ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু চেতনাটি ছিল পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চরণশীল। উপন্যাসটির শেষে সুবর্ণলতা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, রচয়িতা তার অতৃপ্ত অপমানিত জীবনকে যে সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছেন তা একটি দৈহিক অস্তিত্বের অবলুপ্তি। কিন্তু চেতনার অনিবার্য দীপ্তিতে ভাস্বর। বস্তুত সুবর্ণলতার আত্মকীয়তা ও জীবনদর্শন এতই প্রাজ্ঞ ও প্রাণবন্ত যে, সন্তান-স্বামী পারিবারিক অন্যান্য স্বজনের সঙ্গে চেতনাগত বৈপরীত্য থাকলেও সে থাকতে চেয়েছে দীপ্তিময়ী। তার নিজস্ব চেতনার রঙে, 'পান্নাকে' সুবজ আর 'চুনিকে' 'রাঙা' করে তোলার অনুপ্রেরণা স্বতোৎসারিত। "ক্ষুদ্র দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞানে সুবর্ণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অনুভব করে আত্মআবিষ্কারের রোমাঞ্চ; যেখানে সুবর্ণলতা একক যেখানে তার উপর কোন ওপরওয়ালা নেই। যেখানে থাকবে সুবর্ণলতার অস্তিত্বের সম্মান। যেখানে সে বিধাতা। সুবর্ণ এতদিন 'হলুদ পাঁচফোড়নের সংসারখানা ঘিরে যে তুচ্ছ সংসারের বিরূপতা আর প্রসন্নতার মধ্যে নিজেদের মূল্য খুঁজে এসেছে' তা আজ নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়। সুবর্ণর নিজের মুঠোর মধ্যে যে 'রাজার ঐশ্বর্য' ও 'অনাস্বাদিত সুখস্বাদ' সুপ্ত হয়ে আছে তার উপলব্ধির জাগরণেই উন্মুক্ত হয় অনির্বচনীয় মাধুর্যলোকের সিংহদুয়ার।"[১২]

তাই আত্মজীবনী রচনার মধ্য দিয়ে তার যে আত্মদর্শনের আস্বাদ ও এধরনের নান্দনিক আনন্দের জগতে উত্তরণ তাতে অদৃশ্য হয়ে যায় অতৃপ্তির যন্ত্রণাবিদ্ধ ইতিহাস। অপমান ও অভিমানের পুঞ্জীভূত মেঘ বিগলিত হয়ে আত্মপ্রকাশের অঝোর বর্ষণে পরিণত হয়। এখানে নারীসত্তার, তার সৃষ্টিশীলতার প্রকৃত স্বাধীনতার পরিচয়টি রচিত হল।

কিন্তু অভিজ্ঞতার বাস্তবতা ঐ পরিসরকে প্রতিমুহূর্তেই করে তোলে সংকুচিত। স্বামী ও সন্তানের বিরুদ্ধতা, অশ্রদ্ধা তাকে সৃষ্টিশীলতা থেকে নানাভাবে বঞ্চিত করে। তাই সুবর্ণলতার স্মৃতিকথায় স্থানে কালে ধারাবাহিকতা না থাকলেও অতীতে আর বর্তমানে মেলবন্ধন ঘটে, সত্যবতী আর সে আত্মমুক্তির একই পথিক হয়ে ওঠে।

সুবর্ণলতা নিজেকে বারংবার উজ্জীবিত রাখতে চেয়েছে নানা উপায়ে। আত্মরচনার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সে দ্বিতীয়বার বাঁচতে চেয়েছে ভ্রমণের আনন্দের মধ্যে। এ রকমই একটি ভ্রমণ কেদারবদরীর তীর্থযাত্রায়। 'চির অজানা পৃথিবীর মুখোমুখি' হওয়ার, 'চিরকালের স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ' পাওয়ার আনন্দে অশ্রুসজল চোখে সে নিজেকে দেখতে পায় অনন্ত আকাশের নিচে, বিরাট মহানের সম্মুখে, অফুরন্ত প্রকৃতির কোলে। এরকম আনন্দিত মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্ত্রীরপত্র' গল্পের শেষে মৃণালকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত বিশ্বলোকের পরিসরে এসে দাঁড়ানোর প্রয়াসই নারীর জন্য আনন্দিত চিত্তলোকে প্রবেশের যথাযথ তোরণদ্বার, এই পরিসর থেকেই নারী বঞ্চিত ও বিতাড়িত। ঠিক যেমনটি লক্ষ করা যায় সুবর্ণলতার জীবনে। স্বামীর কলেরা হবার খবর তার এই "মুক্ত পরিবেশটার ওপর যেন বজ্রঘাত' হানে। তাকে ঘরে ফিরে আসতে হয় স্বামীর অভিসন্ধির কাছে। স্বামী প্রবোধ তার তীর্থযাত্রায় বাধা দিতে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়েছিল তা বুঝতে পেরে সুবর্ণলতা সোচ্চার প্রতিবাদ করে।

এ উপন্যাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হল সুবর্ণলতার মৃত্যুদৃশ্য। এখানে বাঙালি যৌথপরিবারের মহিলাদের মানসিক সংকীর্ণতা যেমন নগ্নভাবে প্রকাশিত, তেমনি আত্মচেতন নারীর সামান্যতম গোপন আশঙ্কার প্রতি যে তীব্র বিদ্রূপবান নিক্ষিপ্ত হয়—যা প্রমাণ করে যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম পাওয়ার যোগ্যতা

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও নারীরা কখনোই তা পায় না। সুবর্ণলতা তার জীবনচেতনার প্রতীক 'দক্ষিণের বারান্দায় মরবার পণ' পূরণের অনুরোধ করে পুত্র সুবলকে। অথচ এই সুবলই তার অসুস্থ মাকে 'অনভ্যাসের বশে স্পর্শ করতে পারে না। পুত্রকে কাছে টানার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অধীর সুবর্ণলতার যে আকুলতা প্রতিধ্বনিত তা অতি করুণ ও বিপন্ন এক মাতৃসত্তারই বেদনালিপি।

আমরা সর্বাধিক আলোড়িত হই সুবর্ণলতার জীবনসায়াহ্নে অন্তিমশয্যায় উন্মোচিত আত্মোপলব্ধির প্রকাশে। 'জগৎটা থিয়েটার' হলেও সে তাতে অভিনয়ের কুশীলবে পর্যবসিত হয়নি। সংসার বারংবার তার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছে। এমনকি মৃত্যুশয্যায়ও সে পরিবার কর্তৃক কবিরাজী চিকিৎসার প্রদর্শিত সৌজন্যকে অস্বীকার করে। যে কারণে তার পুত্র পর্যন্ত সুবর্ণলতাকে ধিক্কার দেয়—"সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালাটাই এখন প্রধান কাজ।" কেউ তার অন্তরাত্মার গভীর আর্তি শোনেনি, তার আত্মমর্যাদাবোধের প্রখর তেজোদৃপ্ততাকে বুঝতে চায়নি।

লক্ষণীয় যে, জীবনের অন্তিমপ্রান্তে উপনীত সুবর্ণলতা ভালবাসার প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। 'হয়তো সমস্ত পৃথিবীকে ক্ষমা করে যাবে সংকল্প করেছে বলেই ভালবাসা শব্দটাকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। কিন্তু এ ভালবাসা মানবিক সম্পর্কের শুদ্ধ প্রীতি, তাই তাকে যে ভালবাসে সেই 'মেজ ঠাকুরঝি' সুবালাকে দেখার অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করে সে। সুবালা চরিত্রটি এ-উপন্যাসে আরেক প্রত্যয়ী নারী। সে তার বিবাহযোগ্য কন্যাদের 'গলায় পাথর বেধে পুকুরে ফেলে' দেবার মতো প্রথাগত মনোবাসনা পোষণ করে না। আবার ধর্মবাধা উপেক্ষা করে অকুলীন পরিবারে কন্যাদের পাত্রস্থ করে সমাজে একঘরে করে দেবার সিদ্ধান্তকেও অস্বীকারের দৃঢ়তা দেখায়। সে-ই সুবর্ণলতার প্রকৃত মূল্যায়নে সক্ষম হয়।

সুবর্ণলতাকে আরও নিখুঁতভাবে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায় জয়াবতীর মানসদর্পণেও। একখানা খাটের অভাব সারাজীবনে সুবর্ণলতার একফালি নিজস্ব জগতের অভাবকে অপূর্ণ করে রেখেছিল। জয়াবতী তার এই মনস্কামনার কথা জানত বলেই সে সুবর্ণলতার মরণোত্তর প্রতিচ্ছবি হয়ে প্রাণসম্পদে সঞ্চিত চিরভিখারিণী সুবর্ণকে রাজরাজেশ্বরীর মর্যাদা দানে বদ্ধপরিকর হয়েছে। আমরা সুবর্ণলতার জীবনদর্শন ও রূপায়ণে দুটি সূত্র সন্ধান করে নিতে পারি। প্রথমটি হল সুবর্ণলতার স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় নারীর উচ্চারণের ভাষা ও অন্তর্কণ্ঠ বিলুপ্তির বাস্তবতা। সুবর্ণলতার সন্তান বকুল তাই প্রতিজ্ঞা করেছে, "মা মাগো, তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না লেখা সব আমি খুঁজে বার করব', সব কথা আমি নতুন করে লিখবো, দিনের আলোয় পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।"[১৩] ...এই ইতিহাসই পরবর্তী *বকুলকথা* উপন্যাসে প্রলম্বিত হয়েছে আরও বোবা যন্ত্রণা তা থেকে উত্তরণ ও প্রকাশের দ্বৈতাদ্বৈতে। সত্যবতী ও বকুলের মধ্যবর্তী সেতু সুবর্ণলতা—যে পরিবারের অনুরোধে আটকে যাওয়া 'আলোর প্রত্যাশায় যন্ত্রণার্ত ব্যাকুল নারীসত্তা।' প্রগতির ইতিহাসের ফাঁক আর ফাঁকিকেই লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর এই *সুবর্ণলতা উপন্যাসে*।

দ্বিতীয়ত, উপন্যাসটি অন্তঃপুরের ইতিহাস হলেও সেখানে বাইরের পৃথিবীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছে। তৎকালীন রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও লড়াই, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে যে উত্তাল দেশের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত, তাতে সুবর্ণলতা স্বদেশানুরাগী হয়েও তাৎক্ষণিক উন্মাদনায় মেতে ওঠেনি। অর্থাৎ রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও সুবর্ণলতা সচেতন, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অধিকারী, এখানে রবীন্দ্রমতাদর্শের প্রতিচ্ছায়াই খুঁজে পাওয়া যায়। এই পরিণত বুদ্ধির রাজনীতি-চেতনা আসলে আশাপূর্ণা দেবীরই চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি। সচেতন নারী কীভাবে অন্তঃপুরে থেকেও বাইরের পৃথিবীকে মূল্যায়ন করে

Dhaka University Institutional Repository

এই উপন্যাস তারই দৃষ্টান্ত। ফলে এটি এক অর্থে আশাপূর্ণা দেবীর আত্মজৈবনিকতারই প্রকাশ। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নিয়ে তিনি যে পরিবারে বড় হয়ে উঠেছেন, সেই যৌথপরিবারের প্রতিচ্ছবিই এখানে অঙ্কিত। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি ছিলেন শ্বশুর-শাশুড়িসহ ভবানিপুর অঞ্চলে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় তার কনিষ্ঠ পৌত্রী শতদীপার। আর সে বছরই প্রকাশিত হয়েছিল *সুবর্ণলতা* উপন্যাস।

সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সুবর্ণলতার সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে আশাপূর্ণা তাঁর প্রথম জীবনের একান্নবর্তী পরিবারে বসবাসরত নিজের জননীর সাহিত্যপ্রেমকেই রূপায়িত করেছেন। পিতা হন্দ্রেনাথ দত্ত জীবিকায় শিল্পী হলেও তাঁর ছিল তাসখেলা, পাশাখেলা ইত্যাদির নেশা, যা সুবর্ণলতার স্বামী প্রবোধের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত। নিজস্ব জীবনের নানা প্রক্ষেপ নিয়েই আশাপূর্ণা রচনা করেছেন *সুবর্ণলতা*। লেখকসুলভ আত্মআবিষ্কার ও আত্মোন্মোচনের যে ভূমিকায় সুবর্ণলতা চরিত্রটির অবস্থান তা অনেকাংশে আশাপূর্ণা দেবীরই ব্যক্তিসত্তা, সমাজসত্তা ও লেখকসত্তার সমন্বিত প্রকাশ। এই প্রকাশে তাই বিম্বিত হয়েছে সমাজে পুরুষ ও নারীর নির্ধারিত অসম অবস্থান। পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক হীনতা ও অভিরুচি, অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার বিপরীতে নারীর প্রতিবাদ, সাহস ও প্রতিবাদের দৃঢ়তা সমাজকাঠামো ব্যাখ্যার তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ। তাই উপন্যাসটি শেষ হয় মহাসমারোহে সুবর্ণলতার শেষকৃত্য সমাপনের মধ্য দিয়ে। এ যেন ব্যর্থ নারীজীবনের প্রতি সমাজের আরও বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ, আবার আরেক অর্থে মৃত্যুর মুহূর্তে সুবর্ণলতার অধরকোণে ব্যঙ্গের যে তীক্ষ্ণ হাসি আমরা দেখি তা ঐ বিদ্রূপকে অবহেলা করার দৃঢ়তা। তাই আশাপূর্ণা দেবীও তাঁর লেখনীবাণ নিক্ষেপ করেন এই ইঙ্গিতের মধ্যে যে, সুবর্ণলতার মাল্যার্পিত সুরম্য প্রতিকৃতি তার সংসারের সাজসজ্জা বৃদ্ধি করেছে অনেকখানি।

তথ্যনির্দেশিকা

১. আশাপূর্ণা দেবী, 'সুবর্ণলতা উপন্যাসের ভূমিকা', সপ্তবিংশতি মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৭, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা।

২. আশাপূর্ণা দেবী, *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, অষ্টাত্রিংশৎ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪০৫, পৃ. ৪০৭

৩. তদেব, পৃ. ৪৩৫

৪. সত্যবতী গিরি, 'সুবর্ণলতা : এক শৃঙ্খলিত নারীত্বের আখ্যান' [প্রবন্ধ] সংকলিত হয়েছে এবং মুশায়েরা পত্রিকায়, শারদীয়া ১৪১০, পৃ. ৯০

৫. Simone de Beauvoir, *The Seeond Sex*, Transtated and edited by H.M. Parshey. Vintuge, 1997, London, SWIVZSA

৬. আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা*, দে'জ পাবলিকেশন্স প্রা. লি., প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, পৃ. ১২

৭. Himani Mukherji, "Re-generation : Mothers and Daughters in Bengal's Literary Space, প্রবন্ধ Literature and Gender গ্রন্থে সংকলিত। Edited by Supria Chowdhuri, and Sajni Mukherjee, Orient Longman, 2002, p. 192 ব্যবহৃত উদ্ধৃতিটির উৎস এবং মুশায়েরা, তদেব, পৃ. ৯২

৮. সুতপা ভট্টাচার্য, "অর্ধশতকের কথাসাহিত্য নারীকল্পনার নতুন মাত্রা' [প্রবন্ধ], দেশ, ৫ আগস্ট ২০০০, পৃ. ৪৭

৯. দেশ, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ [সাক্ষাৎকার : চিত্রা দেব, তথ্যসূত্র-আশাপূর্ণা দেবী, উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী], প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

১০. সুদক্ষিণা ঘোষ, তদেব, পৃ. ৯২

১১. কস্তুরী রায়, 'তিন নারী তিন প্রজন্ম' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক গ্রন্থে, পূর্বা কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৮-২৯

১২. সত্যবতী গিরি, তদেব, পৃ. ৯৩-৯৪

১৩. কস্তুরী রায়, তদেব, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বকুলকথা : সংগ্রাম ও সত্তা অর্জনের পরিণতি-পর্ব

আশাপূর্ণা দেবী *প্রথম প্রতিশ্রুতি* (১৩৭১), *সুবর্ণলতা (১৩৭৩), বকুলকথা (১৩৮০)*—এই তিনটি উপন্যাসে উনিশ-বিশ শতকের সুদীর্ঘ সময়কালব্যাপী নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামাজিক ধর্মীয়, রাজনৈতিক অবস্থান বিধৃত। 'ট্রিলজি'র প্রথম গ্রন্থ *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-তে আমরা লক্ষ করেছি যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শেষ সময়কাল উপস্থাপিত। এই সময়কালে নারী ছিল চারদেয়ালে বন্দি, মুক্ত পৃথিবীর আলো সেখানে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পেত না। এই বদ্ধ সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব, তার স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত ছিল না, পাশ্চাত্য প্রভাবে এদেশীয় নব্যশিক্ষিত যুবসম্প্রদায় নারীর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনের জন্য, শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্য নারীদের ঘর থেকে বাইরে আনার প্রচেষ্টা চালান। সেক্ষেত্রে তাদেরকে প্রচলিত সমাজ থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে নারী নিজেও যে তার স্বাধীন সত্তার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তা ঐ উপন্যাসটিতে প্রতিকায়িত হয়েছে।

প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে সত্যবতী স্বশিক্ষিত এবং স্বীয় চরিত্রগুণেই সে ছিল প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর। যেখানে যে অসঙ্গতি তার চোখে পড়েছে, সেখানেই সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সত্যবতী সে যুগের মেয়ে হয়েও সব ধরনের প্রতিকূলতা, লোকনিন্দা উপেক্ষা করে সভ্যজীবনের প্রত্যাশায় গ্রামের স্থূল পরিবেশ ত্যাগ করে শহরের উদার, উন্মুক্ত পরিবেশে এসে বাসা বাঁধে, শহরে আসার পরও সত্যবতী থেমে থাকেনি, সমাজের ভাষায় সে একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে চলে। স্বামী নবকুমার সত্যবতীকে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। স্বশিক্ষিত সত্যবতী পরবর্তীতে স্বামীর শিক্ষক ভবতোষ মাস্টারের কাছে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যান্য নারীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াতে থাকে। তার চৈতন্যের গভীরে ব্যক্তিসত্তা প্রবল হয়ে ওঠে। নয় বছর বয়সী কন্যা সুবর্ণলতার বিয়ে উপলক্ষে স্বামীর প্রতারণার সঙ্গে সত্যবতী আপোষ করে না। স্বামীর প্রতি বিমুখ হয়ে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসী হয়।[১] এভাবেই সত্যবতীর সত্তা সন্ধানের পরিক্রমা সমাপ্ত হয়।

সত্যবতীর ফেলে যাওয়া জীবনের জের টানে সদ্যবিবাহিত বালিকা সুবর্ণলতা। মায়ের সংসার ত্যাগের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে সুবর্ণলতা স্বামীগৃহে প্রবেশ করে। স্বামীর সংসার তাকে বরণ করে লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। এই লাঞ্ছনার বোঝা তাকে মৃত্যুঅবধি বহন করতে হয়েছে। বাবা নবকুমার তার কাছে প্রতারক হিসাবেই চিহ্নিত। *সুবর্ণলতা* উপন্যাসে লেখক আশাপূর্ণা দেবী বিশ শতকের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময়কাল চিত্রিত করেছেন। এই সময়কালে দেশের অভ্যন্তরে বেশ কিছু রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়, যা নারীমুক্তি ও তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে বেগ সঞ্চার করেছিল। বিশেষত উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে নারীকে শিক্ষিত করে তোলার যে প্রচেষ্টা চলতে থাকে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করে বিশ শতকের প্রথম দশকের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বাংলার নারীসমাজ এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্তঃপুরে বন্দি থেকেও নারী দেশ সম্পর্কে হয়ে ওঠে সচেতন। তারা বিভিন্নভাবে স্বদেশী আন্দোলনে সহায়তা এবং অংশগ্রহণও করতে থাকে। যারা বাইরের আলো থেকে বঞ্চিত ছিল তারা ঘরে বসেই বিলেতি দ্রব্য বর্জন করে দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। রাজনৈতিক চেতনা ও নারীমুক্তির প্রসঙ্গ যে একই প্রক্রিয়াভুক্ত তা উপন্যাসত্রয়ীতে প্রকটিত।

সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতা সত্যবতীর তৈরি করা পথকে আরো একটু সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুবর্ণলতা সত্যবতীর মত সরবে প্রতিবাদ করতে না পারলেও নারীমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মনোলোকে লালন করেছে। সত্যবতী তার যুগে ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে পেরেছিল এবং নিজের জন্য কিছুটা জায়গা তৈরি করেছিল। আর সুবর্ণলতা দু'একবার বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। *প্রথম প্রতিশ্রুতি* এবং *সুবর্ণলতা*-র কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ পাঁচ দশকে নারী কিছুটা স্বাধীন হলেও বিশ শতকের প্রথম দিকে তারা আবার গৃহকোণে বন্দি। লৈঙ্গিক স্বাধীনতা বলতে তাদের কিছু নেই। সুবর্ণলতা শ্বশুরবাড়ির অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গর্ভজাত সন্তানদের শিক্ষিত-সভ্য-মার্জিত রুচিশীল করে গড়ে তোলার জন্য মেয়েদেরকে মুক্ত জীবনের নির্মল আলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপাত করেছে কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার ছেলেরা হয়েছে মুক্তকেশীর ছেলেদের নব্য সংস্করণ। কেবল উপন্যাসের ধারাবাহিক সূত্রে নতুন প্রজন্ম হিসাবে *বকুলকথায়* শেষ বয়সের মেয়ে বকুলের মধ্যেই মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা ও স্বাধীন সত্তার স্ফুরণ ঘটে। সুবর্ণলতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নেয় তার শেষ বয়সের কন্যা বকুল। সুবর্ণলতা বকুলকে পাত্রস্থ করে যেতে পারেনি। বকুল সারাজীবন অবিবাহিত, নিঃসঙ্গ, একাকী জীবন কাটিয়েছে। অবশ্য বকুলের মা, ঠাকুরমা স্বামী-সন্তান-সংসারের মধ্যে থেকেও মনোলোকে একাকী, নিঃসঙ্গই ছিলেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বকুল লেখক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। বকুলের প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে যা কিছু প্রতিবাদ তা তার লেখায় প্রকাশিত।

বকুলকথা উপন্যাসের সময়কাল বিশ শতকের শেষ পাঁচ দশক। বকুলের সময়ে নারী অনেক বেশি স্বাধীন। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে তারা উপভোগ করেছে মুক্ত পৃথিবীর আলো। কিন্তু এই বন্ধনমুক্তির উদগ্র নেশা নারীকে কোনদিকে চালিত করছে তা ভেবে বকুল শংকিত। বকুল প্রগতির নামে নারীর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে তার মা-ঠাকুরমার নারীমুক্তির স্বরূপ চিন্তা নিয়ে ভাবিত হয়। প্রগতির নামে নারীর উচ্ছৃঙ্খলতা বকুলকে পীড়া দেয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বকুলের অন্তরালে আশাপূর্ণা দেবী নিজের ভাবনা, আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। লেখক নিজেও নারীর এই প্রগতিশীলতাকে ভয় পেয়েছেন। *বকুলকথা* উপন্যাস সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর মন্তব্য—"যখন আমাদের সমাজে অন্তঃপুর ছিল অবহেলিত, তখন সেখানকার প্রাণীরা পুরোপুরি আস্ত মানুষের সম্মান কখনো পেত না, তখন সামান্য কটি মেয়ে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করে, সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত পৃথিবীর আলো এনে দেবার সুযোগ করে দেয়। অন্তঃপুরে সত্যবতী ছিল সেই সামান্য ক'জন মেয়ের অন্যতম। সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতা সত্যবতীর মত তেজ না পেলেও নীরবে সেই নারীমুক্তিরই আকাঙ্ক্ষাকে লালিত করে গেছে। সেই আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়েছে সুবর্ণলতার মেয়ে বকুলের জীবনে, যে যশস্বী লেখিকা হয়েছে অনামিকা দেবী নামে। কিন্তু বকুল তথা অনামিকা দেবী কি তার সমাজের নতুন রূপে মা ও দিদিমার সাফল্য দেখতে পাচ্ছে? না দেখতে পাচ্ছে শেকল ছেঁড়ার এক ভয়াবহ উন্মাদনায় নারী প্রগতির নামে চলছে স্বেচ্ছাচার! এই জিজ্ঞাসাই বকুল বা অনামিকা দেবীকে বারে বারেই উন্মনা করে তুলেছে।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

বকুলকথা-য় মূল চরিত্র বকুলের ভূমিকা নায়িকার নয়, দর্শকের; আর সে দর্শক স্বয়ং আশাপূর্ণা দেবী। আধুনিক সমাজের দ্রুত রং বদল, তার পাল্টে যাওয়া বকুল তার নিজ পরিবারে ও লেখক জীবনে যতটা দেখেছে, তা তার লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। আশাপূর্ণা দেবীর ট্রিলজি তিন যুগের পৃষ্টপটে আঁকা তিন নারীর এই শেষ নারীটি যতখানি মুক্তির মধ্যে বাস করেছে, ততখানিই অন্যের জীবন ও সমাজকে অবলোকনের, বিশ্লেষণের ক্ষমতাও অর্জন করেছে। স্বয়ং ঔপন্যাসিক বলেন, "আজকের অজস্র বকুল পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল পারুলদের মা-দিদিমা, পিতামহী এবং প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না, তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক-আধজন। একলা এগিয়েছে। ...পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজের কাটা পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে আর একজন, তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি করেই তো তৈরি হলো রাস্তা। যেখান দিয়ে আজ বকুল পারুলরা এগিয়ে চলছে।"[৩] সেই পথ তৈরির ইতিহাসই ট্রিলজির পাতায় বিধৃত। তবে এই পথ তৈরি করতে পুরুষতন্ত্রের অনেক ক্ষমতা মোকাবিলা করতে হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার একটা সামাজিক মাত্রা আছে। যুগে যুগে তা ভিন্নতা পায়। এক সময়ে যেমন জোর করে 'সতী' করা হত, তারপর বাল্যবিধবাকে একাকী ব্রত পালন অর্থাৎ নিরম্বু উপবাস করানো হত, সেই সঙ্গে মেয়েদের লেখাপড়া করা পাপ, বাইরে বেরুনো অপরাধ, পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলা ঘোর অন্যায় ইত্যাদি পরাধীন রাখার কত না হাতিয়ার তৈরি করা হল। আশাপূর্ণা দেবী সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস অনুসারে এইসব সামাজিক মাত্রা দেখিয়েছেন। সমাজ তো যুগে যুগে পাল্টায়। যে সব রীতিনীতি নিয়ে সত্যবতীকে আর তারপর সুবর্ণলতাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, সেসব রীতিনীতি আজ আর নেই। কিন্তু সম্পর্ক যেখানে ক্ষমতা-সম্পর্ক, সেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকৃত স্বরেরও একটা রাজনৈতিক মাত্রা আছে। সেই ব্যক্তিগত স্বরকেও ধরতে চেয়েছেন আশাপূর্ণা।

সমাজে নারী-পুরুষের যে লৈঙ্গিক বৈষম্য, যে শ্রেণী বিভাজন তা যে সমাজেরই সৃষ্টি, সে কথাই প্রকারান্তরে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আর এ-কারণে সত্যবতী, সুবর্ণলতা তাদের স্বামী বা ছেলেদের তুলনায় বাইরের জগৎ সম্পর্কে অনেক বেশি আগ্রহী, সামাজিক জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত তাদেরকে আলোড়িত করে। সদর-অন্দর নয় আশাপূর্ণা দেবী ব্যবহার করেছেন তার পরিবর্তে 'শহর-মফঃস্বল, সরাসরি বলেছেন, তা মনের গড়নেরও শহর মফঃস্বল আছে বৈকি, নইলে যুগচক্রের আবর্তনে সত্যবতী কেন এমন অধীর হয়, চঞ্চল হয়, আন্দোলিত হয়, আর নবকুমার কেন সেন আবর্তন টেরও পায় না?'। এই চিন্তা-চেতনা দ্বারা নারী-পুরুষের সম্পর্ক কতটুকু নিয়ন্ত্রিত আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে সে কথাই তুলে ধরেছেন।

লেখক আশাপূর্ণা দেবীর জীবনদর্শন অভিজ্ঞতানির্ভর, বাস্তববাদী ও কখনও কখনও প্রকৃতিবাদী (Naturalistic) দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। জীবন-অভিজ্ঞতার এক একটি বিন্দু দিয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর সাহিত্য। তিনি প্রতিদিনের চোখে দেখা জীবন থেকেই সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এ সম্পর্কে আশাপূর্ণার অভিমত "জীবন নিয়েই সাহিত্য, চরিত্র নিয়েই কল্পনা। আদ্যিকালেও যা ছিল, আজও কি তাই নেই? যেটা অন্যরকম সেটা তো পরিবেশ। সমাজে যখন যে পরিবেশ, তার খাঁজে খাঁজে ওই জীবনটাকে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য।

আশাপূর্ণা দেবীর জীবনদর্শন সক্রিয় জীবনসংগ্রাম ও গতিবাদ দ্বারা সঞ্চালিত। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে কোনকিছুই স্থিতিশীল নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনেও পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবর্তন মানেই জীবন, যা অনড়, অচল, অপরিবর্তিত, সেখানে জীবনের স্পন্দন অনুপস্থিত। জীবন প্রতিনিয়তই নতুন

Dhaka University Institutional Repository

উন্মাদনায় চঞ্চল। জীবনের গতিচাঞ্চল্যকে প্রবহমান নদীর ধারার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন লেখক। 'জীবন প্রতি মুহূর্তেই রং বদলায়। তাই নদীপ্রবাহ জীবনপ্রবাহের প্রতীক, তবু নদীর ওই নিয়ত রূপ-বৈচিত্র্যের গভীরে যে একটি স্থির সত্তা আছে, পারুলের প্রকৃতির মধ্যে আছে তার একাত্মতা। পাগল হয়ে সে সত্তার গভীরে নিমগ্ন থেকে ওই রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্য হতে আহরণ করে বাঁচার খোরাক, বাঁচার প্রেরণা, [*বকুলকথা*, পৃ. ১২৯]

লেখকের জীবনদর্শন মূর্ত হয়েছে পারুল চরিত্রের মধ্যে। আশাপূর্ণা দেবী প্রকৃতির সান্নিধ্যে আনন্দ অনুভব করতেন। রক্ষণশীল পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে জীবন অতিবাহিত হলেও প্রকৃতির সান্নিধ্যের প্রতি যে দুর্বার টান ছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে পারুল চরিত্রে। লেখক পারুলকে 'একটি সত্তা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। "সকলের মধ্যে থেকেও পারুল একটি নিজস্ব ভুবন গড়ে তুলেছে সবধরনের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে। মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধন তার 'আমিত্ব'। এই 'আমি'টিকে সত্যিকার পরিশুদ্ধ করে নির্ভুল নিখুঁত হবার চেষ্টা ক'জনেরই বা থাকে? আমিটিকে পরিপাটি দেখানোর সংখ্যাই অধিক। ওই দেখানোর মোহটুকু ত্যাগ করতে পারলেও বা হয়তো সেই ত্যাগের পথ ধরে পরিশুদ্ধি এলেও আসতে পারে। কিন্তু 'আমি'র বন্ধন বড় বন্ধন।" [তদেব, পৃ. ১৩০]

বকুলকথার প্রধান চরিত্র বকুল অনামিকা দেবী নামে বিখ্যাত লেখিকা, যার লেখা নারীমহলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। নারী হৃদয়ের গোপন ব্যথা, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, না পাওয়ার আকুতি তাঁর কলমে অত্যন্ত বাস্তব-সম্মতভাবে উপস্থাপিত—অনামিকা দেবী তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে এরূপ উক্তিই করেছেন। পাঠকসমাজে প্রগতিশীল লেখিকা হিসাবে খ্যাত হলেও অনামিকা দেবীর অন্তরালে বকুল ভীরু-শঙ্কিত। বকুল যে কালে তার বাল্য-কৈশোর-যৌবনের সময় অতিবাহিত করেছে, সে কালে প্রগতির ক্ষীণধারা প্রবাহিত থাকলেও হৃদয়বৃত্তির কোন মূল্য ছিল না। সুবর্ণলতার শেষ বয়সের সন্তান হওয়ায় সংসারে বকুলের ভূমিকা অনেকটা অপরাধীর। সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে তার কুণ্ঠার শেষ নেই। মায়ের মৃত্যুতে বকুল মানসিক দিক থেকে একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। মা সুবর্ণলতার অবর্তমানে বাবা-দাদারা তাকে পাত্রস্থ করার কথাও ভুলে যায়। ফলে মুক্তকেশীর অচলায়তনে বকুল চিরকুমারী হয়েই বিরাজ করে। বাবার উইলের জোরে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে রচনা করে একের পর এক সাহিত্য। কালের নিয়মে সমাজ পরিবর্তিত হয় বলে বকুলের মা-মাতামহীরা নারীর যে স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছিল, নারীর জন্য যে প্রগতি চেয়েছিল, তা এখন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। "এদের হাতে রয়েছে যথেচ্ছ বিহারের ছাড়পত্র, এদের হাতে সব দরজার চাবি, সব জগতের টিকিট, এরা ভাবতে পারে না সুবর্ণলতা কত শক্ত দেয়ালের মধ্যে আটকা থেকেছে আর বকুলকে কত দেয়াল ভাঙতে হয়েছে কত ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে।" [তদেব, পৃ. ৮৬]

বকুল তার মা সুবর্ণলতার মুক্ত পৃথিবীর আলোর জন্য যে ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করেছে সেই যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়েছে তাঁর লেখায় বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে। সুবর্ণলতা তার শাশুড়ি মুক্তকেশীর তথা সমগ্র পরিবারতন্ত্রের তৈরি অচলায়তন ভাঙার জন্য প্রাণপাত করেছে। মুক্তকেশীর সেই অচলায়তনের মেয়েরা এখন দিন নেই, রাত নেই বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে। তারা ছেলে বন্ধুদের সাথে পিকনিকে গেলেও দোষ নেই। পৃথিবী তাদের পদানত, অন্ধকার তাদের হাতের মুঠোয়, জীবনও নিজের নিয়ন্ত্রণে। এ যুগের মেয়েদের দেখে পারুল অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়—"ধারণা ছিল যুগের নিয়মটা অনেকটা সিঁড়ির নিয়মের মত। সে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হতে হতে চলে।" ...তাহলে কি আমার অন্যমনস্কতার অবকাশে একটা যুগ তার কাজ করে চলে গেছে। নইলে সেই যুগটা কোথায় গেল? আমার যুগটা? [তদেব, পৃ. ২৪]

Dhaka University Institutional Repository

সত্যবতী-সুবর্ণলতার যুগ ধীরে পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু *বকুলকথার* বর্তমান যুগ প্রতি মুহূর্তে রং বদলায়। লেখক হিসাবে যুগের এই দ্রুততায় অনামিকা দেবী দিশেহারা। লেখক হিসাবে এ যুগের স্পষ্ট চেহারা সাহিত্যে রূপায়িত করা হয়ে ওঠে তাঁর জন্য দুরূহ ব্যাপার। কোথাও কোথাও এই যুগটা 'দুরন্ত সংহারের মূর্তি'তে পুরনো মূল্যবোধে আঘাত হানছে, আবার কোথাও প্রাচীন সংস্কারের চর্চা চলছে। ফলে সাহিত্যেও পড়েছে এই দ্বিমুখী ধারার ছাপ।

উত্তাল কালের প্রেক্ষাপটে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আধুনিক সাহিত্য। এতে দ্রুত চলমান জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়। তা এতই গতিশীল যে কখনই কোনো একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির থাকে না। এই দ্রুতগতির সময়ের সাথে সাথে পাল্টে যায় এই জীবনজিজ্ঞাসাও। সময়ের সাথে তাল রাখতে গিয়ে কবি-সাহিত্যিকরাও সংকটাপন্ন হন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে এমনই এক মন্তব্য করেছেন—

> "সংকট তো চিরদিনই সাহিত্যের পার্শ্বসহচর। চিরদিন সংকটকে পেরিয়ে নতুন পথের সন্ধান করবার প্রয়োজনেই তো সাহিত্য। দেশ আর সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সাহিত্যের নিত্যকালীন লক্ষ্য। এই অগ্রগমনের ইচ্ছাই প্রমাণ করে আমরা পিছিয়ে আছি। পিছিয়ে পড়ার এই সংগ্রাম থেকে মুক্তি পেতেই মানুষের সাহিত্য।"[৪]

নারী রচিত সাহিত্যেও আধুনিকতার এই সদাচঞ্চল বেগবান চিত্র ছায়া ফেলেছে। *বকুলকথা*-য় লেখক আশাপূর্ণা দেবী যুগের প্রেক্ষাপটে আধুনিক সাহিত্যের সদাচঞ্চল অবস্থার উল্লেখ করেছেন। নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ ও মানুষের মানসিকতা, এই পরিবর্তনের কাজে সাহিত্য অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক যুগে সাহিত্যরচনার ধারাও অতি দ্রুত অতীত হয়ে যায়। অনামিকা দেবীর সাহিত্যকে তরুণ সমাজ 'আধুনিক' বলে বাহবা দিত, সময়ের ব্যবধানে সেই পাঠকই আবার আধুনিক নারীর মনোবিশ্লেষণের প্রতিচ্ছবি আঁকতে দেখে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে। বর্তমান 'জেনারেশন' আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার জগতে, বয়ে বেড়াচ্ছে ক্লেদাক্ত জীবনের ভার। প্রগতির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে অনামিকা দেবী তথা বকুলের ছোট দাদার মেয়ে সত্যভামাকে তার মা অলকা আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। সত্যভামা হোটেলের ক্যাবারে ড্যান্সার। সত্যভামা অন্ধকার জগতে হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে হারিয়ে যায় অন্ধকার জগতে। তার ক্লেদোক্ত জীবনের অবসান ঘটায় আত্মহত্যার মাধ্যমে। হারিয়ে যাওয়া সন্তানের জন্য অক্ষম বাবার কাতরোক্তি 'আমাদের অক্ষমতা আমাদের অহমিকা।' অহমিকার চোরাগলিতে তলিয়ে যাচ্ছে আধুনিক নরনারী। আশাপূর্ণা দেবী কুশলী দৃষ্টিতে সমাজের প্রতিটি কোণ থেকে তুলে এনেছেন আধুনিক নারীর জীবনচিত্র এবং নিপুণ দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন পাঠকসমক্ষে।

স্বামী পরিত্যক্ত নমিতা জলপাইগুড়িতে স্বামীর এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রিত। আশ্রিত জীবনে ভালই কাটছিল তার জীবন। হঠাৎ একদিন নমিতা আত্মাবিষ্কার করে। আশ্রিত জীবন হয়ে ওঠে তার কাছে বন্ধনস্বরূপ। নমিতার বোধের জগতে ধাক্কা লাগে 'আমাকে সবাই ঠকিয়ে খেয়েছে...আমাকে সবাই ভাঙিয়ে খেয়েছে। আমি যে একটা রক্তমাংসের মানুষ। আমারও যে সুখ-দুঃখ বোধ আছে, শ্রান্তি-ক্লান্তি আছে, ভাল-লাগা ভাল না লাগা আছে সেকথা কোনদিন কারো খেয়ালে আসেনি।' [*বকুলকথা*, পৃ. ১৪৭] উনিশ শতকের শেষপাদে নারীর মধ্যে যে অচেতনতার জাগরণ ঘটে, বিশ শতকে তা আরো বেগবান হয়। নারী কেবল নারী নয়, সে মানুষ। মানুষ হিসাবে তার আছে মর্যাদা, আত্মাবিষ্কারের সাথে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পারিবারিক বন্ধন, ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত হওয়ার জন্য নারী বাইরে বের হয়ে আসে, বেছে নেয় বিচিত্রধর্মী পেশা। নমিতা আত্মাবিষ্কারের সাথে সাথে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। স্বাধীন পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে অভিনয়। এক সময়ের নম্র কূলবধূ, আশ্রিত অসহায় নমিতা হয়ে ওঠে রূপালি জগতের একচ্ছত্র প্রাধান্যের অধিকার, প্রকাশ ঘটে তার সৃজনশীল প্রতিভার। সমাজ-সংসারের এই পরিবর্তনের ছাপ নারীরচিত সাহিত্যেও রূপায়িত হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। নমিতার সদ্যজাগ্রত বোধের কাছে আশ্রয়, নিরাপত্তা, সামাজিক পরিচয়ের প্রশ্ন তুচ্ছ হয়ে যায়। 'স্বামীর ঘরটা যে একটা আইনসঙ্গত অধিকারের মাটি, সেখানে দাঁড়িয়ে জীবনযুদ্ধে লড়ে যাওয়া সহজ। ওখানে 'প্রেম নামক দুর্লভ বস্তুটি নিয়ে মাথা না ঘামালেও কাজ ঠিকই চলে যায়। কিন্তু আর সবাইতো অনধিকারের জমি। সেখানে কেবলমাত্র মনোরঞ্জনের ক্ষমতার জোরে টিকে থাকতে হয়। [তদেব, পৃ. ১৪৬]

বিশ-শতকের মাঝামাঝি এলেও নারী কেবল অর্থনৈতিক কারণে অন্যের আশ্রিত হয়ে জীবন যাপনে বাধ্য হয়। নমিতা এই সত্য জীবন দিয়ে জানতে পেরেছে। স্বল্পশিক্ষিত নমিতা বুঝেছে অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া নারী কোনভাবেই স্বাধীন জীবন বেছে নিতে পারে না। অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে আসে যশ-খ্যাতি, মান-সম্মান। অন্য কোন পথ না পেয়ে নমিতা দেহব্যবসায় লিপ্ত হয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর এই পেশা ঘৃণ্য। আশাপূর্ণা দেবী নিজেও হয়তো সমাজ-মানসিকতার বিপরীত অবস্থানে দাঁড়াতে চাননি। তাই জনৈক লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি উত্থাপন করেছেন—"ইহ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল্য দিতে আত্মবিক্রয় না করছে কে? অর্থোপার্জনের একমাত্র উপায়ই তো নিজেকে বিক্রি করা। কেউ মগজ বিক্রি করছে, কেউ অধীত বিদ্যা বিক্রি করছে, কেউ চিন্তাকল্পনা স্বপ্নসাধনা ইত্যাদি বিক্রি করছে, কেউ বা স্রেফ কায়িক শ্রমটাকেই। মেয়েদের ক্ষেত্রেই বা তবে শরীর বিক্রি এমন 'মহাপাতক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন? বহুক্ষেত্রেই তো তার একমাত্র সম্বল ওই দেহটাই।' [তদেব, পৃ. ২২৮]

উনিশ শতকের রক্ষণশীল সমাজ-প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করেও নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবীর এই ধরনের মন্তব্য নিঃসন্দেহে সাহসিকতার পরিচায়ক, বিবাহিত জীবনেও মনবিবর্জিত দৈহিক মিলন হয়। মন ছাড়াও কেবল দেহ দুটি নর-নারীকে দীর্ঘদিন একসূত্রে বেঁধে রাখতে সক্ষম। নারীর জৈবিক চাহিদার কথা উল্লেখ করতে নারীবাদী লেখক বলেন—

> "উনিশ শতকের বাঙলায় প্রাচীনের অবলুণ্ঠিতে আর্তনাদ করেছে পুরুষতন্ত্র; দিকে দিকে সংসার বৃক্ষের ডালে ডালে, ঝুলতে দেখেছে 'বিষময় ফল'। বিষাক্ত নারী ফুল ফুটিয়েছে, ফল ধরিয়েছে বিষবৃক্ষের। পুরুষের চোখে চিরকালই নারী নয়, নারীত্ব বিপন্ন, তাই পুরুষ সব সময় চেষ্টা করেছে নারীকে আদিম অবস্থায় রেখে দিয়ে 'নারীত্ব উপভোগ করতে। নারীর মৃত্যুতে তাদের দুঃখ নেই, তাদের উদ্বেগ নারীত্বের মৃত্যুতে। নারীর সামনে সময় থাকে, নারীর বয়স বাড়ে, সময়ের কামড় বোধ করে নারী; কিন্তু নারীর কোন ভবিষ্যত থাকে না।"[৫]

ফ্রয়েড নারীর মনস্তাত্ত্বিক, জৈবজীবনের যে জটিলতার চিত্র উল্লেখ করেছেন তা আমরা ক্রিয়াশীল দেখতে পাই নমিতার মনস্তত্ত্বের গভীরে। নমিতার স্বামীর সঙ্গে বিবাহিত জীবনের পরিচয়টুকুই ছিল, শরীর বা মনের কোন সম্পর্ক ছিল না। শরীর-মনের চাহিদা পূরণ করতে তাই একদিন সংসারের জটিল জাল ছিন্ন করে মুক্ত আকাশে পাখা মেলে। বিশ শতকের আধুনিক নারী তার জৈবিক চাহিদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। *পুতুল নাচের ইতিকথা*-র কুসুম গ্রামের মেয়ে হলেও বিবাহিত জীবনে জৈববাসনা চরিতার্থ করার প্রশ্নে সে-ও সচেতন। কুসুমের জৈববাসনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 'আপনার কাছে দাঁড়ালে শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু? কুসুমের উদগ্র কামনাও একদিন শশীর অবহেলায় শুকিয়ে যায়। সর্বসুখে বঞ্চিত কুসুম

Dhaka University Institutional Repository

একসময় গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যাওয়ার আগে কুসুম শশীকে বলেছে—'লাল টকটকে করে তাতানো লোহাও কোলে রাখলে তা একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কাকে ডাকছেন ছোট বাবু? কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।' কুসুম গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজের অসহায় বধূ। তার পক্ষে এর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। আর নমিতা শহুরে স্বল্পশিক্ষিত নারী হলেও তার বোধের জগৎ অত্যন্ত প্রখর। নবআবিষ্কৃত বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে সংসার ত্যাগ করে, মুক্তির স্বাদ গ্রহণের প্রত্যাশায়। নারীর এই বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা আধুনিক নারী লেখকের সাহিত্যকর্মেও প্রচ্ছন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। নমিতা তার সঞ্চিত বধূজীবনের সমাপ্তি ঘটাতেই অর্থনৈতিক মুক্তি কামনা করেছিল। মুক্তির স্বাদও পেয়েছিল। যে বোধের যন্ত্রণায় নমিতা ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি সে পায়নি। বুর্জোয়া সমাজের লালসার শিকার নমিতা পুরুষের মুনাফা বৃদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাসে নারীর অসহায় অবস্থার যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন, তাদের জন্য সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু সমাধানের কোন পথনির্দেশ করেননি।

১৯৪৭-পরবর্তী কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন লেখক আশাপূর্ণা দেবী *বকুলকথা*-য় চিত্রিত করেছেন। আধুনিক নর-নারীর নিকট বিবাহবন্ধন অমোঘ, অপরিবর্তনীয় নয়, রুচির পার্থক্যের কারণে তারা অনায়াসে ভেঙে দিতে পারে দাম্পত্য সম্পর্ক। পারুলের পুত্র ও পুত্রবধূ শোভন-রেখার আপাতসুখের দাম্পত্য জীবন কেবলমাত্র রুচির পার্থক্যের কারণে ভেঙে যায়। 'প্রতিপদে রুচির অমিল' প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈপরীত্য—একজন ভগবানে বিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অপরজন উদারনৈতিক আধুনিক মনোভঙ্গিসম্পন্ন। আধুনিক নর-নারী নিজেকে নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে সন্তানের সুবিধা-অসুবিধা গৌণ। বাবা-মায়ের দাম্পত্য-কলহের বলি হয় অসহায় সন্তান। যুগের পরিবর্তন হলেও অবস্থার তেমন উত্তরণ হয়নি। উনিশ শতকের শুরুতে যেমন সন্তানকে মা-বাবা নিজস্ব সম্পত্তি জ্ঞানে নিজের পছন্দ অনুযায়ী তাদের জীবন গড়তে প্রয়াসী হয়, একটা সময় পেরিয়ে বিশ শতকে এসেও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। বিশ শতকের আধুনিক নর-নারী সন্তানের জীবনকে নিজস্ব ইচ্ছানুসারে চালিত করে। অনামিকা দেবী তথা বকুলের বোন পারুল তার ছেলে শোভনকে আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্য স্বার্থান্বেষী মানসিকতার জন্য চোখে দেখেছেন। পারুল শোভনকে বলেছে—'যে কালকে তোরা সেকাল বলে নাক কোঁচকাতিস, সেই কালের থেক একপাও এগোসনি। তোরাও সেযুগের মতো ছেলেপুলেগুলোকে নিজেদের জিনিসপত্তর ছাড়া আর কিছুই ভাবিস না। অথবা ভাবিস তোদের খেলনা পুতুল। সেকালেও তো এই ছিল? ওদের মুখপানে কে চাইতো? ওরা যেন নিজেদের শখ-সাধ মেটানোর উপকরণ মাত্র। নিজেদের সুবিধে-অসুবিধের বশেই তাদের ব্যবস্থা, কেমন? কিন্তু এ যুগে তোরা অনেক বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস, ওদের জন্য অনেক ব্যবস্থা অনেক আয়োজন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীটা বদলালো কই? সন্তানের জন্য যে স্বার্থত্যাগের দরকার আছে, জেদ অহংকার ত্যাগের দরকার আছে, তা তো ভাবিস না তোরা একালের মা-বাপ? তোদের সুবিধের অনুপাতে ওদের জীবনছক।" [*বকুলকথা*, পৃ. ২৩৭]

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রাধান্য কমে যাচ্ছে। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা—এই শব্দগুলো হচ্ছে নির্বাসিত। আত্মসর্বস্ব জীবনে নিজের ভোগবিলাসেই মত্ত মানুষ, সেখানে সন্তান-বাৎসল্য গুরুত্বহীন। আশাপূর্ণা দেবী যুগসচেতন লেখক। বকুলের মা-মাতামহীরা তাদের সুদীর্ঘ জীবনে সামাজিক এই অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লড়াই করে করে শক্তি ক্ষয় করেছে। ভেবেছে নিজেরা না পেলেও হয়তো একদিন

Dhaka University Institutional Repository

সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হবে। কিন্তু দেখা যায়, স্বাধীনতার নামে নারী বেছে নিচ্ছে স্বেচ্ছাচারী জীবন, যে জীবনের শেষ কোথায় তা সে নিজেও জানে না। তাই বকুলের অন্তরোক্তিতে আশাপূর্ণা দেবীর আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে—"...আমরা কি মেয়েদের এই স্বাধীনতারই স্বপ্ন দেখেছিলাম? আমরা আমাদের মা-দিদিমারা? ...এই যুগ কি ব্যক্তিস্বাধীনতা আর মেয়েদের হতভাগ্য জাতি সৃষ্টি করলো? পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিরা যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে। সে হতভাগ্যেরা শিশুকালে বাল্যকালে তাদের জীবনের পরম আশ্রয় হারিয়ে বসে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় কঠিন হয়ে উঠবে। উচ্ছৃঙ্খল হবে, স্বেচ্ছাচারী হবে, সমাজদ্রোহী হবে, অথবা একটি হীনমন্যতায় ভুগে ভুগে জীবনের আনন্দ হারাবে, উৎসাহ হারাবে, বিশ্বাস হারাবে।' [*বকুলকথা*, পৃ. ২৩৮] লেখক আশাপূর্ণা দেবী আধুনিক সামাজিক অবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন এবং বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে তার নিপুণ চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

আধুনিক দাম্পত্য-সমস্যার ক্ষেত্রে একটি জটিল প্রশ্ন সন্তানের অবস্থান। দাম্পত্য-সমস্যার এই দিকটি সম্পর্কে সুকুমারী ভট্টাচার্যের মন্তব্য—"আইনে কিছুকাল তারা মায়ের কাছেই লালিত হবে, পরে বাবা চাইলে এবং মা না চাইলে বাবার কাছে থাকবে। অথবা মা চাইলে বাবা না চাইলে মায়ের কাছে থাকবে। দু'জনের কেউই না চাইলে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস করবে, দুটিতে পালা করে মা, বাবার কাছে এসে থাকবে যদি তারা চায়। ...মা-বাবার স্নেহের ও যত্নের পরিবেশে লালিত হবার কোনো বিকল্প নেই, যে সন্তান তা পায় তার বাল্য কৈশোরের স্বাদ গন্ধই আলাদা।... বাবা-মার ভাঙা দাম্পত্যের দরুন যে মানসিক এবং বাস্তবিক নিরাশ্রয়তা, অসহায়তা, কখনো বা অহেতুক নিগ্রহ এবং তার বন্ধু সমাজের পরিবেশে সন্তানকে যে নিদারুণ মর্মপীড়া ভোগ করতে হয় তা নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।'[৬]

উনিশ শতকের বন্দি, বঞ্চিত নারীসমাজ বাধ্য হত বাবা মায়ের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করতে। বিশ শতকে এসে নারী স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ পায়। নিজের পছন্দ অনুযায়ী দাম্পত্য-জীবন গড়তে পারে। কিন্তু দেখা যায় এই দাম্পত্য-জীবনও স্থায়ী হয় না রুচিগত পার্থক্যের কারণে। বকুলের দিদিমা সত্যবতী দেবী নয় বছরের কন্যা সুবর্ণলতাকে লুকিয়ে বিয়ে দেওয়ায় মন্তব্য করেছিল—'এ বিয়ে নয়, ছেলেখেলা'। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদস্বরূপ দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে 'বিয়েটা কেন ভাঙা যায় না'। এতটা সময় পেরিয়ে এসেও বিয়েটা পুতুলখেলায় রয়ে যায়। সত্যবতীর সময়ের বিয়ে আর আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে কেবল একটাই পার্থক্য—সেকালে বিয়েটা ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধন আর একালে বিয়ে একটা খেলা। ভাল লাগলে যখন তখন ভেঙে ফেলা যায়। আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখে বকুলের হৃদয়কন্দরে ধ্বনিত হয় 'আমাদের বিদ্রোহিণী মাতামহী কি এই চেয়েছিলেন?' সত্যবতী সুবর্ণলতা নারীর স্বাধীনতার যে স্বরূপটি দেখতে চেয়েছিলেন তা আজও আসেনি। "আমরা আপন কল্পনায় সমাজের একটি ছাঁচ গড়েছিলাম। আমাদের সর্বাঙ্গে শৃঙ্খল যেখানে সেখানে অসহনীয় যন্ত্রণায় পীড়িত করেছে, সেখানটাই বন্ধন শিথিল করতে চেয়েছিলাম—এই সেকালের নাটবল্টু, কব্জা, স্ক্রুগুলো একটু আগলা হোক, কিন্তু আমাদের চাওয়াটাই তো সব চাওয়া নয়! আরও চাওয়ার পথ ধরে ওই স্ক্রু, কব্জা, নাটবল্টুগুলো খুলে খুলে ছিটকে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ...যাবেই, কারণ আর একটা নতুন ছাঁচ জন্মাবার অপেক্ষায় রয়েছে। [তদেব, পৃ. ৩০৪]

বকুল নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, অন্তর্মুখী। বকুল এই মানসগঠন লাভ করেছে মা সুবর্ণলতার কাছ থেকে। অনামিকা দেবীর মানস গঠনও বকুলের মানসপ্রকৃতির কাছে ঋণী। ভীরু দুর্বল বকুল অনামিকা দেবীকে

Dhaka University Institutional Repository

অনেকখানি অন্তর্মুখী হয়েছে। তার কথোপকথনের অধিকাংশ সংঘটিত হয় মনোলোকে। অনামিকা দেবী দর্শকের নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়েই জীবনকে দেখেছেন। বকুলের মা সুবর্ণলতা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন। সেই আবেগ অনামিকা দেবীর মধ্যেও লক্ষণীয়। নবাগত সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তার মন্তব্য থেকেইএই মানসপ্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। 'কিন্তু শুধুই কি মায়ের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত থেকেই অনামিকার প্রকৃতির গঠন? বকুলের কাছ থেকেও কি নয়? বকুলের মধ্যেও কি আবেগ ছিল না? ছিল না মোহ, বিশ্বাস, প্রত্যাশা? মার মত তীব্রভাবে না হোক, সুষমার মূর্তিতে? [তদেব, পৃ. ৬৩]। লেখক আশাপূর্ণা দেবীর মানসপ্রকৃতিও এখানে স্পষ্ট। লেখক আবেগপ্রবণ হয়েই নারীর বঞ্চনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। সে আবেগ নিছক কল্পনা নয়। চোখে দেখা বাস্তব জীবন।

সুবর্ণলতার আর এক মেয়ে পারুলও অর্ন্তমুখী। মায়ের স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুবর্ণলতা প্রতি মুহূর্তে সংসারের মধ্যে এক না একটা ঝড়ের অবতারণা করত। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বই পড়ত, কবিতা লিখত। পারুলের স্বামী তার কবিতার খাতা দেখেছিলেন বলে পারুল কবিতা লেখা ছেড়ে দেয়। পারুল নিস্তরঙ্গ নির্জন ঝামেলামুক্ত জীবনের প্রত্যাশী। নির্জনতার মধ্যে এক ধরনের আনন্দ খুঁজে যায়। এই শূন্য নিস্তরঙ্গ জীবনে না পাওয়ার হাহাকারও প্রচ্ছন্ন ছিল। বকুল-পারুল—এই দুই নারী চরিত্র থেকেই লেখকের জীবনদর্শন স্পষ্ট হয়। দুটি চরিত্রের প্রতিতুলনায় দেখা যায়, লেখক জীবনের গতিবেগকে বেশি প্রাধান্য দেন।

আধুনিক মনোভঙ্গিসম্পন্ন লেখক আশাপূর্ণা দেবী আধুনিক নারী-পুরুষের প্রেমকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিক যুবক-যুবতী প্রেমকে চরিতার্থ করার প্রয়োজনে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়। তারা প্রেমের ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্মকেও ভেঙে ফেলেছে। নারী বর্তমানে অনেকটাই স্বাধীন, বকুলের কালে বকুলের অব্যক্ত, ভীরু ভালোবাসাকে সন্দেহবশত গলা টিপে ধরেছে। সে সময় প্রেমাসম্পদকে শুধুমাত্র দেখতে পেলেও অনেক পাওয়া হয়েছে বলে মনে করা হতো। অথচ এযুগের নারীরা প্রয়োজনে সঙ্গী পাল্টাতেও দ্বিধা করে না। বকুলের বড় দাদার একমাত্র কন্যাসন্তান শম্পা তার একাধিক প্রেমের কাহিনী নিজেই অকপটে ব্যক্ত করেছে। নারী যে কেবল লজ্জবতী লতা নয়, তারও স্বাধীন ইচ্ছা আছে, আছে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার, শম্পা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শম্পা প্রেমের প্রচলিত মর্ম ভেঙে বাইরে বের হয় এসেছে। শম্পা কোন অক্রিয় সত্তা নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে সক্রিয়। শম্পা শিক্ষিত আধুনিক চেতনাসম্পন্ন নারী। তবু তার প্রেম নিয়ে পারিবারিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। বাবা-মা তার প্রেমকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় বিদ্রোহী শম্পা ঘরে ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে পরিণতির কথা না ভেবেই। বাবা-মায়ের আদেশকে উপেক্ষা করে শম্পা প্রকারান্তরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোতেই চরম আঘাত হেনেছে।

শম্পা প্রচলিত সামাজিক প্রথার বাইরে এসে তার প্রেমকে চরিতার্থ করেছে। শম্পা কখনোই পুরুষ-বিদ্বেষী নয়। বরং নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক পার্থক্যকে সে মেনে নিয়েছে এবং পুরুষকে অনেকটা খেলার সামগ্রীর ন্যায় ব্যবহার করেছে। যতক্ষণ ভাল লেগেছে একজনকে নিয়ে খেলেছে, তাতে নিরাসক্তি এলে আবার আরেকজনকে বেছে নিয়েছে। এ ব্যাপারে শম্পার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—"একটা প্রেম-ট্রেম থাকবে না, কেউ আমার জন্য হাঁ করে বসে থাকবে না। আমায় দেখলে ধন্য হবে না, এ ভালো না বুঝলে পিসি? কিন্তু সত্যি প্রেমে পড়তে পারি এমন ছেলে দেখি না। [বকুলকথা, পৃ. ৬] শম্পা নিষ্ঠাবতী বাঙালি হিন্দু নারীর সতীত্বের সংস্কারকে উপেক্ষা করেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সে নর-নারী উভয়ের সাম্যের নীতিকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাধান্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। তবে শম্পা রোমান্টিক প্রেমের প্রথাগত সূত্রকে অস্বীকার করেনি। সত্যবান দাসকে শম্পা প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলে। এই প্রথম শম্পা একজন পুরুষের প্রেমে পড়ে। এদিক থেকে শম্পা একধাপ এগিয়ে গেছে। সে প্রেমের প্রচলিত ফর্ম ভেঙে ফেলেছে। প্রচলিত নীতি অনুযায়ী পুরুষই প্রথম নারীকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু এই ধারার বাইরে এসে শম্পা প্রমাণ করেছে নারীরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সেও ভালবাসতে পারে, প্রেমাস্পদকে অগ্রণী হয়ে সেকথা জানাতে পারে।

শুধু তাই নয় শম্পা একজন নারী হয়েও অসহায়, পঙ্গু বেকার সত্যবানকে বিয়ে করে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছে। যুগের পরিবর্তন নারীর অবস্থানকেও কীভাবে ভিন্ন তাৎপর্য দেয় তার উদাহরণ শম্পা। প্রচলিত ধারা অনুযায়ী নারী অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের ওপরে নির্ভরশীল, একজন নারীও যে পুরুষের দায়ভার স্বচ্ছন্দে বহন করতে সক্ষম তার প্রমাণ শম্পা। বকুলের মা-মাতামহীরা যে তপস্যা করেছিল তা এক যুগ পরে হলেও সত্য হয়ে ওঠে আধুনিক তরুণী শম্পার মধ্যে। শম্পা তার জীবনের সর্বস্বের বিনিময়ে ভালবাসাকে মূল্য প্রদান করে। নর-নারীর প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এরিক ফ্রম তার *Art of loving* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"কাহাকেও ভালোবাসার অর্থ নিজেকে তাহার জন্য বিনা-সত্বে, বিনা-দাবীতে বিলাইয়া দেওয়া। নিজেকে এই বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া বিলাইয়া দেওয়া যে আমার প্রেম প্রেমাস্পদের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার করিবে। প্রেম বিশ্বাসের বস্তু।প্রেম একপ্রকার তৎপরতা বা সক্রিয়তা; আমি যদি কাহাকেও ভালোবাসি আমি আমার প্রেমাস্পদের ব্যাপারে সতত সক্রিয়রূপে আগ্রহী ও মনোযোগী থাকিতে বাধ্য; কিন্তু কেবল তাহার ব্যাপারেই আগ্রহী ও মনোযোগী থাকিলেই চলে না।"[৮]

"ভালবাসা পাইতে গেলে এবং ভালবাসা দিতে গেলে সাহস দরকার, কতগুলি মানবিক মূল্য বা গুণকে চরমতম বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া সেগুলি রক্ষার জন্য সবকিছু হারাইয়া এদিক ওদিক না তাকাইয়া ঝম্প প্রদান করিবার সাহস প্রয়োজন।"[৯] লেখক আশাপূর্ণা দেবী নারীপ্রগতির পক্ষে থাকলেও প্রগতির নামে স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপনের বিপক্ষে ছিলেন। নমিতা, সত্যভামার স্বেচ্ছাচারিতার শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে। আর শম্পার জীবনে আরোপ করেছেন অশেষ যন্ত্রণা এবং শেষপর্যন্ত তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন পারিবারিক নিরাপত্তা ও স্নেহের গণ্ডীর মধ্যে।

লেখক আশাপূর্ণা দেবী *বকুলকথা*-য় ভালবাসার উত্তরণ দেখিয়েছেন। বকুল ব্যক্তিগত ভালবাসার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে নিজের ভালবাসাকে বিকশিত করেছে। শম্পার প্রেমের গতিবেগ দেখে বকুলের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বকুলের বই পড়াকে সবাই খারাপ চোখে দেখতো। বাবা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মন্তব্য করত—'তিন পুরুষের একই রোগ। অথচ এ যুগের মেয়েরা কেবল বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়াই করে না, তারা সাঁতারের স্কুলে গিয়ে সাঁতার শেখে, নাচের স্কুলে গিয়ে নাচ শেখে, সংস্কৃতির সকল অঙ্গনে নির্দ্বিধায় বিচরণ করে। পুরুষের সঙ্গে তাল রেখে সাইকেলে চড়ে দেশভ্রমণে বের হয়। অথচ কি নিষ্ঠুর ছিল বকুলের যুগ, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি গেলেই নানা কটু কথা শুনতে হতো। বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে নারীশিক্ষা অর্থনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ দিতে পেরেছে।

সমাজে অবিবাহিত মেয়ের বাবাকে এখন আর কেউ একঘরে করে না। অথচ বকুলের যুগে ...''বকুল দশ এগারো বছর বয়স থেকেই শুনে আসছে—"ধাড়ি মেয়ে, তোমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবার এত কি দরকার? ধিঙ্গী অবতার। এ বাড়ি ও বাড়ি বেড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছে। যাও না সংসারের

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করগে না।...বড়দার ঐ শাসনবাণীর মধ্যে যেন হিত চেষ্টার চাইতে আক্রোশটাই প্রকট ছিল। পাশের বাড়ির ওই নির্মলটার যে এ বাড়ির 'বকুল' নামের মেয়েটার প্রতি বেশ একটু দুর্বলতা আছে, সে সত্য বড়দার চোখে ধরা পড়তে দেরি হয়নি। অতএব এদিক ওদিক কিছু দেখলেই বড়দার দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত 'সনাতনী রক্ত' উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং শাসনের মাত্রা চরে উঠতো। [*বকুলকথা*, পৃ.৩৪]

বকুলের প্রেম শেষ অবধি অঙ্কুরিত হতে পারেনি। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা হয়ে অবিচলভাবে সাহিত্য সাধনা করে চলে অনামকা দেবী তথা বকুল।

আশাপূর্ণা দেবী সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে নতুন ও পুরনোর সংঘাত প্রত্যক্ষ করেছেন। একদল ক্রমাগত সমাজের প্রচলিত সমস্ত রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে। আর একদল প্রাণপণ চেষ্টা করছে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা আঁকড়ে ধরে রাখতে। একই বাড়ির এক অংশে প্রগতির নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন, আবার অন্য অংশে দেখা যায় প্রাচীন রীতিনীতির চর্চা অব্যাহত। সাহিত্যেও নতুন-পুরানোর এই দ্বন্দ্ব ছায়া ফেলে। বর্তমান যুগ দ্রুত লয়ে সম্মুখে ধাবিত। এ যুগের স্পষ্ট চেহারা আঁকা প্রায় অসম্ভব। "নতুন যুগের সাথে আসে নতুন ভাষা, নতুন শব্দ, নতুন আঙ্গিক। চিরকালীন আসে ইহকালীনের বেশে। নতুন যুগের নতুন লেখক, অনেক অন্ধকার, অনেক গভীর অরণ্য, অনেক জটিল জাল রচনা করে, আবার সে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে গভীর অরণ্য অতিক্রম করে, বিধ্বস্ত মানবতাকে পরাজয়ের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে আলোর দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করিয়ে বলে ওঠে, 'মানুষের ধ্বংস নেই। মানবিকতার বিনষ্টি নেই, হৃদয়ের মৃত্যু নেই।' প্রত্যয়ী কলমের বিশ্বস্ত ঘোষণা আশা আনে; আশ্বাস আনে।"[১০]

আধুনিক যুগ অস্থিরচিত্ত, সময়ও চঞ্চল, ধী-শীলতায় স্থিত হবার কোন অবকাশ নেই। এ সময় সৃষ্টিশীল হওয়ার মত আত্মমগ্নতার পরিবেশ প্রতিমুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ভেঙে যাচ্ছে অখণ্ড চিন্তাচেতনার ভাবমূর্তি। *বকুলকথায়* আশাপূর্ণা দেবী অতীত স্মৃতিচারণায় বারবার যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে উনিশ শতকের শেষ সময়পটের। *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, *সুবর্ণলতার* কাহিনীবিন্যাসে লেখক পরিবর্তমান সময়ের বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক উত্তাল দ্রুতগতিসম্পন্ন সমাজ প্রতিবেশে নরনারীর চিত্তচাঞ্চল্য ও মানসিক পট পরিবর্তনের চিত্র রূপায়িত করেছেন।

তথ্যনির্দেশিকা

১. তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, রেডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ৫০

২. আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা*, দে'জ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১ কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১১

৩. আশাপূর্ণা দেবী, *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, অষ্টাত্রিংশৎ মুদ্রণ, চৈত্র ১৪০৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ভূমিকা অংশ।

৪. অনিল কুমার সিংহ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার*, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ সংখ্যা।

৫. হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ৩৬০

৬. সুকুমারী ভট্টাচার্য, *বিবাহ প্রসঙ্গে*, ক্যাম্প প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বই মেলা ১৯৯৬, পৃ. ৪৫

৭. হুমায়ুন আজাদ, তদেব, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

৮. এরিক ফ্রম, *প্রেম ও দার্শনিক বিচার*, অনুবাদ : জিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, সম্পাদনা হারুণ রশিদ ভুইয়া, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬, পৃ. ৭২

৯. তদেব, পৃ. ৭২

১০. আশাপূর্ণা দেবী, তদেব, পৃ. ১৫৭

১১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সেই সময়* (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, একাদশ মুদ্রণ ১৪০২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
ত্রয়ী উপন্যাসে নারী জীবনের রূপায়ণ-কৌশল

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস *প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা* ও *বকুলকথা*-কে উপন্যাসের রূপতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ট্রিলজি (Trilogy) বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন সাহিত্যে Trilogy শব্দটি প্রধানত নাট্যাঙ্গিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হত। তিনটি পৃথক পৃথক নাটকের একত্রে উপস্থাপনার গ্রীক নাট্যধারার এই অতি-প্রাচীন অভিধাটি উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। তখন দুই বা তিন খণ্ডে উপন্যাস রচনার রীতি ছিল যার প্রেরণা ছিল 'সাগা'। কোন উদ্দেশ্য বা বর্ণনা ব্যতিরেকে কোন কাহিনী বা গদ্যে রচিত ইতিহাসধর্মী রচনাকে মধ্যযুগে আইসল্যান্ডে 'সাগা' বলা হত, আবার সাধুসন্তদের জীবনী, ধর্ম নিরপেক্ষ কাহিনীকেও 'সাগা' নামে অভিহিত করা হত। তবে বিশেষ অর্থে 'সাগা' ছিল কিংবদন্তী বা ইতিহাসমূলক ফিকশন যেখানে রচয়িতা অতীতকে পুনর্গঠিত ও কল্পিত রূপের মধ্যে ধারণ করতেন। নানা ধরনের 'সাগা' লিখিত হত, যেমন-রাজাদের, পৌরাণিক উপন্যাসের, পারিবারিক বা বংশ-পরম্পরা।

জন গলস্ওয়ার্দির (১৮৬৭-১৯০৩) *Forsyte Saga*-এ লক্ষ্য করা যায় পুরাতন প্রজন্মের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের বৈসাদৃশ্য। নিউনিদ সলোভিয়াদ বা গোর্কির রচিত সাগার দৃষ্টান্ত রয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাগার এই ধারাই ট্রিলজি—ত্রয়ী উপন্যাস রূপে অভিহিত। বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকে ট্রিলজি রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায় প্রথমত রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) উপন্যাসে। তাঁর *যোগাযোগ* (১৯২৯) তিন পুরুষের কাহিনী পরম্পরা হিসেবে উপস্থাপনার সংকল্প নিয়ে রচিত, যদিও রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত ট্রিলজি রচনা করেননি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *পথের পাঁচালি, অপরাজিতা* ও *কাজল*-কে ট্রিলজি বলা হয়ে থাকে। এই তিন খণ্ডে তিনি 'অপু' নামক চরিত্রটির—(যা এক অর্থে বিভূতিভূষণের লেখক সত্তারই প্রতিভূ চরিত্র) জন্ম, বিবর্তন ও পরবর্তী প্রজন্মের দেশকাল-চেতনাগত পরম্পরা রচনা করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭২) *কীর্তিহাটের কড়চা* নামের চার খণ্ড উপন্যাসেও আট পুরুষের বৃত্তান্ত উপস্থাপিত, তবে একটি খণ্ড অতিরিক্ত থাকায় এটিকে ট্রিলজি বলা যায় না। এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ট্রিলজি রচনা হিসেবে যেসব উপন্যাস গ্রহণযোগ্য সেগুলি হল গোপাল হালদার রচিত *ত্রিদিবা* (একদা অন্যদিন-আরেকদিন শিরোনামে প্রকাশিত), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহানা*, সরোজকুমার রায় চৌধুরীর *ময়ূরাক্ষী*, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের *কলকাতার কাছেই-উপকণ্ঠে-পৌষ ফাগুনের পালা* ইত্যাদি। বংশ বা ব্যক্তির প্রজন্মান্তর ছাড়াও শুধুমাত্র কোন বিষয় বা ঘটনাকেন্দ্রিক ট্রিলজিও রচিত হয়েছে, যেমন গোপাল হালদারের মন্বন্তর-কেন্দ্রিক ত্রয়ী উপন্যাস *পঞ্চাশের পথ-উনপঞ্চাশী-তেরশ পঞ্চাশ*। এখানে মন্বন্তরই উপন্যাসত্রয়ীর নায়ক। আশাপূর্ণা দেবীই প্রথম নারী ঔপন্যাসিক যিনি নারীজীবন-অবলম্বী তিন প্রজন্মের কাহিনী রচনা করেছেন। আমাদের আলোচনায় 'ট্রিলজি' শব্দটিকে ত্রয়ী উপন্যাস নামে অভিহিত করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে যে তিন নারীচরিত্রের জীবনরূপ ও রূপান্তরিত সত্তার মুক্তি ও উত্তরণের কাহিনী বর্ণিত, তা দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিজীবনেরই 'রূপান্বিত রূপক'। আর তাতে স্রষ্টা আশাপূর্ণা দেবীর ব্যক্তিমনের ও আত্মজৈবনিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুত "স্রষ্টার জীবনসংক্রান্ত বোধ ও অভিজ্ঞতার মানসিক রূপই অখণ্ড উপন্যাসের মধ্যে প্রবাহিত হয়। সুতরাং কোন উপন্যাসের স্বরূপ বা প্যাটার্ন নির্ভরশীল স্রষ্টার জীবন-দর্শনের ওপর। আমাদের বিচার্য বিষয় হলো যে, লেখকের কোন উদ্দিষ্ট প্রয়াস সমগ্রতাবোধে অখণ্ডিত কিনা, চরিত্রবিকাশে কার্যকারণসূত্র আগাগোড়া প্রয়োগসূত্র অনুসারে রক্ষিত হয়েছে কিনা। সর্বোপরি জীবনসৃষ্টি হয়েছে কিনা, যা আমাদেরকে বাস্তবানুগ সত্যবিশ্বাসে আন্দোলিত করতে পারে।[১] ত্রয়ী উপন্যাসের দীর্ঘ আখ্যান-পরম্পরার ক্ষেত্রে এই অখণ্ডিত সমগ্রতাবোধ-অন্বিত কাহিনীকাঠামো, চরিত্রবিকাশের কার্যকারণসূত্র ও নারীজীবনসৃষ্টির (যেহেতু উপন্যাস নয় নারী জীবন-কেন্দ্রিক) সত্যতা কতটুকু ও কীভাবে রক্ষিত ও বিন্যস্ত হয়েছে তা নিরীক্ষণ করাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কাহিনীর উৎস ও বিন্যাস-পরিকল্পনা

আশাপূর্ণা দেবী ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন দু'টি উৎস-ক্ষেত্র থেকে, এক স্মৃতিনির্ভরতার পঠন-পাঠন সূত্রে, দুই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে। ভারতবর্ষের উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় অন্তঃ-পুরিকাদের জীবনরূপ চিত্রণে তিনি প্রথম উপন্যাস *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-তে অবলম্বন করেছেন পঠন-পাঠনসূত্র ও অগ্রজজনের কাছ থেকে শোনা নারীদের জীবনকাহিনী। তবে, প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতাই কাহিনী নির্মাণের মুখ্য উৎসস্বরূপ। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আশাপূর্ণা দেবীর মন্তব্য—"...সবাই উঠে এসেছে আমার জীবনের পারিপার্শ্বিক পটভূমি থেকে। যা লিখেছি আমার দেখা মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডি থেকেই দেখা, চিরদিন দেখেছি আপাতদৃষ্টিতে যাকে সুখী মনে হয় সে হয়তো আদৌ সুখী নয়। আবার যাকে নেহাৎ দুঃখী মনে হয় সে সত্যিকারের দুঃখী নয়। বাইরের চেহারা আর ভেতরের চেহারা দুটোর মধ্যে হয়তো আকাশ পাতাল তফাৎ। সেটাই অনেক সময় আমার লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়।"[২]

বিগত তিনটি যুগকে ত্রয়ী উপন্যাসে ধারণের যে প্রয়াস লক্ষণীয় তার মূল প্রেরণা লেখকের 'নিজেকে প্রকাশ' করার নান্দনিক এষণাজাত, এবং নারী হিসেবে নিরুচ্চার প্রতিবাদকে বাঙ্ময় করার বিকল্প সাধনা। সত্যবতীর চরিত্রটি তাঁর ওই প্রতিবাদেরই প্রতিমূর্তি। নিজের রচনা সম্পর্কে বিশেষত কাহিনীর উৎস বিষয়ে তিনি বলেন, '*সুবর্ণলতার* সমাজটাকে অবশ্য দেখেছি বাল্য-শৈশবে। আমাদের বাড়ির এবং মাসতুতো পিসতুতো ইত্যাদিদের ঘরে ঘরে দেখেছি।"[৩] *বকুলকথার* উপাদান আরও বেশি প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাগরিক জীবনক্ষেত্র যেখানে রাজনীতি, সমাজ-পরিবার-সমস্যা ও নারীর বহির্জগৎ-বিচরণের পরিসরটি তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গেই জড়িত। *বকুলকথার* মূল চরিত্র বকুলের মধ্যে স্বয়ং আশাপূর্ণা দেবী ছদ্মনামে অন্তঃপ্রবিষ্ট।

ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসে রচয়িতার গৃহীত প্রকৌশল হচ্ছে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে বর্ণনাপদ্ধতি ও আত্মকথন—দুটো উপায়কেই ব্যবহার করা। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে প্রচলিত কাহিনীবৃত্তের মতোই আশাপূর্ণা দেবী *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-তে অতীতকাল ও ঘটনাকে মূর্ত করেছেন। বর্ণিত জীবনকথাটি যেহেতু অন্দর মহলকে ঘিরেই বেশি আবর্তিত, তাই ঘটনাবৃত্তে আসে বাড়িঘর, রন্ধনশালার পরিসরে চলাফেরার নানা খুঁটিনাটি তথ্যপুঞ্জ। নারীর লেখনীতে বহির্জগতের কর্মচাঞ্চল্য ও জীবনপটের চেয়ে অন্তঃপুরের চলচ্ছবিই

Dhaka University Institutional Repository

বেশি ফোটে বলে এখানে লক্ষ করা যায় ডিটেইলসের মাধ্যমে জীবনানুভব ও অভিজ্ঞতাকে কাহিনীবৃত্তের মূল উপাদান রূপে ব্যবহারের প্রবণতা। *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-তে সময়কাল অনুসারে যে অন্দর মহল ও বঞ্চিত নারীদের অবস্থান তার বর্ণনারীতি ক্রমে অনুপুঙ্খ হয়ে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত :

> নিরামিষ হেঁসেলের দাওয়ায় উঠবার অধিকার সত্যবতীর কেন, বাড়ির কারোরই নেই, কেবলমাত্র যারা নিরামিষে অধিকারী তাদেরই আছে। মেটে দাওয়ায় একপাশে কোনা থেকে খাঁজ কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে, আর সে সিঁড়ি থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া পথ হয়েছে একেবারে 'ঘাট' বরাবর। দীনতারিণী, দীনতারিণীর সেজজা শিবজায়া, দীনতারিণীর দুই ননদ কাশিশ্বরী আর মোক্ষদা—মাত্র এরাই এই পথে পদক্ষেপের অধিকারিণী। ঘড়া নিয়ে ঘাটে যান এবং স্নান সেরে ঘড়া ভরে নিয়ে স্বর্গে উঠে পড়েন। ওই রান্নাঘরের দেয়ালই তাদের কাচাকাপড় শুকোন, কারণ রাত্রে তো আর এ ঘরে রান্নার পাট নেই। ঘর নিকানো কাজেই আর আছুভরা কেউ এসে ঘরে ঢুকবে না। সে কাজ মোক্ষদার। এটো সড়কির ব্যাপারে মোক্ষদা বোধ করি স্বয়ং ভগবানকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। কাজেই সে কাজ নিজের হাতে রাখেন। তাছাড়া মোক্ষদাই সবচেয়ে ছোট। অন্যান্যরা সকলেই তার গুরুজন, অতএব সকলের খাওয়া শেষে তারই ডিউটি।" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ১০) 401856

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটি নারীদৃষ্টিতে ও অভিজ্ঞতায় অবহেলিত একটি অন্দর মহলের জীবনছবি, যেখানে কাহিনীর মূল যে নারীর জীবন্সেই নারীদের বন্দিতা ও সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনযাপনের প্রাত্যহিকতার একঘেয়ে রূপ। এদের জীবন-পরিসরটি 'দাওয়ার বকানা থেকে খাঁজ কেটে সিঁড়ি বানানোর মতই প্যাচালো এবং যার পরিসীমা বড়জোর পুকুরঘাট পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডে গ্রামজীবনের পটধৃত জীবন প্রারম্ভবিন্দু হওয়ায় কাহিনী কিছুটা মন্থর, ঘটনাবৃত্ত সরল ও একরৈখিক, তবে তাতে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয় সংস্কার-চেতনা ও তার বিরুদ্ধে দ্রোহ প্রকাশ করে এবং বালিকা সত্যবতীর প্রকৃতিঘেঁষা জীবনযাপনের দৈনন্দিনতায় উচ্ছলতা প্রকাশে। পরবর্তী পর্যায়ে কাহিনীর পটভূমি স্থানান্তরিত হয় মফস্বল ও কলকাতার নাগরিক বৃত্তে। *সুবর্ণলতা*-র কাহিনীবিন্যাস অনেকাংশে অন্তঃপুরে আবর্তিত হলেও বহির্জগতের আন্দোলন ও তাতে সুবর্ণলতার সংযুক্ত হওয়ার গভীর আকাঙ্ক্ষায় গতিমুখর। পারিবারিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, ব্যক্তিচরিত্রদের নানামাত্রিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংঘর্ষে দ্বন্দ্বরত *সুবর্ণলতার* বৃত্তপরিকল্পনা অনেকখানি বৃত্তাবদ্ধ হয়েও অস্থির (dynamic), বিশেষত অন্তর্লোকের বেদনা ও মুক্তির অভীপ্সাতীব্রতায় এই খণ্ডটি ব্যক্তিমানুষের চিরায়ত গল্পেরই আখ্যান হয়ে উঠেছে। *বকুলকথার* কাহিনীপট আধুনিক কলকাতাকে কেন্দ্র করে বলয়িত। আশাপূর্ণার স্বীকারোক্তি—"বকুলকে আমি ছোটবেলা থেকেই দেখছি, এখনও দেখছি। বরাবরই বলি, 'বকুল, তোমাকে নিয়ে গল্প লেখা যায়।"[৪] অনামিকা দেবীর জবানিতে কাহিনীর যে অন্তর্বয়ন তাতে ব্যবহৃত হয়েছে স্মৃতি, চিঠি ও আত্মকথনের প্রযুক্তি। এবং এটি শেষখণ্ডে বলে এখানে পূববর্তী সভ্যবতী ও সুবর্ণলতার কাহিনী বিন্দুবদ্ধ হয়েছে স্মৃতিতে ও বকুলের জীবনানুভূতিতে। একটি বাড়ি—যাকে বলা যাক অন্তঃপুর—ত্রয়ী উপন্যাসের মূল পরিসরে বকুলেরও কাহিনীমঞ্চ স্থাপিত। নারীত্রয়ের জীবন-পরম্পরায় তার মধ্যেই বিন্দুবদ্ধ হয় নিজেরও জীবনযাত্রা ও সত্তা সংগঠনের অভিযাত্রায়। *বকুলকথায়* রচয়িতা তাই একরৈখিকতা ভেঙে কখনও অতীতে চলে যান, কখনও অনাগত নারীজীবনের পদধ্বনিকে স্বাগত জানান। তবে সময়-পরম্পরা ভেঙে দিয়ে এই বিন্যাস গড়ে উঠলেও যেহেতু গৃহমহলই হচ্ছে কেন্দ্র, তাই আবার কাহিনীকে কেন্দ্রমুখী করে তোলার বয়নরীতিও লক্ষযোগ্য। যে গৃহে নারীর বন্দিতা সেই গৃহগত বৃত্তায়নটি অটুট থাকে যেখানে অভিনীত হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের নারীদের জীবন ও মুক্তিকাঙ্ক্ষা। এই বয়নকাঠামো শেষপর্যন্ত ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনী-পরিকল্পনাকে বহুরৈখিকতায় ছড়িয়ে দিয়েও আবার বৃত্তকেন্দ্রে ফিরিয়ে আনে। একটি দৃষ্টান্ত :

Dhaka University Institutional Repository

কত জন্মমৃত্যুর সাক্ষী, কত উৎসব আর উত্তেজনা, কত সুখ দুঃখের নীরব দর্শক। তার এই চারখানা দেওয়ালের আড়ালে তিনপুরুষ ধরে যে জীবনযাত্রা প্রবাহমান, তার ধারা আপাতদৃষ্টিতে হয়তো স্তিমিত নিরুচ্চার, তবু মাঝে মাঝে সেখানে ঘূর্ণি ওঠে।...হয়তো এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতার সেই চিরবিদ্রোহী গৃহিণী সুবর্ণলতার আত্মার নিষ্ফল বেদনা এর প্রতিটি ইটের পাঁজরে পাঁজরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে বলেই সেই রুদ্ধশ্বাস বিকৃত হয়ে দেখা যায়। তবু এদের নিত্যদিনের চেহারা বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন স্তিমিত। নিত্যদিন ঘড়ির একই সময়ে এদের রান্নাঘর থেকে উনুন ধরানোর চিহ্ন বহন করে ধোঁয়া ওঠে, একই সময়ে চাকর যায় বাজারে, রান্নার শব্দ, বাসন মাজার শব্দ, বাটনা বাটার শব্দ আর মহিলাদের অসন্তোষ এবং অভিযোগেমুখর কণ্ঠের শব্দ জানান দেয়, এরা আছে, এরা থাকবে।

হয়তো পৃথিবীতে এরাই থাকে, যাদের দিন-রাত্রিগুলো একই রকম! শুধু এদের উৎসবের দিনগুলো অন্যরকম, মৃত্যুর দিনগুলো অন্যরকম, সেই অন্যরকমের ছায়া নেমেছে আজ এ বাড়ির আকাশে, বাড়ির একদিকের ঘরে যখন বহুদুঃখ বহু যন্ত্রণা আর বহু প্রত্যাশার শেষে একটি পুনর্মিলনের নাটক অভিনীত হচ্ছে, আর একঘরে তখন বিচ্ছেদের মর্মান্তিক দৃশ্য। মর্মান্তিক, বড় মর্মান্তিক! (*বকুলকথা*, পৃ. ২৯৯)

দীর্ঘ দৃষ্টান্তটি থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাত্যহিকতা ও কালবাহিত জীবনবদ্ধতার বৃত্তকে প্রকটিত করে আশাপূর্ণা দেবী গৃহগত জীবনের ঐতিহাসিক বাস্তবতারই (historical realism) চর্চা করেছেন। সে অর্থে তাকে বলা যায় বাস্তববাদী ধারার স্রষ্টা, কিন্তু তাঁর জীবনদৃষ্টি যেহেতু নারীর— অন্তর্জীবন থেকে মুক্তি ও সৃষ্টিশীল সত্তার প্রশ্নেও উচ্চকিত, তাই ত্রয়ী উপন্যাসে আছে রোম্যান্টিক আশাবাদিতাও।

তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিচেতনা এবং শৈল্পিক সহমর্মিতার অন্তর্স্বরে কাহিনীবৃত্ত হয়ে উঠেছে একদিকে প্রচলিত অখ্যানরূপের অনুসারী, আরেকদিকে সে আখ্যানরূপ ভেঙে নারীর অন্তর্বয়নকলার প্রকাশক। সবচেয়ে বেশি হয়েছে বাস্তববাদী হয়ে ওঠার পরিবর্তে 'সংস্কৃতিধর্মী'। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসত্রয়ে এই 'সংস্কৃতিধর্মিতার'ই জয়।

ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে তিন যুগের তিন নারী। তাঁর উপন্যাস চরিত্রপ্রধান, নিজের উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণার ভাষ্য হল—"গল্প উপন্যাস লেখার সময় আমি চরিত্রই প্রধানত ভাবি। তারপর চরিত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাগুলো একটু একটু করে সাজাতে চেষ্টা করি। অনেক সময় ভাবনার বাইরেও চলে যায় ঘটনাগুলো, চরিত্রটিকে ঠিক রাখতে। মানে আমার মনের মতো রাখতে।...এক এক সময় মনে হয় যে ওদের নিয়ন্তা আমি নই, ওরা আপন ইচ্ছায় নিজের পথে চলে যাচ্ছে।"[৫] অর্থাৎ তাঁর জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতা যেমন চরিত্রকে গড়ে, আবার চরিত্রগুলি কাহিনী-ঘটনাসাপেক্ষে স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়। চরিত্র নির্মাণের প্রসঙ্গটিকে আমরা আশাপূর্ণা দেবীর আত্মকথনে যতটা পাই তারও বেশি পাই *বকুলকথায়* অনামিকা দেবীর স্বীকারোক্তিতে। দৃষ্টান্ত :

ক. "তাঁর এই দীর্ঘকালের লেখকজীবনে অনেকবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। তিনি নাকি তাঁর সব পরিচিতজনদের মধ্য থেকে বেছে বেছে কাউকে অপদস্থ করতে তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা সৃষ্টি করেছেন।" (*বকুলকথা*, পৃ. ৮২)

খ. "আপনার শ্রেষ্ঠ বইগুলির নায়ক-নায়িকার চরিত্র কাকে দেখে লেখা সেটাই অন্ততঃ লিখুন, ওই আত্মকথা'র সিরিজে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।"

ছেলেটি তর্কের সুরে বলে, 'না দেখলে লেখা যায়?'

'কী আশ্চর্য! গল্প উপন্যাস মানেই তো কাল্পনিক। 'ওটা বাজে কথা। সমস্ত ভালো ভালো লেখকদের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলিই লোককে দেখে লেখা। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, বনফুল, দেখুন এঁদের যদি বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

> কিছু না দেখে লিখেছেন...ওকে দেখে মনে হলো যেন অনামিকা ওকে ঠকাতে চেষ্টা করছেন। অনামিকা হাসলেন।
>
> 'কথাটা ঠিক তা নয়।' বললেন অনামিকা, 'দেখতে তো হবেই। দেখার জগৎ থেকেই লেখার জগৎ। আমি শুধু এই কথাই বলছি—আমি অন্ততঃ কোন বিশেষ একজনকে দেখে, ঠিক তাকে এঁকে ফেলতে পারি না। অথবা সেটা আমার হাতে আসেই না। অনেককে দেখে দেখে একজনকে আঁকি, অনেকের "কথা" আহরণ করে একজনের মুখে কথা ফোটাই, আমার পদ্ধতি এই। তাই হয়তো অনেকেই ভেবে বসে, "আমায় নিয়ে লেখা।" তোমরাও খুঁজতে বসো "দেখি কাকে নিয়ে লেখা।" অনামিকা একটু থামেন, তারপর বলেন, 'জানি না কোন একজন মানুষকে যথাযথ রেখে গল্প লেখা যায় কিনা? শ্রীকান্ত কি যথাযথ? কিন্তু সে যাক, অন্যের কথা আমি বলতে পারব না, আমার কথাই আমি বলছি...আমি সবাইকে নিয়েই লিখি, অথবা কাউকে নিয়েই লিখি না।" (*বকুলকথা*, পৃ. ১৬৭-১৬৮)

চরিত্র আহরণ ও নির্মাণের উপরিউক্ত পদ্ধতি স্মরণে রেখে সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল চরিত্রত্রয়কে আমরা বলতে পারি পূর্ণমাত্রিক ও প্রতিভূ চরিত্র। সত্যবতী দ্রোহ ও নিজের নির্জিত সৃজনীসত্তার সূত্রে পূর্ণ বিকশিত এবং গতিশীল, অন্যান্য নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলোকে বলা চলে স্থিরচরিত্র যারা কোন মূল্যবোধ-ভাবাদর্শ, সংসার-বৃত্তি-প্রবৃত্তি চালিত আচার-আচরণে সত্যবতীর বিপ্রতীপ। অধিকারবঞ্চিত, ভাগ্যহীন যেসব নারীচরিত্র আছে তারা স্বল্পপরিসরে উপস্থাপিত—ভুবনেশ্বরী, যশোদা, সৌদামিনী, এলোকেশী, সারদা প্রত্যেকের জীবনই বঞ্চনা ও তজ্জাত ক্রিয়াবিক্রিয়ায় টাইপড; পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রগুলো পরিবার ও পিতৃতন্ত্রের প্রতীকী উপস্থাপনা। কিন্তু তাদের নির্মাত্রিক বা ক্যারিকেচার বলা যাবে না, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব স্বভাব ও ঘটনাচালিত জীবনযাত্রায় জীবন্ত মানুষের সংজ্ঞার্থে উত্তীর্ণ।

সুবর্ণলতায় মূল চরিত্রটি অবরুদ্ধ জীবনযন্ত্রণাসহ আরেক মাত্রায় বিদ্রোহিণী। তার মধ্য দিয়ে রূপান্বিত হয়েছে নারীর রুচিবোধ, বাসনা-বর্ণিল অন্তর্লোক এবং অর্থনৈতিক পরাধীনতার দ্বৈধতা। সুবর্ণলতা সবচেয়ে বেশি ট্র্যাজিক চরিত্র। তাঁর রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা ও অভিরুচির যে চিত্র উপস্থাপিত হয়। তাই *সুবর্ণলতা* উপন্যাসের অন্বিত বিষয়। যদিও গৃহের পরিসরেই তার চলাচল ও আবেগ-কল্পনার বুনন, তাতে নারীরচিত উপন্যাসে চরিত্রবয়নের সৎ ও ঐকান্তিক রূপটি আমরা পাই।

সুবর্ণলতা একথা উচ্চারণ করতে চেয়েছে যে, গৃহগণ্ডির অর্থ অবরোধ নয়, সুস্থ ও রুচিশীলভাবে, সৌন্দর্যময়তায় বেঁচে থাকার জন্যই গৃহ। তার নারীজীবনটি কল্পিত গৃহের সৌন্দর্যেই পরিস্ফুটিত—"এই ভাঙা পচা বাড়িটা ছেড়ে নতুন বাড়িতে গিয়েছে সে, বারান্দার ধারে চমৎকার একখানি ঘর, বড় বড় জানালা, লাল টুকটুকে মেঝে, সেই ঘরটিতে নিজের মনের মত সাজাবে সুবর্ণ। দেয়ালে দেয়ালে ছবি, তাকের উপর ঠাকুর-দেবতার পুতুল, বাক্স-প্যাটরায় ফুলকাটা ঘেরাটোপ, ঝালর দেওয়া বালিশ, ফর্শা বিছানা, সেই ঘরে বসে কাঁথায় ফুল তুলবে সুবর্ণ, চুপি চুপি লুকিয়ে ভবিষ্যতের জন্য।" (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ০৭) এই বর্ণনায় চরিত্রটি প্রতীকী রূপ পায়—সুবর্ণ ভবিষ্যতের জন্য জীবনকাঁথাকে ফুলে ফুলে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিল যা ব্যর্থই হয়েছে। আশাপূর্ণার লেখকদৃষ্টি চরিত্রকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেই প্রতীকায়িত ও প্রতীকী করেন। এ উপন্যাসেও পার্শ্বচরিত্রগুলো নারীর দৃষ্টিতে অবলোকিত ও মূল্যায়িত। সুবর্ণলতার স্বামী ও সন্তান যেহেতু পুরুষস্বভাবের অভব্য ও অজ্ঞতার প্রতীকায়ন, তাই চরিত্রগুলি মূল চরিত্রের বিরোধাভাসক রূপেই বিন্যস্ত। কিন্তু তার সুকঠিন জীবনসত্যে বাস্তব মানুষ হয়ে উঠেছে।

বকুলকথায় মূল চরিত্র বকুল উপন্যাসত্রয়ীর সারমর্মের প্রতিভূ, যে নারী থেকে মানবী চরিত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক আলোকবর্তিকা। স্বভাবে সে অন্তর্মুখী এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে পূর্ব-প্রজন্মের

Dhaka University Institutional Repository

সত্যবতী ও সুবর্ণলতাকে মূল্যায়ন করে বলে সে সর্বজ্ঞ কথক চরিত্রও বটে। আবার 'অনামিকা দেবী' নামে তার যে লেখকজীবন বর্ণিত সেটি আশাপূর্ণা দেবীরই আত্মপ্রক্ষেপ বলে প্রতিবাদী হয়েও 'কোলাহল থেকে রস আহরণ' করে নান্দনিক সত্তার প্রকাশ ঘটায়। তখন তার ব্যক্তিত স্থিতধী ও নারী জীবনের প্রতি সহমর্মিতায় নৈর্ব্যক্তিক। অর্থাৎ বকুল মাত্রিক ও বর্ণগভীর এবং স্থির ও গতিশীল (Static and dynamic) রূপের দ্বৈত প্রকাশ। এ উপন্যাসে কালের নিয়মে সে পায় তার অন্তর্সঙ্গীরূপে পারুলকে যে তারই বোন এবং কবিস্বভাবের অধিকারী। প্রেমের অতৃপ্তি নিবারণে পারুল যে কবিতার আশ্রয় নেয় তাতে বকুলও আত্মসার্থকতার জগৎ খুঁজে পায়। অর্থাৎ বকুল পারুল-দ্বৈতনামের আঙ্গিকে আশাপূর্ণা মূলত একটি নারীসত্তাকেই দৃঢ়ব্যক্তিত্বে প্রতিবাদী, প্রগতিশীল, প্রেমকারুণ্যে অশ্রুসজল কাব্যপ্রাণা করে নির্মাণ করেন। বস্তুত, ত্রয়ী উপন্যাসের মূল চরিত্র চিত্রায়ণে আশাপূর্ণা দেবী "কখনও মাতৃরূপে, কখনও পত্নীরূপে, কখনও সনাতন নারীমূর্তিতে, কখনও বা ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বে ভাস্বর।"[৬]

নারীদের চিত্রিত করেছেন এ সূত্রে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, নারীজীবনের রূপায়ণে তিনি পরিবারতন্ত্রে সংজ্ঞায়িত নারীচরিত্রই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু চরিত্রবিকাশের ক্ষেত্রে তাদেরকে কার্যকারণসূত্রে করেছেন অন্তর্গ্রথিত, আর সে সূত্রগুলো হল কালের পরিবর্তন, অন্তর্ব্যক্তিতার অন্বেষণ, সর্বোপরি জীবন্মুক্তির দাবী। ফলে সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল, পারুল এবং আরেকটি এককালীন আধুনিক প্রতিবাদী দুঃসাহসী চরিত্র শম্পা—প্রত্যেকেই ঔপন্যাসিকের মানসসন্তান—তাঁর ব্যক্তিত্বময়ী মানবী সৃজনের তপস্যার ফল। ত্রয়ী উপন্যাসের নারীরা তাই নারীজীবন থেকে মানবীজীবনে রূপান্তরিত হওয়ার রূপক।

রূপায়ণ-কৌশলের সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয়টি হল "কীভাবে কোন পদ্ধতিতে স্রষ্টা তাঁর মানসরূপকে রূপায়িত করেন। ...পার্সি ল্যুবক তাঁর গ্রন্থে জীবনসৃষ্টি-পদ্ধতিকে (যা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে রূপায়িত হয়) নানাভাবে শ্রেণীকরণ করেছেন—চিত্রানুগ বর্ণনা (Pictorial treatment); দৃশ্যানুগ বর্ণনা (Secnie treatment); নাট্যানুগ বর্ণনা (Dramatic treatment) ইত্যাদি।...কিন্তু ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্টিকর্মে কোন ধরনের পদ্ধতি আরোপ করবেন তা বহুলাংশেই নির্ভরশীল ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের ওপর। ঔপন্যাসিকের বাসনালোক, মানসিক প্রবণতা, কল্পলোকের অভিরুচি ও বৃত্তির ওপর ভিত্তি করেই তা উৎসারিত হয়।"[৭] স্বয়ং আশাপূর্ণা তাঁর রূপায়ণ-পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন—

> "শিল্পী মাত্রেই নিজস্ব মনোভঙ্গির অনুকূলে তার শিল্পের উপকরণ বেছে নেয়। আমার বেছে নেওয়া উপকরণ হচ্ছে—সাধারণ সমাজবদ্ধ ঘরোয়া মানুষ। নিতান্তই সাধারণ, যে সাধারণেরা শুধু প্রাণপাত করে দিনের ঋণ শোধ করে। যে মানুষ তার প্রতিকূল পরিবেশে ভাঙছে, গুঁড়োচ্ছে, মোচড়াচ্ছে, বিকৃত করে ছাড়ছে, তার অপরিতৃপ্ত দুঃসাধ্য বাসনা প্রতিপদে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে ছাড়ছে আর সেই বিদীর্ণ অস্তিত্বের অন্তরালে অবস্থিত এক অমৃতপিপাসু আত্মা জর্জরিত বেদনায় ক্রন্দন করছে। এদের জীবনে রোগশোক দারিদ্র্য আর আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কোনো নাটকীয় ঘটনা বড় একটা ঘটে না; তাই তাদের আত্মার ক্রন্দনধ্বনি কখনই উত্তাল হয়ে বাজে না। শুধু কান পাতলে শোনা যায়। সেই অস্ফুট ধ্বনিটুকুকে পৌঁছে দেওয়াই আমার সাহিত্যধর্ম।"[৮]

আশাপূর্ণার মনোভঙ্গি সহানুভূতিশীল ও একই সঙ্গে প্রতিবাদী বলে তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে দৃশ্যানুগ বর্ণনার প্রাধান্য লক্ষ করি। কেননা তাতে দৈনন্দিন ঘটনাবলির মধ্যেই তিনি নিজের ঐ দুই মনোভাবকে প্রকটিত করেন। নাটকীয়তা খুব বেশি উপন্যাসে নেই, তবে ঘটনার আকস্মিকতা আছে। যেমন সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতার আকস্মিক বিবাহ—যা তারও মায়ের জীবনকে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়, অথবা একটি বারান্দা পাওয়ার প্রত্যাশার আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি। নারীদৃষ্টিসুলভ অনুপুঙ্খ বস্তুবর্ণনায় তিনি সবচেয়ে বেশি

Dhaka University Institutional Repository

সার্থক এবং সেসূত্রে নারীর অন্তর্লোক উন্মোচনের পদ্ধতি হিসাবে নিয়ে আসেন কাব্যানুগ বর্ণনা। আবার তাতে মিশিয়ে দেন প্রত্যাশা ও বঞ্চনা, প্রতারণা-বেদনার প্রতিস্বর। তাঁর উপন্যাসে তাই সংলাপ-উচ্চারণে ও দৃশ্য চিত্রায়ণে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে বেদনাধ্বনি। সে-অর্থে আশাপূর্ণা দেবী ধ্বনিরূপের যে প্রতীকী ব্যবহার ঘটান তাতে জড়িয়ে যায় নৈঃশব্দ্য, বর্ণসুর ও অস্ফুট নানা প্রতিধ্বনি। দৃষ্টান্ত :

ক. এ এক আশ্চর্য সকাল !

যেন এই সকালের আকাশের কোন লুকানো পৃষ্ঠপটে নিথর হয়ে আছে অনেক রহস্য, অনেক আনন্দ, অনেক ভয়। সেই রহস্য আস্তে আস্তে উন্মোচিত হবে। সেই আনন্দ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হাসি হাসবে, অথচ সেই ভয় মুঠোয় চেপে রাখবে সমস্ত সত্তাকে। তাই উচ্ছ্বসিত হতে বাধবে, উল্লসিত হতে বাধবে, যতটা জুটছে তার সবটা গ্রহণ করতে বাধবে। (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২৫৩)

খ. প্রকৃতি শক্তিময়ী, প্রকৃতি ঝড়ের পর আবার স্থিত হতে জানে, মানুষ মোচার খোলার নৌকার মত ভেসে যায়, ডুবে তলিয়ে যায়। (*বকুলকথা*, পৃ.)

প্রথম দৃষ্টান্তে কাব্যময়তা অনুসৃত, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রকৃতির উপমায় মানবজীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির সুরটি প্রতিধ্বনিত। কখনও কখনও তিনি প্রশ্ন করার আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। তাঁর চরিত্রত্রয় বারে বারে প্রশ্ন করে, 'কেন? কেন?' এই কেন—তাঁরও জীবনআঙ্গিকে বারবার উচ্চারিত। তিনি বলেন, "এরূপ মানুষের গড়া সমাজে মানুষের এত দুর্গতি কেন? এত চিন্তা কেন? তুচ্ছের জন্য মানুষ নিজেকে বিকোয় কেন? মেয়েদের সবকিছুতেই এমন অধিকারহীনতা কেন? এসব প্রশ্ন চিরকাল আমায় যন্ত্রণা দিয়েছে, আর এই 'কেন'র উত্তর খুঁজে বের করবার জন্যেও অস্থির করেছে।"[৯]

এইসব অজস্র প্রশ্নবাক্য ও ধ্বনিরূপের প্রযুক্তি হিসাবেই ব্যবহৃত এবং উপন্যাসে একই সঙ্গে চরিত্রের কাঠামো ও ঔপন্যাসিকের প্রেক্ষণবিন্দুর প্রকাশক। অর্থাৎ স্থান-ঘটনা-দৃশ্য অথবা অন্তর্লোকের উন্মোচন দুটোই দৃশ্যানুগ ও অনুভব প্রকাশের ধ্বনিময় প্রযুক্তির সম্মিলিত ব্যবহারে অন্তর্বয়িত।

এই ঔপন্যাসিকের প্রেক্ষণবিন্দু (Point of view) হচ্ছে নিজের নারীঅভিজ্ঞতার আলোকে নারীজীবনের স্বপ্নপূরণের অভিযাত্রাকে প্রত্যক্ষীভূত করা। স্থানজগৎ ও পরিবর্তিত সময়পটে যেহেতু অভিযাত্রাটি প্রতীকায়িত তাই ঔপন্যাসিক গ্রাম, শহর ও অন্তঃপুর এই তিন স্থানেই অবস্থান করে সর্বজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আবার সময়কে ও তাতে বিবর্তিত নারীকে চিত্রিত করেন বলে তাঁর প্রেক্ষণবিন্দুতে ব্যবহৃত হয় অন্তর্দৃষ্টির প্রক্ষেপনেরও (Projection)। নৈর্ব্যক্তিক কথক হয়ে কখনও চরিত্র ঘটনাকে রূপায়িত করেন, কখনও বা নিজেকে প্রক্ষেপ করে সহমর্মিতার রসায়নে চরিত্রের মধ্যে অন্তরীণ হয়ে যান। ফলে সর্বত্র নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়নি, নারীর প্রতি, বিশেষ করে সুবর্ণলতার প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এখানে তিনি সম্পূর্ণত নিজের নারী-অবস্থানটিকে লেখকদৃষ্টির সঙ্গে একীভূত করে ফেলেন।

আধুনিক নারীকেন্দ্রিক বা নারীবাদী উপন্যাসের মধ্যে যে ক্রোধ, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসার একটি বিপরীতক্রম তৈরির প্রয়াস লক্ষ করা যায়, তাঁর প্রেক্ষণবিন্দু অনুরূপ অর্থে চর্চা করে না নারীবাদের একপাক্ষিক মতাদর্শকে। তিনি ক্রোধ-প্রতিবাদ-বিদ্রোহ সত্ত্বেও নারীচরিত্রকে বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে করে তোলেন শ্রীময়ী, সুষমাময়ী এবং ব্যক্তিত্বময়ী, মননশীলা ও সৃজনশীলা। কাজেই নিছক চরিত্রস্রষ্টা না হয়ে আশাপূর্ণা দেবী হয়েছেন জীবনস্রষ্টা, সাবলীল স্বচ্ছতার মুকুরে তাঁর অঙ্কিত নারীরা অশ্রুপাত ও

Dhaka University Institutional Repository

রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে একজন নারী ঔপন্যাসিকের শিল্পসত্তার অহংকৃত ও গৌরবান্বিত প্রকাশরূপেযদিও প্রথাগত রীতি ও পদ্ধতি অনেকাংশেই সেখানে অনুসৃত।

তথ্যনির্দেশিকা

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য, মাওলা ব্রাদার্স*, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯৭

২. আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা*, তদেব, পৃ. ১৭

৩. আশাপূর্ণা দেবী, তদেব, পৃ. ১৭

৪. ঐ, তদেব, পৃ. ১৫

৫. ঐ, তদেব, পৃ. ১৫

৬. কস্তুরী রায়, *তিন নারী, তিন প্রজন্ম, বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক*, তদেব, পৃ. ৪১

৭. সৈয়দ আকরম হোসেন, তদেব, পৃ. ৭০

৮. আশাপূর্ণা দেবী, তদেব, পৃ. ১৯-২০

৯. আশাপূর্ণা দেবী, তদেব, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রয়ী উপন্যাসের ভাষারূপ

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে অনেকে মনে করেছিল এটা মেয়ের ছদ্মনামে কোন পুরুষের রচনা। নারীর কলমে এমন বলিষ্ঠ ভাষা বের হওয়া সম্ভব নয় বলেই তাদের ধারণা। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলেই বোঝা যায়, আশাপূর্ণা দেবীর এই ভাষা নারীর প্রেক্ষণবিন্দু-উৎসারিত জীবনভাষ্য এবং তা প্রাত্যহিক দৈনন্দিনতা থেকে চয়িত। আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, লেখক তাঁর উপন্যাস রচনায় ভাষার একটি বহুতলিক কাঠামো তৈরি করেছেন—যা প্রচলিত ধারাবহ হয়েও নারী-লেখনীর সূত্রে আবার পৃথকও বটে।। কথকের ভাষা, প্রতিটি চরিত্রের নিজের ভাষা এবং চরিত্র ও কথকের দ্বৈত ভাষায় যেমন ত্রয়ী উপন্যাস নির্মিত, তেমনি নারীর বাচন ও উচ্চারণ, অনুভব ও প্রতিবাদের শব্দশৈলীও শিল্পসচেতনতায় সৃষ্ট।

উপন্যাসের ভাষার মধ্য দিয়ে শুধু যে এখানে ঘটনার বর্ণনা এবং চরিত্রের ক্রিয়া ও বক্তব্য উপস্থাপিত হয় তা নয়, সেই ভাষার মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের সমগ্র ব্যক্তিত্বও উদ্‌ঘাটিত হয়। ঔপন্যাসিক যখন ভাষা সৃষ্টি করেন তখন তিনি কেবল অর্থবহ শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করেন তা নয়, তিনি সেইসব বাক্যবদ্ধ শব্দের অন্তর্গত ধ্বনিচিত্র ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে তাঁর উপস্থাপ্য বিষয়ের মধ্যে বর্ণ, সুর ও প্রাণসঞ্চার করেন এবং বক্তব্যবস্তুকে সুন্দর ও রমণীয় করে তোলেন। শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্যে লেখকের মানসিকতা, চিন্তা ও দর্শন এবং তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা ও উদ্দেশ্যও ব্যক্ত হয়।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র অতিক্রান্ত জগতের সৌন্দর্য ও রহস্য আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটন করেছেন। সেজন্য তাঁর ভাষার মধ্যে শব্দের সুগম্ভীর সামরোহ, বাক্যবিন্যাসের অতিবিস্তারিত মহিমা এবং সাজসজ্জা ও অলংকারের অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ তাঁর শিল্পিত ভাষা অপরিচয়ের বিস্ময় ও আনন্দের জগতেই আমাদের নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের আলোকমার্জিত পরিবেশ দেখতে পাই। সেজন্য তাঁর ভাষা ধারালো যুক্তিতে তীক্ষ্ণ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য অলংকারের দীপ্তিতে প্রখর, আবার উপমায় একান্তই ব্যঞ্জনাঋদ্ধ। শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষগুলিকে তাঁর উপন্যাসে এঁকেছেন। সেজন্য তাদের ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত প্রত্যহ ব্যবহৃত মুখের ভাষাই প্রয়োগ করেছেন। তাঁর ভাষা মূলত বর্ণনাধর্মী এবং সংলাপ-বেগে গতিশীল।[১]

অপরদিকে ব্যক্তিস্বভাব ও ভাবাদর্শ অনুসারে নারী-রচিত সাহিত্যে সহজ স্বাভাবিক দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ভাষার পাশাপাশি দার্ঢ্য কঠিন ভাষাও পরিলক্ষিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও সমকালীন নারীর অন্তর্বেদনা, সমাজের প্রচলিত নানা রীতি-নীতির বিরুদ্ধে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁরা বলিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, তেজোদীপ্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন—বেগম রোকেয়া রচিত *পদ্মরাগ* উপন্যাসের ভাষারূপ :

Dhaka University Institutional Repository

১. তুমি এতটা আশা করিলে কেন? তুমিই তো একমাত্র স্নেহভাজন বা চিন্তার বিষয় নহ। যাঁহার হৃদয়ে কেবল একজনের স্থান থাকে, সে তাহাকে ষোল আনা যত্ন দিতে পারে; যাহার চারিজন বন্ধু থাকে, তাহার প্রেমের ভাগ প্রত্যেকের জন্য ততই কম হইয়া পড়ে। হৃদয় সীমাবদ্ধ, তাহার পরিমাণ বাড়িতে পারে না। তুমিই কি প্রেমিকের নিকট এক পয়সা-নাএক পাই পরিমিত স্নেহের অধিক আশা করিতে পার না।[২]

"বর্হিবিশ্বের ভাঙ্গাগড়া কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা উন্মাদনা রোমান্স। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙ্গাগড়ার কাজ?...যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজমানুষের মানসিকতার। ...তবু রচিত ইতিহাসগুলি এই নিভৃত লোকের প্রতি উদাসীন। অন্ত ঃপুর চিরদিনই অবহেলিত।[৩]

আশাপূর্ণা দেবী সেই অবহেলিত অন্তঃপুরের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অন্তঃপুরের নেতিবাচক চরিত্রগুলির উপযোগী সহজ-সরল গার্হস্থ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন—যে ভাষা বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবাহক মাত্র। পরবর্তীকালে নারীরচিত উপন্যাসে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে কাহিনীর পটভূমি, একইসঙ্গে স্থানকাল ও নারীমানসের বিবর্তন ঘটায় ভাষারও বিবর্তন সাধিত হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষা ঘটনাক্ষেত্র, সময়পরম্পরা ও মানসবিবর্তনের ধারায় বিবর্তিত হয়েছে সরলতা থেকে ক্রমজটিলতায়। তবে দৈনন্দিনতাই তাঁর চালচিত্র বলে নারীর প্রেক্ষণ-বিন্দুতে গার্হস্থ্য ভাষাকে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। শৈল্পিক প্রয়োগকৌশলগুণে তাঁর রচনার যে কোন সাধারণ শব্দ অসাধারণ তাৎপর্য বহন করে। বাক্যবিন্যাসে বিশেষত দৃশ্যানুগ বর্ণনায় তিনি শব্দবৈচিত্র্য দিয়ে এক ধরনের গতিশীলতা সঞ্চার করেন। তাঁর ভাষারীতি কথ্য ও তদ্ভব শব্দবহুল হলেও বক্তব্যবিষয়কে গাম্ভীর্য প্রদানের জন্য সংস্কৃত বাক্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :

ক. মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ ...*(প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২৫৫)
খ. গতস্য শোচনা নাস্তি (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২৯৪)
গ. ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্ট মন্দিরে, *(প্রথম প্রতিশ্রুতি, পৃ. ৩৬৮)*
ঘ. অমৃতং বালভাষিতং, (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ১৩২-১৫১)
ঙ. তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভাং- (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ.২২৩)

এরই পাশাপাশি চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনায় তিনি আরও কুশলী ও অকুণ্ঠ। যেমন—

ক. "ছি ছি. কি ঘেন্না! পুরুষের প্রাণ হলে আর ওই স্বর্ণসিঁদুরটুকু জিভে ঠেকিয়েই চোখ খুলতে হত না।" ..."কিন্তু যাই বল, জেটার বৌ খুব খেল্ দেখালো বটে!"..."এইবার শাশুড়ী মাগীর হাতে যা খোয়ার হবে টের পাচ্ছি, মাগীর যা অপমান্যি হয়েছে আজ!"...(*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ১৯)

স্বামীর প্রহারে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান হারানোর যে অভিনয় করেছে এবং এতে পাড়া প্রতিবেশী জেটার মায়ের উপর যে অপমানবাণী বর্ষণ করেছে, এর ফলে জেটার বউয়ের উপর আসন্ন অত্যাচারের কথা চিন্তা করে পাড়া-প্রতিবেশিরা এই মন্তব্য করেছে।

খ. "ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা মেনিমুখো ছোড়া, পায়ে কি তোর জুতো নেই! জুতিয়ে ওর মুখটা যদি জন্মের শোধ ছেঁচে শেষ করে দিতে পারিস, তবে বলি বাপের বেটা বাহাদুর!" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ১৫৪)

সত্যবতীর শাশুড়ি সত্যবতীর সাথে কথায় হেরে পরাজিত হিংস্র জন্তুর ন্যায় হয়ে ওঠে। ছেলে নবকুমারকে নির্দেশ দেয় সত্যবতীকে জুতোপেটা করতে। আশাপূর্ণার লক্ষ্য নারীজীবনের অবমাননার চিত্র অংকন করা। এখানে পারিবারিক জীবনে নারীর চরম অবমাননার চিত্র বিম্বিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যাক বলি শোন, আপস-মীমাংসার কথাই-কইছ, ঘরণী গিন্নী বেটার মা তুমি, অনেকদিন তো সোয়ামীকে ভোগ করলে! ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে চলবে কেন? ওরও অগ্নিসাক্ষী বিয়ে। আমি বলি কি একটা পালা ঠিক কর।" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২২২)

সমাজে নারীর মূল্য কেবল পুরুষের ভোগের মাপকাঠিতে। এই বক্তব্য প্রচারধর্মী না হয়ে সংলাপের মধ্যেই প্রকাশিত হয় কথ্য ও মুখভঙ্গি-অন্বিত ভাষায়।

যাদের জীবন কাটে চার দেয়ালের অন্তরালে, তাদের অধিকাংশ হয় বাল্য-বিধবা নয় স্বামীপরিত্যক্তা। তাদের অন্তরে বঞ্চনার দাহ। এই বঞ্চনার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে আঘাত করে পরস্পরকে। সেই আঘাতেরও একটা নিজস্ব ভাষা আছে—যেটি একান্তই নারীমুখে উচ্চারিত হয়। 'ঘর-শত্তুর', 'নজর-খরা', 'কপালখাকি', 'মুখপোড়া', 'উনুনমুখী'—এরূপ নানা শানিত বিশেষণের আঘাতে তারা একে অপরকে জর্জরিত করে। পুরুষতন্ত্র-নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা যুগপরম্পরায় নারীদের মজ্জাগত। কেউ পুরুষতন্ত্রের নির্ধারিত ছকের বাইরে পা বাড়ালে তাকে নারীরাই তীব্র ভাষায় নিন্দা করে। 'লিখিপড়িউলি বিদ্যেবতী', 'আসপদ্দাওলা' 'উড়নচণ্ডে', 'ধিঙ্গিঅবতার', 'চোপাবাজ, 'দস্যিচাল্লি', 'কথার ধুকড়ি'—এরূপ নানা বিশেষণে ধিক্কার জানানো হয়। আবার এইসব বিশেষণমুখরা নারী তার অন্তরের প্রখরতা ব্যক্ত করে সংযোগমূলক ক্রিয়াপদের সাহায্যেও। 'ঠোনা খাওয়া', 'ভাবনকাটা', 'চোখের মাথা খাওয়া', 'ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করা', বাক্যি হরে যাওয়া', 'বলিহারি যাওয়া'—এসব পদ নারীর মুখনিঃসৃত হলেও পুরুষতন্ত্রের নির্দিষ্ট জীবনযন্ত্রণারই উৎক্ষেপ মাত্র। অন্দরমহলের এসব নারীদের মুখে দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়, কেননা দ্বিরুক্ত শব্দাবলি নারীজীবনের ঘোলাজলে বসবাসের একঘেয়ে একটানা জীবনের ক্লান্তি তুলে ধরে। 'প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকা', 'ড্যাং ড্যাং করে খাওয়া', 'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, 'ফুসফুস গুজগুজ করা' 'শাপমন্যি', 'ক্ষ্যামা-ঘেন্না', 'ন্যাকাহাবা'—এসব ভাষা ব্যবহারে নারীর অন্তরের দাহ সম্প্রকাশিত।

অন্দরমহলে দৈনন্দিন গার্হস্থ্যজীবনে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয় তার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। নারীর এই বাগভঙ্গিমা পুরুষের তুলনায় নারীর রচনায় বেশি স্বচ্ছন্দ। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর চরিত্রের মুখে এসব সংলাপের বহুল ব্যবহার করেছেন। গার্হস্থ্য জীবনের শ্রম থেকে নারীরা সংগ্রহ করে তার বাগ্-ভঙ্গিমা—'পাশ পেড়ে কাটতে যাওয়া'; উনুনের ছাইয়ের সাথে তুলনা করেছে নিজের ভাগ্যকে 'ছাই পোড়া কপাল' কিংবা কথার মাঝে হঠাৎ বলে 'দূর ছাই'। নারী রান্নাঘরে হাঁড়ি-কড়াইয়ের মাঝে থাকতে থাকতে নিজের দুর্ভাগ্যকে হাঁড়ির সাথে তুলনা করে। যেমন–'হাঁড়ির হাল হওয়া' কিংবা 'হাঁড়ি গলায় গেঁথে দেবার লোক'; শুধু তাই নয় নিত্যব্যবহার্য ঝাটা বা কুলোও নারীর সংলাপে উঠে এসেছে ক্রোধ বা বেদনার মূর্ত প্রকাশ রূপে। যেমন–'ঝেটিয়ে বিদায় করা', 'কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা'। আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট নারী চরিত্রের মুখে এমন কিছু ভাষা ব্যবহার করেছেন যা বিশেষ তাৎপর্যবহ। *প্রথম প্রতিশ্রুতি*'র সত্যবতীর প্রথম সন্তান মারা গেলে সবাই বলে সত্য 'ভাঙ্গা' হয়ে গেল, 'অখণ্ড পোয়াতি' আর রইল না। আর তাই কোনো শুভ কাজে তার অধিকার নেই। আবার বাল্য-বিধবা মোক্ষদা ভিতরের দাহে জ্বলেপুড়ে বলে ..."অতিরিক্ত যদি না খাটতাম তো সেই ভূতের মত আঁকাড়া গতর নিয়ে করতাম কি বল? ভিতরের ভূতই রাতদিন ছুটিয়ে মারত।" এসব ভাষা নারীজীবনের অবস্থা ও তাদের মানসিকতার একান্ত প্রকাশরূপ।

ভাষাকে তাৎপর্যবহ করার জন্য স্বরভঙ্গির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গির বিশেষ ব্যবহার লক্ষণীয়। ভঙ্গির ফলে কথক বা চরিত্রের বাণী আরো বেশি সরস হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রেরা কেউ 'খননে' গলায় কথা বলে, কেউ 'তীক্ষ্ণ হুল ফোটানোর সুরে' কথা বলে, আবার কেউ 'হিংস্রস্বরে' কথা বলে। কেউ 'চাকা নথ ঘুরিয়ে ঝংকার দিয়ে' বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলে। *প্রথম প্রতিশ্রুতি*'তে দেখা যায় সত্যবতীর বাবার বাড়ি থেকে দূতি নাপিত ফিরে আসার পর তার শাশুড়ি বৌ কবে আসবে একথা জিজ্ঞেস করলে নাপিত বৌ বলে—

> 'পাঠালে না'।
>
> বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয় গৃহিণীর কণ্ঠ হতে।
>
> 'পাঠাল না!'

এখানে একটিমাত্র বাক্য 'পাঠাল না' কেবল স্বরভঙ্গির কারণে দুটি ভিন্ন তাৎপর্য প্রকাশ করেছে। প্রথমটি প্রশ্ন, দ্বিতীয়টি ক্রোধের প্রকাশক।

প্রথম প্রতিশ্রুতি'র প্রধান চরিত্র সত্যবতী যখন গ্রামীণ সমাজে অবস্থান করছে তখন সে কিছুটা অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেছে।

> ''জন্মে আর ও মুখ দেখছি না! ছি ছি! গেছলাম! বলি আহা, সোয়ামীর শাউড়ীর ভয়ে রোগের ঔষধটুকু পর্যন্ত খেতে পায় না, যাই একবার দেখে আসি কেমন আছে। সেজপিসী তারেকেশ্বর গেছে শুনেছি, মনটা তাতেই আরও খোলসা ছিল। ওমা গিয়ে ঘেন্নায় মরে যাই, কী দুষপিবিত্তি কী দুষপিবিত্তি...
>
> "নিজের সোয়ামী"! সত্য ঝটপট বার-দুই-কুলকুচো করে বলে, ''খ্যারা মারে অমন সোয়ামীর মুখে! যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গপপ? গলায় দিতে দড়ি জোটে না" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ৩৯)।

শিক্ষা এবং পরিবেশগত কারণে সত্যবতীর মুখের ভাষাও অনেক পাল্টে গেছে। ট্রিলজি'র দ্বিতীয় গ্রন্থ *সুবর্ণলতা*'য় সুবর্ণ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কলকাতাবাসী। তাছাড়া শৈশবকালটা মা সত্যবতীর সান্নিধ্যে অতিবাহিত হওয়া এবং গ্রন্থপাঠের প্রতি আসক্ত হওয়ায় তার মুখের ভাষা ভদ্র-মার্জিত।...

ক. সুবর্ণলতা, 'দুর্গা দুর্গা করে উঠে বলে, 'যা নয় তাই মুখে আনা! তার মানে আমায় রাগিয়ে দিয়ে কাজটি পণ্ড করার চেষ্টা। আমি কিন্তু রাগছি না, আমি ''ভবি"। এই তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি সামনে বারান্দা না করলে তোমাদের সে বাড়িতে যাবই না আমি।" (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ৫)

খ. ... 'জানো নাকি? তা তবু তো শায়েস্তা করতে পারলে না আজ অবধি... নাও চলো, এখন দেখো শায়েস্তা করে গুলে দেবে কি ফাঁসি দেবে! এই ভালোমানুষ ছেলেটাকে আর ভয় পাইয়ে দেব না বাপু, পালাই। ...অম্বিকা ঠাকুর পো, ওই পদ্যটা কিন্তু আমার চাই ভাই। একটু কষ্ট করে ওর একটা নকল দিও আমায়।" (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ১৭৯)

বকুলকথা'র কাহিনী যে সময়ে লিখিত তখন যুগটা আরও বেশি এগিয়ে গেছে, ফলে উপন্যাসের ভাষায়ও জীবনের গতিশীলতার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ক. শম্পা সেজেগুজে আনন্দে ছলছল করতে করতে এসে দাঁড়ালো, 'সিনেমা যাচ্ছি পিসি! মার্ভেলাস একখানা বই এনেছে লাইটহাউসে, যাচ্ছি বুঝলে? দেরি হয়ে গেল সাজতে। সেই হতভাগা ছেলেটা টিকিট নিয়ে হাঁ করে বসে আছে তীর্থের কাকের মত, আর বোধ হয় একশো শাপমুন্যি দিচ্ছে। চললাম। মাকে বলে দিও, বুঝলে? (*বকুলকথা*, পৃ. ১৫)

Dhaka University Institutional Repository

খ. পারুল একটু কঠিন মুখে বলে, 'তার মানে যে-কালকে তোরা' 'সেকাল' বলে নাক কোঁচকাতিস, সেকালের থেকে এক পা-ও এগোসনি। তোরাও যে যুগের মতো ছেলেপুলেগুলোকে নিজেদের জিনিসপত্তর" ছাড়া আর কিছুই ভাবিস না। অথচ তোদের খেলনা পুতুল। সেকালেও তো এই ছিল? ওদের মুখে কে চাইতো? ওরা যেন নিজেদের শখ সাধ মেটানোর উপকরণ মাত্র। নিজেদের সুবিধে-অসুবিধের বশেই তাদের ব্যবস্থা কেমন? কিন্তু এযুগে তো তোরা অনেক বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস, ওদের জন্য অনেক ব্যবস্থা অনেক আয়োজন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীটা বদলালো কই? সন্তানের জন্য যে স্বার্থত্যাগের দরকার আছ, জেদ অহঙ্কার ত্যাগের দরকার আছে, তা তো ভাবছিস না তোরা একালের মা-বাপ? তোদের সুবিধের অনুপাতে ওদের জীবনের ছক।" (*বকুলকথা*, পৃ. ২৩৭)

নারী-রচিত সাহিত্য বলেই আশাপূর্ণার রচনায় কেবল আবেগ-উচ্ছ্বাসই প্রবাহিত হয় তা নয়, তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক বিশ্লেষণী ভাষা ব্যবহারে তা আমাদের বাস্তবের মুখোমুখিও দাঁড় করায়। কখনো চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনী এগিয়ে গেছে, আবার কখনো লেখিকা নিজেই কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কাহিনীকে গতিময় করেছেন। যেমন :

ক. সত্য এসে দাঁড়াতেই কথায় ছেদ পড়ল। ঘরের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের চোখ পড়ল তাঁর উপর। মোসাহেব স্ত্রীলিঙ্গ কি আমার জানা নেই, যদি কিছু থাকে তো এঁরা দত্ত গিন্নী তাই। সেই সন্ধ্যালবেলা থেকে অর্থাৎ যখন থেকে দত্ত গিন্নী 'সভা' জাঁকিয়ে বসেছেন, তখন থেকে এঁরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন এবং চাটুকারের প্রতিযোগিতা চালাচ্ছেন।" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২৭৪)

এখানে কথকের ভাষা ব্যবহৃত এবং তা ঘটনা ও দৃশ্যকে—সত্যবতীর আগমন ও গিন্নিদের চরিত্র ও অবস্থানচিত্রটি রূপায়িত করছে।

খ. নারীজাতি যতই অবলা কোমলা হোক, স্বক্ষেত্রে সে বাঘিনী! আর ইচ্ছাপূরণের অভাব ঘটলে ফণাধরা নাগিনী হয়ে উঠতেও পিছপা নয়। শান্তিকামী পুরুষজাতি যতক্ষণ না এটা ধরতে পারে, সংঘর্ষ বাধে, ততক্ষণ মনে করে এটা যেন নেব না, অবস্থা আয়ত্তে আনা অসম্ভব হয়। অথচ একবার বশ্যতা স্বীকার করলেই মিটে গেল গোল। কিসে তুষ্ট ধরতে পারলেই বিশ্বশান্তি।" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ৩৫৩)

কখনও ছোট ছোট বাক্যে জীবনযন্ত্রণার রূপটি চিত্রিত হয়—

গ. অনেক দোলায় দুলছে এখন সুবর্ণ। ন বছরে এসেছে এদের কড়ি, সেই থেকেই স্থিতি, মা নেই, কেউ বা নিয়ে যায়? বাপ সাহসই করেনি। পিসি একটা আছে কাছে-পিঠে, নিয়ে যেতে চেয়েছিল একবার, এরা পাঠায়নি। এরা বলেছে, সে-কুলের সঙ্গে আর সম্পর্ক রেখে আর কাজ নেই।' বাপ দেখতে আসে মাঝে মধ্যেই ওই ঢের। তাও তো এদের নিয়েই থাকতে হবে সুবর্ণকে, তাই এদের মানুষ করে তুলতে ইচ্ছে করে সুবর্ণর। ইচ্ছে করে এরা শৌখিন হোক, সভ্য হোক, রুচি পছন্দর মানে বুঝুক, এদের নিয়ে সুন্দর করে সংসার করবে সুবর্ণ। (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ৭)

প্রাত্যহিক জীবনের উপমাও সহজভাবে উঠে আসে বস্তুজগৎ ও নারীদের বিশেষ মনোভঙ্গি থেকে—

ঘ. বাড়ি বাজার আর অফিস এই ত্রিভুজ তাতে আনাগোনা করতে মরচে পড়ে গেছে এদের জীবনের মাকুটা। এঁরাই সুবর্ণলতার স্বামীর বন্ধু।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই 'অফিসবাবু'র দল কি এযুগে নিশ্চিত হয়ে গেছে? আজকের পৃথিবীর এই দুরন্ত কর্মচক্রে দুর্বার গতির তাড়নের মাঝখানেও অলস গতি আর অসাড় আভ্ভা নিয়ে আজও কি টিকে নেই তাঁরা? আজও তাদের জানার জগতে শুধু এই কথাই নেই 'মেয়েমানুষ' জাতটাকে ব্যঙ্গের আর অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে হয়। তারা পানের পাশে চুন রাখতে ভুলে গেলে তাদের সমঝে দিতে হয়, আছে। ওরা যে 'আধুনিক' নন, এই ওঁদের অহমিকা, এই ওঁদের গৌরব।' (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ১১৬)

Dhaka University Institutional Repository

কখনও আশাপূর্ণা দেবী দীর্ঘ বাক্যপ্রবাহে জীবন, সময় ও ভাবাদর্শের সমন্বয় ঘটান—

ঙ. না, এযুগে সে যুগের কোন স্পষ্ট অবয়ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথাও সে দুরন্ত সংহারের মূর্তি নিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দিচ্ছে বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারগুলি, উড়িয়ে দিচ্ছে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি, অভ্যস্ত ধ্যান-ধারণার অবলেহনগুলি, আবার কোথাও সে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মতো আজও তার বহু সংস্কারে বোঝাই ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে শিকড় গেড়ে বসে 'পাপপুণ্য', 'ভালোমন্দ', 'ইহলোক-পরলোকে'র চিরাচরিত খাজনা যুগিয়ে চলছে।' (*বকুলকথা*, পৃ. ৫৪)

তিনি একই শব্দ দু'বার ব্যবহার করে মনের দু'টি অবস্থাকে চিত্রিত করেন দক্ষতার সঙ্গে—

চ. শম্পার মার এই ভিতরে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া মনটা বাইরে শক্ত হয়ে থাকবার সাধনায় আরো গুঁড়ো হচ্ছিলো, তাই বুঝি মনে মনে একান্তভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল, বকুল তাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মেয়েটাকে নিয়ে আসে।' (*বকুলকথা*, পৃ. ২১৭)

মেয়েলি ছড়া, প্রবাদ, উপমা ব্যবহারে আশাপূর্ণা দেবীর শব্দভাণ্ডার বৃহৎ ও যথাযথ। বস্তুত নারী-রচিত উপন্যাসে ইত্যাকার শব্দাবলি ব্যবহৃত হওয়ায় তা বাংলাভাষার ঐশ্বর্যকেই সংরক্ষণ করছে। যেমন— ছড়া ব্যবহার করে তিনি এই হারিয়ে-যাওয়া আঙ্গিককে রক্ষা করেন, যে আঙ্গিকটি অনেকাংশে ছিল নারীদের দ্বারা সৃষ্ট।

ক. জটাদাদা, পা গোদা
যেন ভোঁদা হাতী,
বৌ-ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারুক লাথি।
জটা জটা পেট মোটা...
ভাত মারবার ধাড়ি,
দেখব মজা কেমন সাজা
যাও না শ্বশুরবাড়ি।" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২৮)

হারিয়ে-যাওয়া ব্রতগানের আঙ্গিকও ব্যবহৃত হয় উপন্যাসের গদ্যকায়ায়।

খ. "এসো মা জননী দুর্গে ত্রিনয়ণী,
এসো এসো শিবজায়া,
সন্তানের ঘরে এলো দয়া করে,
মহেশ্বরী মহামায়া!
তোমারে হেরিতে আশা ভরা চিতে
রয়েছি আকুল হয়ে
আসিবে মা তুমি এই মর্ত্যভূমি,
পুত্রকন্যা সাথে লয়ে।
একটি বৎসর শূন্য আছে ঘর
দুঃখে আছি নিরবধি
দিবস রজনী কাটে দিন গুনি,
কবে দিন দেবে।"
(*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ১১৪-১১৫)

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতার বর্ণচিত্রে নারীর ভাষা কীভাবে হয়ে ওঠে concrete, তার দৃষ্টান্ত।

গ. মেয়েলি বিয়োলাম, জামাইকে দিলাম
বেটা বিয়োলাম বৌকে দিলাম,
আপনি হলাম বাঁদী,
ইচ্ছে হয় যে, দুয়োরে বসে
ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদি! (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ১৯)

ঘ. যার সঙ্গে ঘর করিনি
সে-ই বড় ঘরণী,
যার হাতে খাইনি,
সে-ই বড় রাঁধুনী। (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ৪৮)

উপমা-রূপকাদি

প্রেক্ষণ-বিন্দু, অভিজ্ঞতার জগৎ ও পঠন-পাঠনসূত্রে ভাষায় উপমা-রূপকাদির প্রয়োগ ঘটে। রুদ্ধ অথবা মুক্ত জীবনচিত্র, কমেডি অথবা ট্র্যাজেডির রসাশ্রয় এইসব উপমা-রূপকের দেহরূপ তথা মূর্ততা নির্মাণ করে। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ট্রিলজিতে একাধিকবার 'পাখির' উপমা ব্যবহার করেছেন। নারীর অসহায় বন্দিদশার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে, তিনি খাঁচার পাখির প্রতিতুলনা দেন। নারীর পারিবারিক জীবনপরিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপায়ণের ক্ষেত্রে পাখি উপমাটি বহু ব্যবহৃত হওয়ায় এটি শেষপর্যন্ত প্রতীকে উত্তীর্ণ হয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক. আজকে শুধু জলের উপর দাঁড়টানার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। উন্মুক্ত গঙ্গাবক্ষের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন রামকালী।

আকাশের পাখিটা খাঁচায় বন্দী হয়ে কেমন আছে কে জানে! পুণ্যিটার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

গত ক-মাস 'আকাল" ছিল বলে বিয়ে হয়নি। কিন্তু পুণ্যি অন্য ধরনের মেয়ে। নেহাৎ সত্যর "প্রজা" হিসেবে দস্যিচাল্লি করে বেড়িয়েছে, নচেৎ একান্তই ঘরসংসারী মেয়ে সে। খাঁচার পাখি হয়ে জন্মেছে পুণ্যি আর পুণ্যির যত মেয়েরা। (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ১৫৯)

এখানে 'খাঁচার পাখি'র উপমা দিয়ে একই সঙ্গে সত্যবতীর উন্মুক্ত পৃথিবীর আলোর প্রত্যাশী সত্তার খাঁচারূপ শ্বশুড়বাড়ির বন্দিজীবনের কথা অপরদিকে পুণ্যির মত মেয়েদের স্বেচ্ছায় খাঁচার পাখি হওয়া—নারীর এই দুই মানসিক বৈপরীত্য পরিস্ফুটিত হয়েছে।

খ. না, আমিতো কিছুই বুঝবো না। যত বোঝার কর্তা তুমি। বাসা-কাসা বদলানো হবে না, বারে বারে এক কেত্তন! পাখি-পক্ষী নাকি যে রাতদিন বাসা বদলাবো? হবে না বলে দিচ্ছি...ব্যাস। (তদেব, পৃ. ২৮২)

ঘরকুনো স্বভাবের নবকুমার জীবনের গতিচাঞ্চল্যের বিপরীত, অথচ সত্যবতী সদাচঞ্চল। স্থবিরতাকে সে ঘৃণা করে, জীবনের গতিচাঞ্চল্যের মধ্যেই সত্যবতী সুখ খুঁজে যায়। ফলে এখানে পাখী-পক্ষী ব্যবহৃত হয়েছে অস্থির স্বভাবের সূত্রে, অর্থাৎ ক. দৃষ্টান্তের বিপরীত অর্থে।

গ. সত্য স্থির স্বরে বলে, "আর একদিন তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম, আজ আবার দিচ্ছি, কীল খাওয়া কেন জান?' মানুষ জাতটা 'মানুষ' বলে। গরু-গাধা, পাখী-পক্ষী নয় বলে। (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. সন্দেহ-ব্যাতিকগ্রস্ত মেজ ভাইকে মাঝে মাঝেই বকে সে, "কী যে বলিস পাগলের মতন! মানুষ কি খাঁচার পাখি যে রাতদিন বন্ধ থাকবে?... (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ৩৬৭)

এখানে নারীর বন্দিজীবন থেকে মুক্তিলাভের ব্যাকুলতা ও অভিজ্ঞান—দুটোই প্রকাশ পেয়েছে।

ঙ. অনেকক্ষণ পরে যখন উড়ন্ত ধুলোও নিথর হয়ে গেল তখন ফিরে এল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বললে, 'বেটা ছেলের কোন বন্ধন নেই, বিয়ে করবো না তো করবো না। ঘর ছেড়ে চলে যাবে তো চলে যাবে! ব্যাস! নিন্দের কিছু নেই। পোড়া মেয়েমানুষের সকল পথ বন্ধ! আমাদের মেজো বৌটা যদি বেটা ছেলে হতো, সে বোধ হয় এই রকমই হতো, বিয়ে করতো না সংসার থাকতো না, মেয়েমানুষ, বনিজাত, খাঁচার মধ্যে ডানা ঝটপটানি। (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ২৮০)

সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানগত বৈপরীত্য লেখক 'খাঁচার পাখি'র উপমায় ব্যক্ত করেছেন। মুক্ত পৃথিবীর আলোর জন্য সুবর্ণলতার যে ব্যর্থ প্রয়াস তারই চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

চ. কিন্তু সুবর্ণলতার স্মৃতির পৃষ্ঠায় কবিতা লেখার দিনের স্মৃতি কই? তার পাতায় পাতায় খাঁচার পাখির ডানা ঝটপটানির শব্দটাই তো প্রখর।...

হয়তো ঘরের প্রকৃত মালিক শাসন করে করে 'এলে' গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নইলে কিশোরী সুবর্ণলতার স্মৃতির ইতিহাসে তার বই কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা, পুড়িয়ে দেওয়া, সবকিছুর নজিরই তো আছে। শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েছে। অথবা হয়তো দেখেছে, এতেই পাখিটা ঝটপটায় কম।

আরো পাখি তো আছে এ-বাড়ির খাঁচায়, কই তারা তো এমন করে না, বরং তারা আড়ালে বলাবলি করে, ধন্যি বেহায়া মেয়েমানুষ বাবা, এত অপমানের পরেও আবার সেই কাজ।...(তদেব, পৃ. ৩২২)

সুবর্ণলতার মানস-গঠন ভিন্ন প্রকৃতির। আর দশটা নারীর মত প্রচলিত অবস্থার স্রোতে গা ভাসিয়ে সে চলতে অভ্যস্ত নয়। প্রতি মুহূর্তে সুবর্ণলতা বন্দিত্বের বন্ধন মোচনের জন্য উদ্বেলিত। কিন্তু মুক্তির স্বাদ সে কখনও পায়নি। পেয়েছে কেবল অপমান, লাঞ্ছনা।

ছ. কিন্তু এসব কবেকার কথা? খাঁচার পাখির এই ডানা ঝটপটানির কাহিনী!... কিন্তু খাঁচার পাখির ডানা ঝটপটানোর বাইরের বৃহৎ পৃথিবী তো স্থির হয়ে থাকে না।

খাঁচার পাখি আকাশের দিকে চোখ মেলে আর্তনাদ করে, পাখির মালিক খাঁচার শিক শক্ত করতে চেষ্টা করে, বৃহৎ পৃথিবী তাকে উপহাস করে এগিয়ে যায়, আকাশকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলবার দুঃসাহসে হাত বাড়ায়...কবিতাশিল্পীরা নিঃশব্দে আপন মনে অচলায়তন ভাঙার কাজ করে চলে, বিচারকের গাইতির ঘা পড়ে, তার মধ্য দিয়ে সমাজমন অবিরাম ভাঙা-গড়ার পথে দ্রুত ধাবিত হতে থাকে। (তদেব, পৃ. ৩২৪)

নারী তার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। কিন্তু বন্ধন এত দৃঢ় যে, সেই অচলায়তন ভেঙে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। এতে কেবল শক্তির ক্ষয় হয়। ফলে 'পাখী' প্রতীকটি বহুমাত্রিক তাৎপর্যে হয়ে উঠেছে উপন্যাসের ভাষার অলংকার নয়, আঙ্গিকও।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনা বর্ণনায় বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছেন। *প্রথম প্রতিশ্রুতি* উপন্যাসে রামকালীর পারিবারিক বিপর্যয় 'কালবৈশাখী ঝড়ে'র উপমায় বিধৃত। শ্বশুরবাড়িকে 'যমের

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ির' সঙ্গে তুলনা করার দৃষ্টান্তও সুলভ। আবার *প্রথম প্রতিশ্রুতি*র সারদার সতীনযন্ত্রণার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কথকের নীরব ভাষায় উচ্চারিত হয় বেদনাধ্বনি..."সতীন যেন ঢেকির মুষল হয়ে অন্তত একজনের বুকের গহ্বরে পাড় দিতে শুরু করেছে।"

প্রবাদের বিশেষ ভূমিকা আছে অন্তঃপুরচারিকাদের সংলাপে। প্রবাদ কেবল পরম্পরাগত জ্ঞানের পরিচায়ক নয়, তা বহু মানুষের অভিজ্ঞতা-অর্জিত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনারও ইঙ্গিত বহন করে। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যেসব প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে তার পেছনে নারীর জীবনের বেদনাঘন দিকটিই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে কেবল শরীরসর্বস্ব জীব মনে করে। ফলে বয়স্থা মেয়ে যে কোন মা-বাবার জন্যই উদ্বেগের কারণ সেই প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় 'ছুড়ির তরেশ সোনার বাটা বুড়ির তরে মুড়ো ঝাঁটা'। বিগত যৌবনের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে কোন কোন প্রবাদে, যেমন : 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি, যার পাকা চুল তারেই বলি বুড়ি'। অশিক্ষা, কুসংস্কারের কারণে কোন শিশু মারা গেলে সে দোষ বর্তায় মায়ের ওপর। এই অপবাদের অন্তরালে সন্তানের জন্য মায়ের হাহাকার প্রবাদে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রকাশিত—'জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলছে ডান'। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অবাধ্য চপল নারীকে শায়েস্তা করার কথাও প্রবাদের ভাষায় প্রকাশ পায়। যেমন :

ক. হলুদ জব্দ শিলে, চোর জব্দ কীলে, আর দুষ্টু মেয়ে জব্দ শ্বশুড়বাড়ি গেলে'।

আশাপূর্ণা দেবী 'ট্রিলজি'র কাহিনী উপস্থাপনায় গ্রামীণ প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করে ভাষায় ধ্বনি-মাধুর্যের সৃষ্টি করেন। এগুলির সংখ্যা অগণ্য। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক. নিজের জন্যও ততটা নয়, রামকালীর মনে হয়েছিল, কুকুরের কামড় হাঁটুর নিচে, কিন্তু সত্যর শ্বশুর সম্পর্কে যে তাঁর ওই প্রবাদটা সহজেই মনে আসতে পারল, এটাও তো কম গ্লানির কথা নয়। (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ১৭১)

খ. শশীতারার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। বিদ্যুৎটা আর কিছু নয়, সারদার চোখের আগুন। হঠাৎ মুখ তুলতে গিয়ে মাথার ঘোমটাটা খসে গিয়েছিল সারদার। ঘোমটাটা আবার একটু তুলে মুখ প্রায় অনাবৃত রেখেই সারদা বলে, "দশচক্রে ভগবান ভূত হয় পিসীমা, তায় মানুষ তো কোন ছার! পাকেচক্রে ভদ্দরলোকের মেয়ে ছোটলোকে হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য্য কি! (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২২১)

গ. সত্যর জোড়াভুরু চির অভ্যাসমত কুঁচকে ওঠে, আর গলায় ফিরে আসে কঠিন স্বর। সেই স্বরে উত্তর দেয়, "না, নেমতন্নয় আপনার ত্রুটি কিছু হয়নি। তবে সগুষ্টির এসে মাথা মুড়োবার সময় না হলে আর উপায় আছে, শিরে জল ঢাললে সর্বাঙ্গে পড়ে।" (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ২২৭)

ঘ. সেই যাকে বলে–বাপের জন্মে নেইকো চাষ, ধানকে বলে দুর্বোঘাস। এ হচ্ছে তাই। তা শহরে যখন এসেছো, সভ্য কাজ একটু শিখতে হবে বৈকি।... (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ৩১১)

ঙ. তা অনেকদিন পর্যন্ত অপরাধিনী অপরাধিনী হয়েই ছিল সুবর্ণা। তারপর দেখলে এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম! যত নীচু ততই মাথায় চরে এরা, অতএব শক্ত হতে শিখল। (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ৬)

চ. সুবর্ণ বালিশটা উল্টে-পাল্টে ঠিক করতে করতে বলে, 'কথাতেই আছে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস"। বিষপুঁটুলির সঙ্গগুণে জমছে বিষ।" (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ১৩)

ছ. তবে এইটি হলো, বাড়ির পরবর্তী আরও দুটো বৌ এ সুযোগটার সদ্ব্যবহার করলো। মুক্তকেশী বললেন, 'হবেই তো! কথাতেই আছে, "আগে ন্যাংলা যেদিকে যায়, পাছ ন্যাংলা সেদিকে ধায়।" মেজবৌ একেলে হাওয়া ঢোকালে বাড়িতে! (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

জ. শ্যামাসুন্দরী টিটকিরি দিয়ে উঠেন, 'তা সুখ থাকবে না কেন? কোলে কোল টানলে সবাই ভগবান! বলি, তোমার ছেলেরা এরকম হলে কী বলতে ঠাকুরঝি। ভাগ্যগুণে তারা সবাই ভাল, তাই। আমার হচ্ছে এক ব্যান্নন বিষ!' (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ৯৬)

ঝ. 'ওলো থাম থাম, তুই আর কথার কায়দা শেখাতে আসিস নি! যার নাম ভাজাচাল তার নামই মুড়ি, বুঝলি? ছোট মুখে লম্বা লম্বা কথা।(*সুবর্ণলতা*, পৃ. ১০৪)

ঞ. প্রবোধ অবশ্য অবাক হয় না, হেসে বলে ওঠে, 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! তা যাক বোনাইকে দেখছি না যে? (*সুবর্ণলতা*, পৃ. ১২৯)

ট. অনামিকা হেসে ফেলেন, 'শুনতে তো কিছু বাকি নেই দেখছি আপনার। কিন্তু 'যত দোষ নন্দঘোষ' বললে চলবে কেন? ঐ ধাঁধা তো চিরকালের..."পৃথিবীটা কার বশ"? (*বকুলকথা*, পৃ. ১৭৪)

ঠ. *লোকসমাজের মুখ চেয়ে পারুলকে আর এখন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে হয় না। হঠাৎ কখন এক সময় পারুল ওই লোকনিন্দে জিনিসটার মধ্যেকার পরম হাস্যকর দিকটা উপলব্ধি করে ফেলে। তেলি হাত ফসকে গেলি' হয়ে গেছে।* (*বকুলকথা*, পৃ. ১৩০)

ড. শম্পা জোরে জোরে বলে 'ও ঃ, ওই আশায় বসে থাকব আমি? তাহলেই হয়েছে। তোমার আশায় বসে থাকলে রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না। (*বকুলকথা*, পৃ. ১৭৪)

ঢ. উলঙ্গের নেই বাটপারের ভয়, পারুল বলে, 'যারা জাত শব্দটাকেই মানে না, তাদের আবার জাত যাবার ভয় কি? (*বকুলকথা*, পৃ. ২০৬)

এ ছাড়া ভাষাকে সুষমাময় এবং লালিত্যমণ্ডিত করার প্রয়াসে পাশাপাশি সমাসবদ্ধ শব্দ এবং বাগধারার ব্যবহারেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উপস্থাপিত বিষয়কে বাস্তবসম্মত করার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় আলো ও রঙেরও প্রয়োগ ঘটান। একটি দৃষ্টান্ত—

> পূর্ব জানালা দিয়ে সকালের আলো এসে মেয়েটার মুখে পড়ে যেন তাকে স্নিগ্ধ কৌমার্যের দ্যুতিতে স্নান করিয়ে দিয়েছে। আর নম্র অথচ দৃঢ় মুখের রেখায় একটি প্রত্যয়ের আভা। পাতলা ঋজু দীর্ঘ দেহের গড়নেও সেই প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। (*প্রথম প্রতিশ্রুতি*, পৃ. ৩৩০)

নারী-রচিত উপন্যাসের ভাষারূপ নিয়ে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনায় বলা হয়ে থাকে যে তা হবে পুরুষতান্ত্রিক শব্দশৈলীর বিপরীত এবং একটি স্বকীয় আত্মভাষা নির্মাণের লক্ষ্যতাড়িত। আশাপূর্ণা দেবী সে অর্থে নারীবাদী নন, মূলত তিনি জীবনশিল্পী, প্রচলিত আঙ্গিকেই তিনি পুরুষতন্ত্রাধীন নারীজীবনের আলেখ্য রচনা করেন বলে তাতে নানা জনের ভাষা ও সংলাপ-উক্তি-প্রত্যুক্তি যতটা কাহিনী ও চরিত্রের যাথার্থ্য নির্দিশক ও প্রকাশক ততটা নারীবাদী ভাষারূপ নির্মাণে বিদ্রোহী নয়। আবার নারী স্বভাবত শব্দশৈলীর বহির্ভূত নয়—যেমনটি লক্ষণীয় মহাশ্বেতা দেবীর আদিবাসী বা রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে। আশাপূর্ণা দেবী ত্রয়ী উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত নারীর জীবনানুভূতি ও একই সঙ্গে আত্মমুক্তির প্রতিবেদন রচনা করেন বলে এর ভাষাজগৎ বর্ণনাত্মক, উচ্চারণ-সংলাপ কথোপকথনধর্মী এবং গল্পরস সঞ্চারণে লক্ষ্যীভূত, আবার পুরুষতান্ত্রিক উপন্যাসের মডেলের বিপরীতে নির্মিত নারীজীবনের আত্মভাষার প্রতিবেদন। অর্থাৎ আলেখ্য রচনা ও প্রতিবেদন—এই দুই রূপেরই ভাষাশৈলী ত্রয়ী উপন্যাসে অবলম্বিত।

তথ্যনির্দেশিকা

১. ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, *জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র*, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪, পৃ. ১০৬

২. আব্দুল কাদির সম্পাদিত, *পদ্মরাগ*, রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকাপ্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৪৫০

৩. আশাপূর্ণা দেবী, 'খেলা থেকে লেখা', *আর এক আশাপূর্ণা দেবী*, কলিকাতা পুস্তকমেলা, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০১, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আশাপূর্ণা দেবী প্রধানত নারীর জীবনরূপ ও স্বরূপ উন্মোচনের কথাশিল্পী। এ লক্ষ্যে তিনি নির্বাচন করেছেন উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের এক তৃতীয়াংশ সময়কালের বিস্তৃত পরিসরে নারী জীবনের বন্দিতা, মুক্তিজিজ্ঞাসা ও ব্যবহার করেছেন স্বকীয় জীবনদৃষ্টি। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে নারী জীবনের স্বরূপ ও বিচিত্র দিক তিনি কেবল উন্মোচনই করেন নি, সমাজ ও সংসারের অন্তঃপুরে শতবর্ষের পরিসরে যে সংগ্রাম ও জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে, বহু অসমসাহসিক বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে নারীর চলার জন্য প্রশস্ত পথ, সে ইতিবৃত্তও রচনা করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী শিশুসাহিত্য, কবিতা এবং গল্প রচনার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত করলেও তাঁকে সমাধিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল উপন্যাসের সুপরিসর আঙ্গিক। জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণদৃষ্টি উপন্যাসেই রূপ লাভ করে। তাঁর সাহিত্য কল্পিত ও আবেগনির্ভর নয়, তাঁর উপন্যাসের কাহিনী তৈরি হয়েছে বাস্তব দেশকাল ও নারী চরিত্রের অভিজ্ঞতার বলয় থেকে। সে অর্থে তিনি বাস্তববাদী (Realistic) ধারার কথাসাহিত্যিক। তবে তাঁর শিল্পীসত্তা কতকাংশে রোমান্টিক, অনুভূতিপ্রবণও বটে, শেষ উপন্যাসটিতে আত্মজীবনের প্রতিভূ হিসেবে বকুল চরিত্র রচনায় যা প্রতিফলিত। ফলে তাঁকে বলা যায় Romahtic Sociolistic ধারার লেখক।

আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ ও মানুষ এবং বিশেষত নারী। তাঁর উপন্যাস যেহেতু নারীকেন্দ্রিক এবং নারীর বিচরণক্ষেত্র যেহেতু গৃহ, তাই তাঁর উপন্যাসে গৃহের পটভূমি ও পরিসর বেশি থাকলেও উনিশ-বিশ শতকীয় মফঃস্বল ও নগরকেন্দ্রিক বহির্জগৎও কাহিনীর প্রয়োজনে উপন্যাসে স্থান লাভ করেছে। এই সময়-পরিসরে মানুষ যে মফঃস্বলীয় জীবন পেরিয়ে নগরাভিমুখী হয়েছে তিনি সে চিত্রও তুলে ধরেন। অর্থাৎ তিনি একই সাথে গৃহগত জীবন ও বহির্জগৎ প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর অসম সম্পর্ক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারীর প্রেম, শিক্ষা ও সৃষ্টিশীলতার প্রশ্ন, ধর্মাচার, সংস্কার ও মানবিক অনুভূতির সংঘাত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক উৎপাদন কাঠামো ও সম্পত্তির অধিকার প্রশ্নে নারীর যুগগত দাবী, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীদের অস্তিত্বের অবস্থান ও আত্মসত্তা অর্জনের সুকঠিন সাধনাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ত্রয়ী উপন্যাস তাঁর আত্মজৈবনিক প্রকাশরূপ এবং অচরিতার্থ ব্যক্তিসত্তার শিল্পিত প্রকাশ হিসেবেই পরিগণ্য। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনোই সমাজ-সংসারের আনা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। সেখানে তিনি এক শুদ্ধাচারী গৃহবধূ। কিন্তু বৈষম্যমূলক সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে তাঁর মনোলোকে সংঘটিত নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠক সমক্ষে উপস্থাপন করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর সমকালে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মধ্যবিত্ত সমাজে নারীমুক্তির যে রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, শেষ উপন্যাসে লেখক চরিত্র অনামিকা দেবীর মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। আধুনিক যুগে নারীর স্বেচ্ছাচারী জীবনকে তিনি সমালোচনা করেছেন, আবার তাদের জন্য ভিতরে ভিতরে সহমর্মিতাও পোষণ করেছেন। অর্থাৎ শিল্পিত সহমর্মিতা আশাপূর্ণা দেবীর দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা।

Dhaka University Institutional Repository

আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্যিক দৃষ্টি দেশকালে সীমাবদ্ধ। তিনি আজীবন কলকাতাবাসী। ফলে তাঁর উপন্যাসের কাহিনী পরিব্যাপ্ত হয়েছে কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা জুড়ে। শুধু তাই নয় আশাপূর্ণা দেবীর কালিক দৃষ্টিভঙ্গিও সচেতন। সময়ের সাথে সাথে মানব-মানবীর মনোগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানগত যে পরিবর্তন তা উপন্যাসের সুবিশাল প্রেক্ষাপটে অসাধারণ তাৎপর্যময় করে উপস্থাপন করেছেন।

যেহেতু উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও জীবনানুভূতির প্রকাশ ঘটে, সেদিক থেকে আশাপূর্ণা দেবীও ব্যতিক্রম নন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক উপন্যাসে প্রতিফলিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিনয়ী, সদালাপী, মিষ্টভাষী। বিভিন্ন সভাসমিতিতেও তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দ। এসূত্রেই লক্ষ করা যায় যে, ত্রয়ী উপন্যাসের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে কথকের ভূমিকায়ও তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দ। তিনি কাহিনী আরম্ভ করেছেন সরাসরি। কাহিনী উপস্থাপনায় একই সঙ্গে বর্ণনারীতি ও নাট্যকৌশল প্রয়োগ করেছেন। প্রথম দু'টি উপন্যাসে তিনি কথকের সর্বজ্ঞ ভূমিকায় অবতীর্ণ এবং তৃতীয় উপন্যাসে লেখিকা অনামিকা দেবীর অন্তরালে থেকে বকুলের মাধ্যমে কাহিনী উপস্থাপন করেছেন।*বকুলকথায়* আশাপূর্ণা দেবীর আত্মজৈবনিক ছায়া লক্ষ করা যায়।

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসে নানা চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তাদের সবাই সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নয়, কেউ কেউ সারাজীবন নিঃশব্দে সকল বঞ্চনা সহ্য করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেছে। কেউ আবার সমস্ত সামাজিক সংস্কার উপেক্ষা করে নিজের প্রেমকে চরিতার্থ করতে ঘর ছেড়েছে। এককথায় সমাজে ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জগৎ দুই ক্ষেত্রেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি প্রয়োগ করেছেন এবং তুলে এনেছেন সেখানকার পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ভাষা। কারণ ভাষার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই ঘটনার বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট হয়। ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপ্য বিষয়ের মধ্যে বর্ণ, সুর ও প্রাণসঞ্চার করে এবং বক্তব্যবিষয়কে স্পষ্টতা দিয়েছেন। তিনি নারীর গৃহগত জীবনচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে সেখানকার উপযোগী ভাষা ব্যবহার করেছেন। গ্রামীণ পটভূমি ছেড়ে কাহিনী যখন শহরকেন্দ্রিক হয়েছে, তখন ভাষারও বিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বহুল ব্যবহৃত গার্হস্থ্য ভাষাকে গল্পশিল্পের মর্যাদায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রয়োগ-কৌশলের গুণে সাধারণ শব্দও অসাধারণ তাৎপর্যময় হয়েছে। বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ত্রয়ী উপন্যাসের কাহিনীতে যে গতিময়তা আছে, ভাষার ক্ষেত্রেও সেই গতির ছাপ স্পষ্ট। কখনো তিনি চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আবার কখনো নিজেই কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কাহিনীকে গতিময় করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর উপন্যাসে অবহেলিত নারীর জীবনচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মুখ্যত ব্যবহার করেছেন প্রচলিত উপন্যাসের কাহিনী-বয়নরীতি। তবে সেখানে সময় ও ঘটনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেমন অন্তর্বয়িত, তেমনি চরিত্রও সময়-ঘটনা দ্বারা বিবর্তিত ও বিকশিত। নারীর আত্মসচেতনতা ও দৃষ্টিলোকে তাঁর উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গি, সংলাপ, ঘটনাবিন্যাস, সৌন্দর্যবোধ রূপায়িত, সেই সাথে যুক্ত হয়েছে অভিজ্ঞতাঋদ্ধ ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি ও জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ণ অনুভূতি। তাঁর সমস্ত রচনা নিজস্ব বিশ্বাস, নারী মুক্তি, সত্তাসন্ধান ও মানবীয় মূল্যবোধগুলোর সংরক্ষণাগারে পরিণত হয়েছে। তিনি মানবীয় প্রেমদৃষ্টি ও বিদ্রোহ চেতনার সমন্বিত একটি জীবনদর্শনকে আশ্রয় করে বিশেষভাবে নারীজীবনকেই রূপায়িত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মূল গ্রন্থ

১. *প্রথম প্রতিশ্রুতি*, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. অষ্টাত্রিংশ্য মুদ্রণ ১৪০৫
২. *সুবর্ণলতা*, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. সপ্তবিংশতি মুদ্রণ ১৪০৭
৩. *বকুলকথা*, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. অষ্টাদশ মুদ্রণ ১৪০৪

সহায়ক গ্রন্থ

১. *আশাপূর্ণা দেবী*, উপাসনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী ২০০৪
২. *আর এক আশাপূর্ণা*, আশাপূর্ণা দেবী, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা ১৪০১
৩. *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*, অশ্রুকুমার শিকদার, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯৩
৪. *আশাপূর্ণা দেবীর রচনাসম্ভার* (৩য় খণ্ড) রমেশচন্দ্র মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯
৫. *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, সুকুমার ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা।
৬. *উপন্যাসের কথা*, দেবীপদ ভট্টাচার্য, সুপ্রকাশ প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৬১
৭. *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, তপোধীর ভট্টাচার্য, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯৯
৮. *উপন্যাসশিল্পী*, সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত
৯. *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, রণেশ দাশগুপ্ত, ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা ১৩৩৬
১০. *উপন্যাসের বিষয় আশয়*, সুব্রত বড়ুয়া অনূদিত, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৩
১১. *উত্তর আধুনিকতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, প্রতিভাস প্রকাশন, ২০০০
১২. কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিতান, কলকাতা, ১৩৪৪
১৩. *জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*, ড. অজিত কুমার ঘোষ, সাহিত্য লোক কলকাতা, ১৯৮৪
১৪. *নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, কনক মুখোপাধ্যায় অনূদিত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি. কলকাতা, ১৯৮৩
১৫. *নারী*, হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬
১৬. *নারী আন্দোলনের বিকাশ*, শ্যামলী গুপ্ত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি কলকাতা, ২০০০
১৭. *নারী প্রগতির স্বরূপ ও রবীন্দ্রনাথ*, ড. দীপ্তি চক্রবর্তী, জয়পূর্বা লাইব্রেরী কলকাতা, ২০০১
১৮. *নারী প্রগতি আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*, গোলাম খুরশিদ, নয়া উদ্যোগ কলকাতা, ২০০১
১৯. *নিজস্ব একটি ঘর*, অনসূয়া, প্যাপিরাস কলকাতা, ২০০২
২০. *নৌকাডুবি*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬
২১. *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার*, সুজিৎ চৌধুরী, প্যাপিরাস কলকাতা, ১৯৯০
২২. *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*, সুকুমার ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৪
২৩. *প্রেম এক দার্শনিক বিচার*, জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার অনূদিত, হারুনুর রশিদ সম্পাদিত, ১৯৯৬
২৪. *বঙ্কিম রচনাবলী*, কাকলী প্রকাশ, ১৯৯৫
২৫. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা. লি. ১৩৪৫
২৬. *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৬১
২৭. *বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ*, কনক মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

২৮. *বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে*, আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০
২৯. *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, বিনয় ঘোষ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৭৩
৩০. *বাংলার নারী আন্দোলন*, মালেকা বেগম, ইউনির্ভাসিটি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৯
৩১. *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, সৈয়দ আকরম হোসেন বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
৩২. *বিবাহ প্রসঙ্গে*, সুকুমারী ভট্টাচার্য, ক্যাম্প প্রকাশনী, ১৯৯৬
৩৩. *বিবাহ ও নৈতিকতা*, মূল বার্ট্রান্ড রাসেল,আরশাদ আজিজ অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮
৩৪. *বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস*, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা
৩৫. *বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক*, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বা প্রকাশনী কলকাতা, ২০০১
৩৬. *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য*, মোতাহার হোসেন সুফী, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩
৩৭. *মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত*, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯২৮
৩৮. *মেয়েলি পাঠ*, সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০০
৩৯. *যে গল্পের শেষ নেই*, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ঢাকা, ১৯৭৫
৪০. *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, সৈয়দ আকরম হোসেন, একুশে প্রকাশনী সংস্কারণ ঢাকা, ২০০১
৪১. *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিজ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯০৪
৪২. *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া নারীপ্রগতির একশো বছর*, গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩
৪৩. *রোকেয়া রচনাবলী*, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
৪৪. *শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা*, সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পুঁথিঘর কলকাতা, ২০০২
৪৫. *সেই সময়*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২য় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ, ১৪০২

প্রবন্ধ

১. অর্ধশতকের কথা সাহিত্য নারী কল্পনার নতুন মাত্রা, সুতপা ভট্টাচার্য, দেশ, ৫ আগস্ট ২০০০
২. 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', *রামমোহন রায় রচনাবলী*
৩. 'স্ত্রীশিক্ষা ও বেথুন', *স্বর্ণকুমারী দেবী রচনাবলী*
৪. 'সেকাল ও একাল', রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু
৫. Literature and Western man : J.B. Pristly, London 1962

পত্রিকা

১. *আনন্দমেলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
২. *কথাসাহিত্য*, আশ্বিন ১৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৩. *নতুন সাহিত্য পত্রিকা*, জৈষ্ঠ ১৩৬৩
৪. *সম্বাদপ্রভাকর*, ১লা বৈশাখ ১২৬৫
৫. *দেশ*, ৫ আগস্ট ২০০০
৬. *মুশায়েরা*, শারদীয়া ১৪১০
৭. *দৈনিক বসুমতি*, ২৫ বৈশাখ ১৯৯৩
৮. *সাহিত্য*, মাঘ ১২৯৮
৯. শুভশ্রী, ৪২ বর্ষ, ১৪১০ : ২০০৩-০৪
১০. *Calcutta Review*, 1834, voll-1